বিশ্বের দিক্‌পালগণের জীবন-আলেখ্য

খ্যাতি যাঁদের জগৎ-জোড়া

॥ নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী ॥

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KHYATI JNADER JAGAT JORA
(World famous personalities in literature, arts, science, sports, explorations, social reforms etc.)
By Nirmalendu Roychaudhari (1924)
First Published, April, 1959
Price Rs. 7·50

Published by
Amiya Ranjan Mukherjee
Managing Director
A. Mukherjee & Co., Pvt. Ltd.
2, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬-বি, গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

ভাগ্নে শ্রীমান্ অভিজিৎ গুপ্ত

স্নেহাস্পদেষু

প্রস্তাবনা

'খ্যাতি যাঁদের জগৎজোড়া' গ্রন্থটি কোন বিশেষজ্ঞ বা বিদগ্ধ শ্রেণীর জন্য নয়। আমার এ প্রচেষ্টা প্রধানতঃ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে। আশা করি, রেফারেন্সের জন্য গ্রন্থটি হয়তো বা জ্ঞান-পিপাসু সাধারণ পাঠকবৃন্দেরও প্রয়োজনে আসতে পারে।

সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার্থীদের সাধারণ-জ্ঞানের দৈন্যের অভিযোগ শোনা যায়। কথাটা হয়তো কিছুটা সত্যি। তবে এ কথা ঠিক,—দেশের মনীষীদের অবদানের কথা যদিও বা এদের কেউ কেউ কম বেশী পড়ে থাকে, সমগ্র বিশ্বে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বালালেন বা বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গন থেকে যাঁরা জয়ের মুকুট অর্জন করে স্বদেশের গৌরব বাড়িয়েছেন, সেইসব বরণীয় দিক্‌পালগণের পরিচিতি সম্বন্ধে এসব সাধারণ শিক্ষার্থীদের ধ্যান-ধারণা খুব অস্পষ্ট।

হাতের কাছে এ ধরনের তথ্য-সম্বলিত একটি ছোট্ট রেফারেন্স বই থাকলে—যা ব্যবহারে সহজ এবং প্রশ্ন-সমাধানে যন্ত্রবৎ, ছোট ভাই-বোনদের বিশেষ সহায়ক হতে পারে।—সেই উদ্দেশ্যেই আমার এ প্রয়াস। বাংলা ভাষায় এ ধরনের প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছে বলে জানি না। ভারতীয় অন্য কোন ভাষায় আছে কি না সন্দেহ।

সাধারণ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—সাহিত্য, শিল্প : চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, বিজ্ঞান, ক্রীড়াঙ্গন, দুঃসাহসিক অভিযান, দেশনায়ক ও সমাজসংস্কারক এবং মহাশূন্যে অভিযানের বিবর্তন।

প্রত্যেক অধ্যায়-ই তত্ত্বমূলক ছোট্ট একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। তারপর বিষয় বিভাগে তাঁদের আবির্ভাবের কালানুক্রমিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বিন্যস্ত করা হয়েছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য গ্রন্থটির শেষে পুস্তকে উল্লেখিত দিক্‌পালগণের নামের **নির্দেশিকা'** যুক্ত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এটি আমার মৌলিক রচনা নয়, সংকলন। বহু পরিশ্রম করে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য আহরণ করে তা যথাসম্ভব সহজ ভাষায় পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছি—কিশোর এবং তরুণ পাঠকমনে আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গত, বর্তমান সংকলনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবি করি না। এ সংকলনের উক্ত সাতটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এমন আরও কিছু শ্রেষ্ঠ কৃতী-ব্যক্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে এ গ্রন্থে সংকলিত দিক্‌পালগণকে বিশ্বের 'শ্রেষ্ঠ' বলে গ্রহণ করতে কোন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কুণ্ঠিত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থটি সংকলন করতে যাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অগ্রজপ্রতিম সর্বশ্রী কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ক্রীড়াঙ্গন' অধ্যায়টি লিখতে শ্রীখেলোয়াড়-এর সহায়তা পেয়েছি। এ ছাড়াও ক'জন সহৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তি মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। এঁদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

সবশেষে, গ্রন্থটির মূল পরিকল্পনা শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। এই দুরূহ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথমে আমি এ দায়িত্ব নিতে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। আমার অক্ষমতার কথাও তাঁকে জানিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি-ই আমাকে এ কাজে উৎসাহিত এবং প্রবৃত্ত করেন। এ জন্য তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

নিজের যোগ্যতা বিচার না করে একদিন এ কাজে ব্রতী হয়েছিলাম। কারণ, এ ধরণের একটি বইয়ের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এবং সে প্রয়োজনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

স্বল্পপরিসরের মধ্যে গ্রন্থটিকে সুসম্পূর্ণ করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। কতদূর সফল হয়েছি জানি না।

'খ্যাতি যাঁদের জগৎজোড়া' পড়ে যদি পাঠক-পাঠিকারা, বিশেষ করে কিশোর এবং তরুণ পাঠক-বন্ধুরা উপকৃত হন অথবা সেই পাঠকমনে যদি বিশ্বের আরও সব শ্রেষ্ঠ দিক্‌পালগণের জীবনচরিত পড়বার আগ্রহ জাগে—তাহ'লেই আমার পরিশ্রম এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আর, তাঁদের ভেতর যদি দু'চার জনও সংকলিত কোন শ্রেষ্ঠ মনীষীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন তাহ'লে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

ইতি—

কলকাতা

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

সূচীপত্র

চিত্র-পরিচিতি

সাহিত্যিক

শিল্পী : চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

মাইকেলেঞ্জেলো

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

রাফেল

এল গ্রেকো

মহাশূন্যের অভিযাত্রী
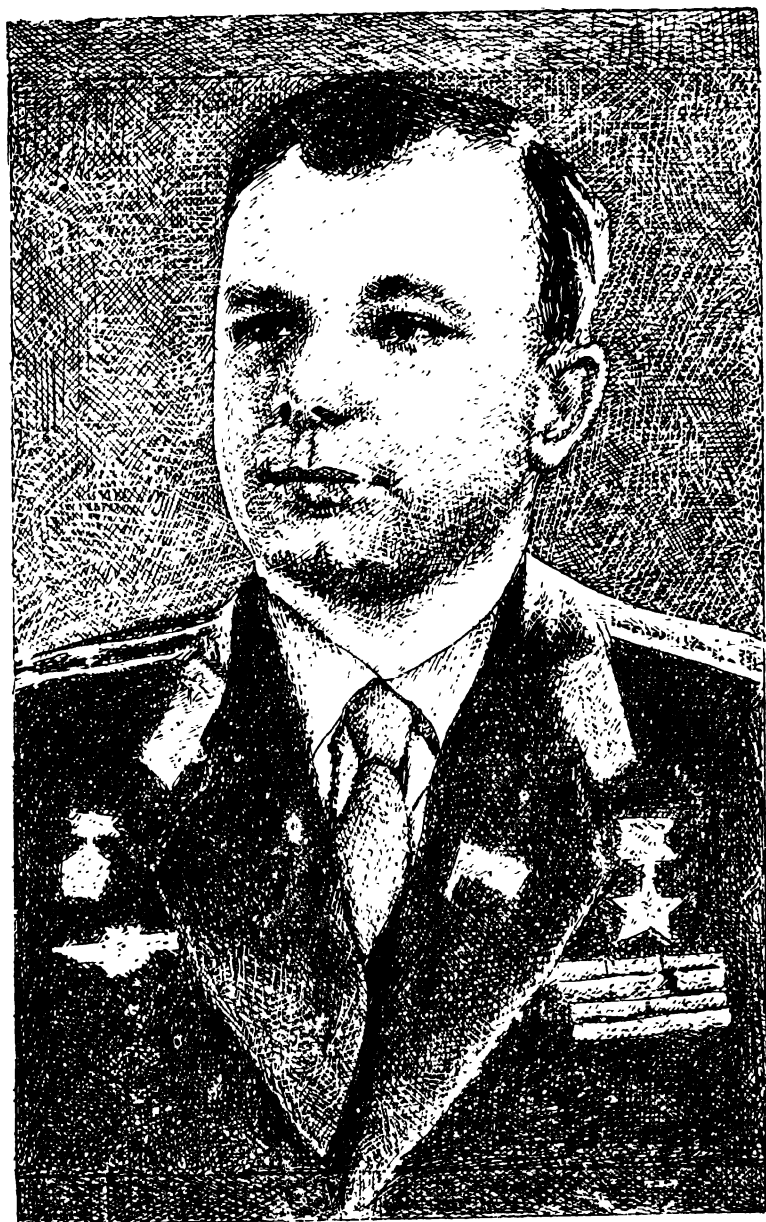
ইউরী গাগারিন

এই গ্রন্থকারের দু'খানি
অনবদ্য প্রকাশন—

বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা

প্রথম পর্ব ঃ মূল্য—১০·০০

৩৬ জন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত
সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
ও নাটক-এর সরস গল্পরূপ।

বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা

দ্বিতীয় পর্ব ঃ মূল্য—১২·০০

প্রাচীন ও আধুনিক কালের
বিশ্বের ৩৮টি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
ও নাটকের অনবদ্য সংকলন।
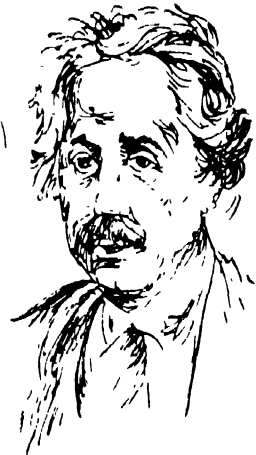
বিজ্ঞানী

ক্রীড়াবিদ্

স্ট্যানলী ম্যাথুজ

ডন ব্র্যাডম্যান
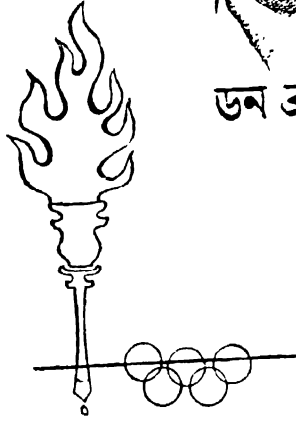
ক্যাপ্টেন ম্যাথুওয়েব

ধ্যানচাঁদ

দুঃসাহসিক অভিযাত্রী

কলম্বাস

ক্যাপ্টেন কুক

লিভিংস্টোন

তেনজিং
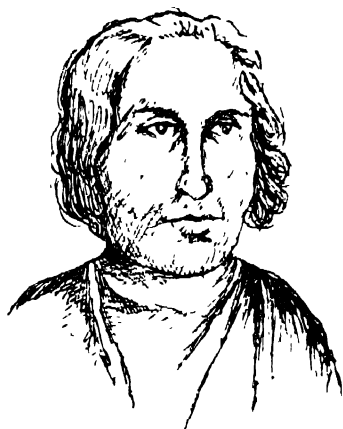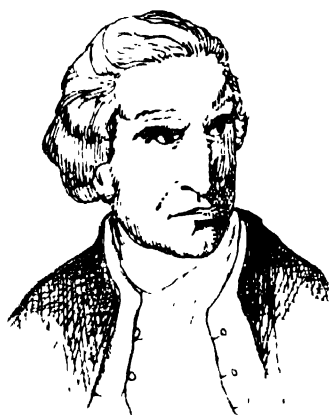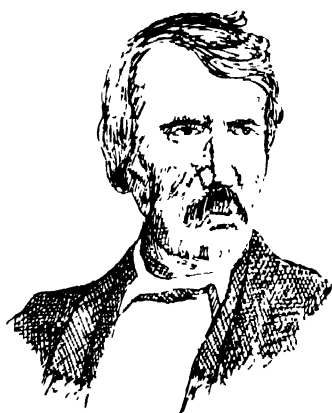
দেশনায়ক ও সমাজ-সংস্কারক

কনফুশিয়াস
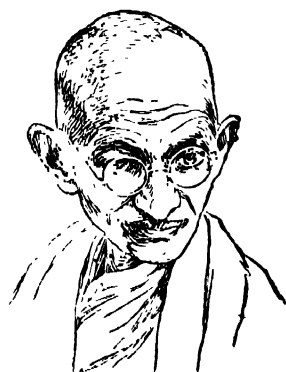
গান্ধীজী

বুদ্ধ
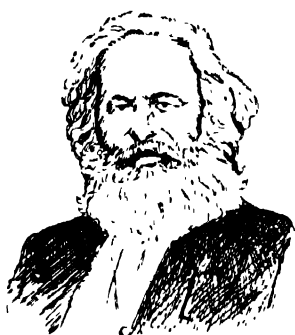
কার্ল মার্কস

রাজা রামমোহন রায়

[প্রথম পরিচ্ছেদ]

সাহিত্য

প্রস্তাবনা

বর্তমান অধ্যায়টি বিশ্বসাহিত্যে প্রাচীন ও আধুনিক কালের কয়েক-জন শ্রেষ্ঠ মনীষির সঙ্গে পরিচিত হবার একটি প্রয়াস। এ ক্ষেত্রে 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে; পৃথিবীর সকল দেশের বিশিষ্ট সাহিত্য-স্রষ্টাগণের জীবনচরিত আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

'শ্রেষ্ঠ' কথাটার কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা উল্লেখ করা মুস্কিল। প্রশ্নটা চিরকাল বিতর্কমূলক, যদিও ১৯০১ সনে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন হবার পর থেকে বিংশ শতাব্দীতে উক্ত পুরস্কারটিই শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের একটি চলতি মাপকাঠি। সাধারণত নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকগণ-ই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে গণ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু নোবেল কমিটির নির্বাচন সব সময় প্রশ্নাতীত নয়। সে বিচার বিদগ্ধ সমালোচকদের জন্য তোলা থাক। আপাততঃ আমরাও নোবেল পুরস্কার-বিজয়ীদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে স্বীকার করে নেব।

তবে, পৃথিবীতে এমন সাহিত্যিকের সংখ্যাও বড় কম নেই, যাঁরা ঐ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েও স্মরণীয়। তাঁরাও আপন স্বকীয়তায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গৌরবে ভাস্বর। তলস্তয়, গোর্কি, টমাস হারডি, এইচ. জি. ওয়েলস্, চেখভ, ইবসেন, রবার্ট ফ্রস্ট এবং আরও অনেক দিক্‌পাল সাহিত্যিক উক্ত পুরস্কার না পেয়েও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে কোন নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকের চেয়ে নিশ্চয়ই কম 'শ্রেষ্ঠ' নন।

আবার এমন অনেক সাহিত্যিকের কথাও আমরা জানি, যাঁরা ঐ দুর্লভ পুরস্কারটি পেয়েও বহুদিন পূর্বে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। অনেকে তাঁর স্বদেশেও।

প্রথম জার্মান নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী (১৯১০ সন) পল হেইস্ (Paul Von Heyse, 1830-1914)-এর রচনার সঙ্গে আজকাল তাঁর ক'জন স্বদেশবাসী-ই বা পরিচিত আছেন বলা শক্ত।

অপরপক্ষে, প্রথম নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী Rene Francois Armand Prudhomme'র নাম আজ তাঁর স্বদেশের গণ্ডির বাইরে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ফরাসী কবির নাম 'The Oxford Companion to English Literature'—এই বিরাট গ্রন্থটিতেও উল্লিখিত নেই।

আমাদের সংকলিত তালিকাটি সর্বব্যাপক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, নির্বাচিত। তবে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যিকগণকে বিশ্বের অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ' বলে স্বীকার করতে কেউ কুণ্ঠিত হবেন না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, বর্তমান সংকলনে যে-সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অন্তর্ভুক্ত হননি তাঁদের পরিচয় লাভের জন্য অথবা সেই সব বরণীয় লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনার স্বাদ পেতে কৌতূহলী পাঠকবৃন্দ বর্তমান লেখকের **'বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা'**-র ১ম ও ২য় পর্ব পড়তে পারেন। আশা করি সেক্ষেত্রে তাঁরা আশাহত হবেন না।

পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য আমাদের সংকলিত সাহিত্যিকগণকে প্রধানত দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—**কাব্যসাহিত্য** এবং **কথা-সাহিত্য**। তারপর তাঁদের দেশ হিসাবে বিভক্ত করে উক্ত সাহিত্যিক-গণের আবির্ভাবের কালানুক্রমিক বিন্যাস করে এঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে।

কাব্যসাহিত্য

(প্রাচীন যুগ)

হোমর (Homer), ৮৫০ খ্রীঃ পূঃ (?)

পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে জানা যায়, এই মহাকবি সম্ভবত ৮৫০ খ্রীঃ পূঃ অথবা ট্রোজান যুদ্ধের চার শত বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। হোমর গ্রীক কবি বলে পরিচিত হলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা এশিয়াবাসী ছিলেন। তবে তাঁর জন্মস্থান আজও বিতর্কমূলক, পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। একটি দু'টি নয়—সাত সাতটি দেশ,—স্মার্না, গিয়োজ, কলোফন, সালামিস, রোডস্, অ্যানগস্ এবং এথেন্স প্রত্যেকটি দেশই এই মহাকবির জন্মস্থান বলে দাবী করে।

'ইলিঅ্যাড' এবং 'ওডিসি' মহাকাব্য দু'টি তাঁর অমর সৃষ্টি। কিন্তু এ দু'টির একটিও তাঁর স্বলিখিত নয়। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। চারণ কবির মতো স্থান হ'তে স্থানান্তরে ঘুরে হোমর উক্ত গ্রন্থ দু'টির কাহিনী আবৃত্তি করে বেড়াতেন। শাশ্বত প্রাচীন কাহিনীর ঐ ঘটনাবলী তাঁর কণ্ঠে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তাঁর কণ্ঠশ্রুত ঐ কালজয়ী কাব্যগাথা পুরুষানুক্রমে লোকমুখে গীত হয়ে ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ট্রয় নগরের কাহিনী এবং তার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী হোমরের কাব্যের প্রধান উপাদান। এই ঐতিহাসিক তথ্য বাদ দিলেও উক্ত কাব্য দু'টির মধ্যে এমন একটি চিরন্তন সত্যগ্রাহী আবেদন আছে যা মানব সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

হোমর শুধু এই কালজয়ী মহাকাব্য দু'টির স্রষ্টাই নন, ইউরোপীয় কাব্যের জনকও বটে। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন, গ্রীস দেশের প্রচলিত ধর্মীয় প্রথার প্রবর্তক এবং শিক্ষার উৎস। হোমর সর্বকালের মহাকবি বলে সর্বজনস্বীকৃত।

ভার্জিল (Publius Virgilius Maro), ৭০-১৯ খ্রীঃ পূঃ

ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, জাতীয় কবি—বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের নমস্য। কালগত হয়েও ইনি কালজয়ী।

তাঁর আসল নাম যা-ই থাক না কেন, 'ভার্জিল' নামেই তিনি জগদ্‌বিখ্যাত। এ-নামটি আজও জনমানসে শিহরণ জাগায়।

ভার্জিল শুধু ইতালীয় সাহিত্যের গৌরব নন, তাঁর অসামান্য অবদানে লাতিন সাহিত্যও বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। জন্মসূত্রে ভার্জিল কিন্তু রোমান ছিলেন না, লাতিনও নয়। আসলে তিনি ছিলেন একজন 'কেল্ট', রোমসাম্রাজ্যের উপকণ্ঠে উত্তর পো অঞ্চলের এক উপজাতি বংশোদ্ভব।

কৃষক পরিবারে জন্ম হলেও তাঁর সুশিক্ষার জন্য তাঁর পিতার আগ্রহের সীমা ছিল না। ক্রিমোনা এবং মিলান-এ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি রোম নগরীতে যান। সম্ভবত রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণিপাকে তাঁর সে-শিক্ষায় অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

খ্রীঃ পূঃ ৪২-য়ে তাঁর কবিখ্যাতি স্বদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় পো অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভার্জিলের পৈতৃক সম্পত্তিও রোম সম্রাটের হস্তগত হয়।

সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ভার্জিলের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সাদরে আশ্রয় দেন। রোম নগরীতে আসবার আগেই ভার্জিল Eclogues নামক বিরাট কাব্যগ্রন্থটি শুরু করেছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৭-এ এটি আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেইসঙ্গে পরাশ্রিত ভার্জিলের ভাগ্য-পরিবর্তনও শুরু হয়।

Georgies গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃত হন।

এবার তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Aeneid' মহাকাব্যটির সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। খ্রীঃ পূঃ ১৯-এ উক্ত গ্রন্থটি, বলতে গেলে, শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর সে-সৃষ্টির মধ্যে কবির অতৃপ্তি থেকে যায়। ভেবে চিন্তে এটিকে আরও সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন,

গ্রন্থটিকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু রোমে ফিরবার পথে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেশের মাটিতে ফিরবার ক'দিন বাদে ভার্জিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহাকাব্যটিকে তিনি আর পরিমার্জিত করতে পারেন না। সেজন্য তাঁর খেদের অন্ত ছিল না। মৃত্যুর আগে উইলে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশ না করবার জন্য লিখে যান। কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হয় না। রোম সম্রাটের আদেশে মহাকাব্যটি প্রকাশিত হয়।

অ্যালিঘেরি দান্তে (Alighieri Dante), ১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ অঃ

দান্তে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবির গৌরব অর্জন করেছিলেন। বর্তমান ইতালীয় সাহিত্যের জনক হিসাবেও তিনি স্বীকৃত।

ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে তাঁর জন্ম। নিতান্ত বালক বয়সেই তিনি পিতামাতাকে হারান। পণ্ডিতগণের গবেষণা থেকে জানা যায়, কোন এক রাজকর্মচারীর সৌজন্যে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। বলোগ্‌না এবং পাদুয়াতে তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে প্যারিসে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

অতি অল্প বয়সেই প্রথম দর্শনে একটি সুন্দরী বালিকা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। ক্রমে সেই অনুরাগ দান্তেকে কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়। এটা কবির স্বীকৃতি।

কি এক তুচ্ছ কারণে একসময় দান্তে পোপের বিরাগভাজন হন। ফলে তাঁর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সময়টা ১৩০১ সন। অগত্যা তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এ সময়কার তাঁর জীবনের ঘটনা ঠিক স্পষ্ট জানা যায় না। হয়তো তখন তাঁকে ভবঘুরের জীবন যাপন করতে হয়েছে। তবে দেশে আর তিনি ফিরে যাননি। মাঝে তাঁকে একবার প্যারী নগরীতে দেখা গিয়েছিল।

তাঁর লেখার রীতি ছিলো স্বচ্ছ এবং সরল, ভাষা ছিল রুচিসম্মত— কাব্যচেতনায় প্রোজ্জ্বল। চস্যার ও মিলটনের মতো দিক্‌পাল কবিগণও

দান্তের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তবুও তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির স্বীকৃতি পেয়েছেন মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে।

New Life এবং Divine Comedy—দান্তের দুটি শ্রেষ্ঠ অবদান আজও বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে অম্লান রত্ন হয়ে আছে।

আধুনিক যুগ

(ইংরেজী)

জিওফ্‌রী চসার (Geoffrey Chaucer), ১৩৪০-১৪০০

চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবেও চসার স্বীকৃত। তিনি ছিলেন মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সন্ধিলগ্নের মানুষ। লণ্ডনে তাঁর জন্ম।

Canterbury Tales তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান—বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে এই কাব্যগ্রন্থটি একটি অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থটির জন্যই তিনি বিশ্ববিখ্যাত। চসারের এই সৃষ্টির মধ্যে মধ্যযুগের নিখুঁত ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৩৭৩ সনে লিখতে শুরু করে প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এই গ্রন্থটি লিখতে ব্যাপৃত ছিলেন।

নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সারা জীবনে তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৩৫৯ সনে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে তিনি শত্রুদের হাতে বন্দী হন এবং ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের সৌজন্যে মুক্তি পান। ১৩৬৭ সনে রাজপরিবারে তিনি একটি চাকুরি পান।

তিন বছর বাদে রাজার দূত হিসাবে এক বাণিজ্য চুক্তির উদ্দেশ্যে চসার দু'বছরের জন্য জেনোয়াতে প্রেরিত হন। ফিরে আসার কিছুদিন পরে তিনি লণ্ডন পোর্টের কণ্ট্রোলার অব কাস্টম্‌স-এর গুরুত্বপূর্ণ পদটি গ্রহণ করেন।

আরও ক'বছর পরের কথা। চসার পর পর তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সফরের জন্য মনোনীত হন। ১৩৮৫ সনে তিনি জাস্টিস অব পিস হন, পরের বছর পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। কিন্তু এই সময় রাজনৈতিক তুফানের আবর্তে পড়ে তাঁকে সবকিছু হারাতে হয়।

পরে দ্বিতীয় রিচার্ড এবং চতুর্থ হেনরীর অনুগ্রহে চসারের দিন ফিরে আসে। তখন আশাতীত ভাবে তাঁর ভাগ্য-পরিবর্তন হয়।

এবার নিশ্চিন্ত আরামে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাবার জন্য চসার ওয়েস্টমিনস্টারে একটি বাড়ি কেনেন। কিন্তু সে-সুখ তাঁর বরাতে বেশী দিন সইল না—পরের বছর তিনি মারা যান।

জন মিলটন (John Milton), ১৬০৮-৭৪

প্রখ্যাত ইংরেজ মহাকবি। রাজনৈতিক লেখক হিসাবেও মিলটনের খ্যাতি সে-সময় কম ছিল না।

১৬৩২ সনে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ছাত্র জীবনেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়েই তাঁর কবি-চেতনা বিকশিত হয়। সতেরো বছর বয়সের রচনাটি দিয়েই তিনি বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

যাতে গীর্জার যাজকের পদের তিনি উপযুক্ত হন, সেই মতো গোড়াতে তাঁর বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্রমে মিলটনের দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—গীর্জা এমন একটি স্থান যেখানে ধর্মের অবগুণ্ঠনে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচার চালানো সম্ভব। ফলে, সেদিক তিনি এড়িয়ে যান।

ছাত্রজীবন থেকেই ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ নিষ্ঠাবান। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা। বাইবেল ধর্মগ্রন্থটির প্রতিও তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। ফলে তাঁর নৈতিক চরিত্র অতি সুন্দর

ভাবে গড়ে উঠেছিলো। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের মতো তাঁর ভাষাও ছিল দৃঢ়। তাঁর রচনা ছিল প্রেম, রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক।

শুধু ইংরেজী ভাষাতেই নয়, লাতিন ভাষাতেও তিনি লিখেছেন প্রচুর। তবে মহাকাব্য-ধর্মী Paradise Lost তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি; প্রথম অংশ প্রকাশিত হয় ১৬৪২ সনে, বাকী অংশ বেরোয় ১৬৬৩ সনে। অন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ দুটি—Paradise Regained এবং Samson Agonistes একসঙ্গে আট বছর পরে প্রকাশিত হয়, কবি তখন সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু তবুও তাঁর সৃষ্টি স্তব্ধ হয় নি, সেক্রেটারীর সাহায্যে তাঁর সৃষ্টি চলেছে অবিরাম গতিতে।

উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth), ১৭৭০-১৮৫০

প্রকৃতির কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ। মানবতার জয়গান তিনি করে গেছেন মুক্তকণ্ঠে। তবে নিঃসন্দেহে শৈশবের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যচেতনার উন্মেষে অনেকটা সাহায্য করেছে।

তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞান তিনি পুঁথির চেয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে বেশী আহরণ করেছিলেন। জনকোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশই ওয়ার্ডসওয়ার্থ বেশী পছন্দ করতেন।

১৭৯১ সনে স্নাতক উপাধি লাভ করে তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন। এই সময় ফরাসী বিপ্লব শুরু হ'তে তিনি ঐ বিপ্লবের মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসীম উৎসাহে ছুটে যান ফরাসী দেশে। কিন্তু পরে সে-বিপ্লবের বিভীষিকায় মর্মাহত হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

এই সময় ঘটনাচক্রে কিছু অর্থ তাঁর হাতে আসায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যসাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। কোলরিজ

তখন কাব্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর সান্নিধ্য পেতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কাছে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃত জীবন শুরু হয় ১৭৯১ সন থেকে, Guilt and Sorrow কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পরের বছর প্রকাশিত An Evening Walk গ্রন্থটি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

আত্মজীবনীমূলক The Prelude নামক অনবদ্য কাব্যগ্রন্থটি তিনি বিয়ের (১৮০২ সন) অল্পদিনের মধ্যেই শেষ করেন।

১৮২৩ এবং '২৫ সনের মধ্যে তিনি কতোগুলো গীতিকাব্য সৃষ্টি করেন। তার মধ্যে To the Skylark, Scorn not the Sonnet বিশেষ উল্লেখ্য।

এরপর কবি 'রোমান্টিক' বলে চিহ্নিত হন।

দীর্ঘ জীবনে তিনি লিখেছেন অজস্র কবিতা যা আজও অম্লান হয়ে আছে।

লর্ড বায়রণ (Lord George Gordon Byron), ১৭৮৮-১৮২৪

ইংরেজী কাব্যসাহিত্য যাঁদের অবদানে পরিপুষ্ট বায়রণ সেই কবিকুলের অন্যতম। তাঁর কালজয়ী সৃষ্টির অপরূপ লালিত্য আর অভিনব মাধুর্য যুগ যুগ ধরে কাব্যরসপিপাসুদের তৃষ্ণা মিটিয়ে আসছে।

লণ্ডন শহরে তাঁর জন্ম। শৈশবেই তিনি পিতাকে হারান। তারপর কিছুটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বায়রণ বড় হতে থাকেন। দশ বছর বয়সে জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি 'ব্যারণ' উপাধি লাভ করেন, সেইসঙ্গে প্যারিবারিক সম্পত্তিও।

হ্যারো এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়রণ শিক্ষা লাভ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি একটু বেপরোয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র হিসাবেও তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। বরং একজন ভাল খেলোয়াড় বলে তাঁর পরিচিতি ছিল।

ছাত্র জীবনের পাঠ চুকিয়ে তিনি কিছুদিন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। ফিরে এসে ১৮১১ সনে পার্লামেণ্টে লর্ডস্-এর আসন পান। পরের বছর তাঁর 'Childe Harold' কাব্যগ্রন্থটির দু'টি পর্ব প্রকাশিত হ'তে রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হন।

এর পরের চার বছরের মধ্যে তিনি কাব্যরসিকদের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ উপহার দেন।

এই সময় পর পর কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনার আবর্তে পড়ে সমাজের ওপর তাঁর মনে বিতৃষ্ণা জাগে। ফলে, তিনি ইংলণ্ড ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেন।

স্বদেশ ছেড়ে ভবঘুরের মতো ইয়োরোপের নানা দেশে বায়রণ ঘুরে বেড়ান। এই ভবঘুরে জীবনে সুইজারল্যাণ্ডে শেলীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। সেখান থেকেই দুই দিক্‌পাল কবির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

শেষ জীবনে তিনি কিছুদিন ইতালির জেনোয়াতে স্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন। এবং ওখান থেকেই বায়রণ গ্রীসের রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগ দান করে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান।

তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ Don Juan, Lament of Tasso, The Giaour, The Corsair ইত্যাদি।

পি. বি. শেলী (P. B. Shelley), ১৭৯২-১৮২২

ইংরেজী সাহিত্যের এই অম্লান রত্ন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিত্তবান লর্ড টিমোথির পুত্র। ধনীর দুলাল। পরিবারের সম্মান ও ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁর দিনগুলি সুখেই কাটবার কথা। কিন্তু তা হয় না।

ছেলেবেলাতেই পারিপার্শ্বিক নিয়মশৃঙ্খলার কঠিন অনুশাসনে তাঁর মনে বিতৃষ্ণা জাগে। নিজে যা ভাল মনে করেন তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত

করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। ঠাকুরদা এবং পিতা তাঁর এই আচরণে বিচলিত হন। অভিভাবকগণ তাঁকে সতর্ক হতে নির্দেশ করেন। কিন্তু শেলী তাঁদের সে-উপদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।

ছাত্র জীবনেই তিনি নিষিদ্ধ প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করেন। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ১৮১০ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে তিনি 'বিদ্রোহী' খেতাব অর্জন করেন। তা হোক।

এই সময় প্রচলিত ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধা হারান। ক্রমে নিজেকে একজন নাস্তিক বলে জাহির করতেও তিনি দ্বিধা করেন না। শুধু তাই নয়, 'The Necessity of Atheism' নামে একটি পুস্তিকা লিখে শেলী ছাত্রসমাজকে নাস্তিক হতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত হন। পিতাও ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এই বিপদে পড়েও কিন্তু তিনি বিচলিত হন না, তাঁর বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন না। দারুণ অর্থকষ্ট, তবুও তিনি ঐ সময় বিয়ে করতে দ্বিধা করেন না।

বিয়ে করে ভবঘুরের মতো নানা জায়গায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ান। কিন্তু ঐ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তিনি সৃষ্টির পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান।

১৮১৫ সনে ঠাকুরদা'র মৃত্যুর পর তাঁর অর্থকষ্ট দূর হয়। তার পর থেকেই অনন্যসাধারণ সৃষ্টির পথে তিনি দ্রুত এগিয়ে যান। তাঁর কাব্য ছিল প্রধানত গীতধর্মী। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী কবির মৃত্যু হয় মর্মান্তিক ভাবে—জলমগ্ন হয়ে।

তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য—Alastor, 1815 ; Prometheus Unbound ; The Cenci (কাব্য নাটক) ; Ode to the West Wind ; The Cloud ; The Skylark ইত্যাদি।

জন কীটস্ (John Keats), ১৭৯৫-১৮২১

শুধু ইংরেজী কবিকুলের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলেই স্বীকৃত নন, কালগত হয়েও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 'কীটস' আজও একটি প্রোজ্জ্বল নাম। তবে ছেলেবেলায় তাঁর কাব্য-প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

সাত বছর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন তাঁর প্রকৃতিটা ছিল উগ্র। সামান্য ছুতোয় সহপাঠীদের সঙ্গে লড়াই করতেন। ন' বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় তাঁর পিতার মৃত্যু হতে বালক কীটস্‌কে জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়ঃ পিতৃশোকটা পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার আগেই মা আবার বিয়ে করেন। এ বিয়ে সুখের হয় না। ক'দিন পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। মা তিন ছেলেকে নিয়ে যা-হোক করে দিন কাটান।

তার পর মা মারাত্মক যক্ষ্মা রোগে কিছুদিন ভুগে স্বর্গতা হন। মা'র ব্যাধি কীটস্ এবং তাঁর অনুজের মধ্যে অলক্ষিতে সংক্রামিত হয়।

মা'র ঐ মর্মান্তিক মৃত্যু কীটসের জীবনে এক পরিবর্তন আনে। তিনি আত্মস্থ হয়ে বইয়ের মধ্যে ডুবে যান।

এই সাহিত্য পাঠ কীটসকে দেয় সৃষ্টির প্রেরণা। ক্রমে ক্রমে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। সহৃদয় বন্ধুদের উৎসাহে তিনি অবিশ্রাম লিখে যান। কখনোও বা বিরুদ্ধ সমালোচনাও তাঁকে শুনতে হয়। তিনি কিন্তু দমেন না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে তিনি শল্য-বিদ্যা শিখতে শুরু করেন। পরীক্ষায় পাশও করেন। কিন্তু তখন তাঁর মন কাব্যরসে ভরপুর। ডাক্তারী পেশার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং অভিভাবকদের উপদেশ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তিনি কাব্য-লক্ষ্মীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে স্থির করেন।

ইতিমধ্যে তাঁর রুগ্ন অনুজ টমের মৃত্যু হয়, নিজের দেহেও মা'র ঐ

সংক্রামক ব্যাধির বিষক্রিয়া কীটস্ উপলব্ধি করেন। কিন্তু পয়সার অভাবে তাঁর প্রয়োজন মতো চিকিৎসা হয় না। তবুও তিনি লিখতে ছাড়েন না। গোড়াতে তাঁর রচনায় দুঃখের ছায়া পড়লেও মূলত সৌন্দর্যই ছিল তাঁর প্রেরণার প্রধান উৎস।

এমন সময় সুন্দরী ফ্যানি ব্রন্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শ্রীমতী ব্রন কীটসের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। পরিচয়ের অল্পদিনের মধ্যে দু'জনের মধ্যে বাগ্দান হয়। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে কীটস্ সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন, ক্রমে মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেন। তবুও শ্রীমতী ব্রনের প্রেরণায় ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি লিখেছিলেন।

আরোগ্যের আশায় তাঁর অনুগত একজন গুণমুগ্ধকে নিয়ে ১৮২০ সেপ্টেম্বর কীটস্ ইতালি যান। কিন্তু কোন ফল হয় না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে রোম নগরে তাঁর জীবন-দীপটি নিভে যায়।

মৃত্যুর ন'দিন আগে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, মৃত্যুর পর তাঁর কবরের ওপর যেন লিখে দেওয়া হয়,—Here lies one whose name was writ in water. কবি তাঁর জীবনটা একটা জলের দাগ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। উল্লেখযোগ্য রচনা—Ode on a Grecian Urn, Ode to a Nightingale এবং Ode to Autumn ইত্যাদি।

লর্ড টেনিসন (Alfred Lord Tennyson), ১৮০৯-৯২

ভিক্টোরিয়-যুগের প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন জন্ম-কবি।

অতি শৈশবেই পল্লীর প্রাকৃতিক শোভা টেনিসনের শিশুমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তখন থেকেই তিনি প্রকৃতির একজন বিশেষ

অনুরাগী হন। নিঃসন্দেহে সেই অনুভূতিই তাঁর কবি-চেতনার উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

সাত বছর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এবং তার কিছুদিন পর থেকেই তিনি কবিতা লেখবার চেষ্টা করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে অগ্রজের সঙ্গে লিখিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ—Poems by Two Brothers প্রকাশিত হয়।

১৮২৮ সনে তিনি ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। পরের বছর তাঁর Timbuctoo কবিতাটির জন্যে টেনিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

Poems by Alfred Tennyson প্রকাশিত হতে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ই তিনি ইংলণ্ডের কবিকুলের শিরোমণি হয়ে ওঠেন। এর পর থেকেই টেনিসন কাব্যসাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

স্যার রবার্ট পীল তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ১৮৪৫ সনে দু'বছরের জন্য বার্ষিক দু'শত স্টার্লিং হিসাবে তাঁর নামে রাষ্ট্রীয় বৃত্তি মঞ্জুর করেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুর পর ১৮৫০ সনে টেনিসন রাজকবি হিসাবে সম্মানিত হন এবং তাঁর অনন্যসাধারণ কাব্য-প্রতিভার জন্য ১৮৮৪ সনে তিনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁর উত্তর কালের সৃষ্টির মধ্যে—Maud, Idylls of the King এবং Enoch Arden বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning), ১৮১২-৮৯

ভিক্টোরিয়-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

বিশেষ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন পিতা-মাতার সন্তান। রবার্টকে একজন কৃতী পুত্র হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য পণ্ডিত পিতার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

গতানুগতিক পদ্ধতিতে রবার্ট শিক্ষা পাননি। কয়েকটি প্রাইভেট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা পেলেও পিতামাতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে রবার্টের অদম্য জ্ঞান-পিপাসা মেটাবার চেষ্টা হতো।

মেধাবী রবার্ট কিন্তু তাতেও তৃপ্ত হতেন না। সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ঘন্টার পর ঘণ্টা তিনি ডুবে থাকতেন সেই জ্ঞান-সমুদ্রে। অবশ্য যৌবনে রবার্ট কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাগোনা করেছিলেন।

লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে তিনি মনস্থ করেন। একুশ বছর বয়সে তাঁর কবিতা Pauline প্রথম ছাপা অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করলেও, বারো বছরে পৌঁছুবার আগেই তিনি একটি কবিতাগুচ্ছ সৃষ্টি করেন।

আরও ভাল ভাবে লিখবার প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এবার বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ইতালি এবং জার্মানীর নানা অঞ্চল ঘুরে এসে সেই ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিছু কবিতা লেখেন। কিছু নাটকও।

পরবর্তী দীর্ঘ দশ বছর তাঁর অক্লান্ত সাধনার ফল হিসাবে তিনি ভিক্টোরিয়-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা হিসাবে স্বীকৃত হন।

১৮৪৬ সনে তিনি প্রখ্যাতা কবি এলিজাবেথ ব্যারেটের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর বিবাহিত সুখের জীবন পাঁচ বছরের বেশী স্থায়ী ছিল না। অবশ্য স্ত্রী-বিয়োগের পরেও তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। এই সময়কার সৃষ্টি—Ring and the Book (চার খণ্ডে) সম্ভবতঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থটি কবির মৃত্যুর দিন প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর রবার্ট ব্রাউনিং রাজকীয় সম্মানে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে কবি টেনিসনের পাশে সমাধিস্থ হন।

উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স্ (W. B. Yeats), ১৮৬৫-১৯৩৯

প্রখ্যাত আইরিশ কবি ; ডাবলিন শহরে জন্ম। ১৯২৩ সনে সাহিত্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা লণ্ডনের কোন এক বিদ্যালয় থেকে পান। তারপর ডাবলিন শহরে ফিরে গিয়ে তিন বছর সাহিত্য এবং চিত্রকলা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষার চেয়ে নির্জন বন-জঙ্গল এবং পাহাড়-পর্বতে একাকী বেড়ানোর প্রতি তরুণ ইয়েট্‌স্-এর আকর্ষণ ছিল বেশী।

এমনি ভাবে ঘোরার ফলে তাঁর ভাবুক মনে সাহিত্যের দানা বাঁধে। সেইসঙ্গে তিনি স্বদেশের অনেক পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথা সংগ্রহ করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে উত্তরকালে কবি ইয়েট্‌সের অনেক সৃষ্টি বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে।

তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। গোড়াতে হয়তো পুত্রেরও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবার বাসনা ছিল। কিন্তু একুশ বছরে পৌঁছুবার পর লেখার তাগিদে ইয়েট্‌স্ চিত্রকলার পথ ছেড়ে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন।

এই সময় 'গেলিক' আন্দোলনের আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ইয়েটস্ সাহিত্য এবং রাজনীতিতে জাতীয় জীবনে এক আদর্শ পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হন।

শুধু ডাবলিন শহরেই নয়, লণ্ডন শহরেও তাঁরই প্রচেষ্টায় দু'টি 'আইরিশ লিটেরারী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৯৯ সনে একটি জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজেও মঞ্চের জন্য প্রচুর লেখেন।

সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। ক্রমে তিনি মৌলিক রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। বহু এবং বিচিত্র কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তাঁর অবদান বড় কম নয়।

স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তারই স্বীকৃতি হিসাবে ইয়েটস্ অ্যায়র্ল্যাণ্ডের বিধানসভায় সদস্য হিসাবে যুক্ত ছিলেন ১৯২২ থেকে '২৮ সন পর্যন্ত।

কবি ইয়েটসের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—The Wind among the Reeds, The Wild Swans at Coole, Discouragement, Responsibilities ইত্যাদি।

টি. এস. এলিয়ট (T. S. Eliot), ১৮৮৮-১৯৬৪

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৪৮), প্রখ্যাত অ্যাংলো-আমেরিকান কবি।

আমেরিকায় জন্ম হলেও পঁচিশ বছর বয়স থেকে এলিয়ট ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করেন ; ১৯২৭ সনে সেখানকার নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হন।

হার্ভার্ড, প্যারিস এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা পান। সাহিত্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবার আগে এলিয়ট নানা বৃত্তিতে যুক্ত ছিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী ছিলেন ১৯৩২-'৩৩ সনে। ব্যাঙ্কেও কিছুদিন কাজ করেছেন। তারপর ইংলণ্ডের কোন একটি বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে। এছাড়া দীর্ঘদিন সম্পাদনার কাজেও তাঁকে দেখা যায়ঃ স্বপ্রতিষ্ঠিত (১৯২২ সন) Egoist পত্রিকা, ১৯১৭-১৯ এবং বিখ্যাত 'The Criterion' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৯৩৯ সন পর্যন্ত।

ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া অ্যাংলো-ক্যাথলিক। কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, এমন কি ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে এলিয়ট পুরানো ঐতিহ্যের পূজারী ছিলেন। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ফরাসী ভাবধারা, জেমস জয়সের 'য়ুলিসিস' এবং বন্ধু এজরা পাউণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Prufrock ১৯১৭ সনে প্রকাশিত হয়। তিন বছর বাদে আর একটি কাব্যগুচ্ছ বেরোয়।

১৯২২ সনে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'The Waste Land'-এর আত্ম-প্রকাশ আধুনিক কাব্যজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশবিদেশে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এর তিন বছর বাদে আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি—The Hollow Men—প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ দু'টিতে শুষ্ক, নিষ্ঠুর পৃথিবীর লীলাখেলার প্রকৃতির ব্যঞ্জনা, হতাশার সুর। Ash Wednesday-ও বিশেষ উল্লেখ্য।

শুধু কবি নন, একজন সমালোচক এবং নাট্যকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না। Murder in the Cathedral গ্রন্থটিতে নাট্যকার এলিয়টের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে।

তবে কবির বিরুদ্ধে একটি সরব অভিযোগ শোনা যায়ঃ এলিয়টের কাব্য সহজবোধ্য নয়, হয়তো তা সাধারণ কাব্যরসিকদের জন্যে ও নয়।

(ফরাসী)

ভিক্তর হিউগো (Victor Hugo), ১৮০২-'৮৫

এদেশে বা আমেরিকায় বা অন্য কোথায় তিনি সাধারণত প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বলে পরিচিত হলেও ভিক্তর হিউগো স্বদেশে জাতীয় কবি বলেই শ্রদ্ধেয়। ফরাসী সাহিত্যে রোমান্সের প্রবর্তকও তিনি। অবশ্য সমসাময়িক কালে নাট্যকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না।

তাঁর জন্ম বেসানকো-তে। পিতা যোসেফ নেপোলিয়নের সেনা-বাহিনীতে একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। পরে তিনি স্পেনের রাজ্যপাল হন। স্পেনে পিতার সেই বিরাট প্রাসাদে বালক ভিক্তরকে নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে হয়।

বাল্যকালেই কাব্যের প্রাত তাঁর বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি যে কবিতা রচনা করেন, ফরাসী

একাডেমীতে তা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। এবং দু' বছর বাদে কিশোর ভিক্তর 'একাডেমী অব ফ্লোরাল গেমস'-এ প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। এর দু' বছর বাদে তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অষ্টাদশ লুই ভিক্তরকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন। পঁচিশ বছরে পৌঁছুতে তিনি তরুণ কবিগণের মধ্যমাণ বলে চিহ্নিত হন। ১৮২২ সনে তাঁর কবিতাগুচ্ছ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

যৌবনে রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও উত্তরকালে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এ জন্য তাঁকে উনিশ বছর নির্বাসিত জীবনের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই নির্বাসিত জীবনেই তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস (Les Miserables)—ঐ শতাব্দীর সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন।

রাজশক্তির পতনের পর ১৮৭০ সনে স্বদেশবাসীর বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে ভিক্তর প্যারিসে ফিরে আসেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ—La Legende des Siecles। অন্যান্য—Les Chatiments, Les Orientales.

উপন্যাস—Notre Dame de Paris, Quatre-vingt-treize.

নাটক—Cromwell, Hernani.

শার্ল পিয়েরে বোদলেয়ার (Charles Pierre Baudelaire), ১৮২১-৬৭

ফরাসী সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি বলে প্রখ্যাত হলেও নিঃসন্দেহে বোদলেয়ার আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

প্যারিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হয়েও ছেলেবেলা থেকেই তিনি এক ছন্নছাড়া বেপরোয়া প্রকৃতির হয়ে ওঠেন। সমাজ ও

সংস্কৃতির প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধে ক্রমে তাঁর তরুণ মন বিদ্রোহ করে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের উপদেশ-নির্দেশে কোন ফল হয় না। বোদলেয়ার আপন খেয়াল-খুশিতে চলতে থাকেন।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই বোদলেয়ার সাহিত্যের চলিত গতি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্বাধীন মতবাদ সরবে প্রকাশ করেন। ফলে, তাঁকে কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। বোদলেয়ার কিন্তু কিছু মাত্র বিচলিত হন না, তাঁর সাধনার পথে বিভ্রান্তিও আসে না।

এমনি ভাবে তিনি একঘেয়ে সাহিত্যের মধ্যে আনেন নতুন রোমাঞ্চ, নতুন স্বাদ।

'ফ্ল্যর দ্যু মাল' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৮৫৭ সনে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যের চলিত গোঁড়ামির ওপর তীব্র কষাঘাত হানে। এ জন্য পুরানো-পন্থীদের কাছে তিনি নিন্দিত হলেও বোদলেয়ারের প্রতিভা কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না।

বোদলেয়ার আসলে ছিলেন চৈতন্যের পূজারী। তাই কঠিন সমালোচনায় লাঞ্ছিত হলেও সেই পুরানো অনুশাসনের কাছে নিজেকে তিনি বিকিয়ে দেন না।

এরপর তিনি এডগার এ্যালেন পো'র রচনা থেকে কিছু অনুবাদ করেন। পো'র ওপর বোদলেয়ার কিছু প্রবন্ধও লেখেন।

জীবিতকালে তাঁর দুঃসাহসিক সৃষ্টির জন্য বিড়ম্বিত হলেও, মৃত্যুর পর বোদলেয়ার বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর তথাকথিত সেই অপাঙক্তেয় রচনা হয়েছে বহু ভাষায় অনূদিত। বিংশশতাব্দীর দেশ-বিদেশের কবিদের ওপর তাঁর প্রভাবও বড় কম পড়েনি।

(জার্মান)

যোহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ ফন্‌ গ্যেটে (J. W. V. Goethe), ১৭৪৯-১৮৩২

যে ক'জন মনীষীর জন্মে পৃথিবী ধন্য, নিঃসন্দেহে গ্যেটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তিনি শুধু জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার নন, সর্বকালের ও সর্বদেশের মহাকবি।

পিতার ইচ্ছানুসারে গ্যেটে আইন বিদ্যা শিক্ষা করেন। কিন্তু এই পেশাদারী বিদ্যা তাঁর মনে সাড়া জাগাতে পারে না। ক্রমে সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তরুণ গ্যেটের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। এবং এ সব বিষয়ে অত্যধিক পড়ার চাপে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ফলে, সাময়িক ভাবে তাঁর লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

অল্প বয়সেই তাঁর সাহিত্য-চেতনা জাগে এবং তিনি লিখতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের উন্মেষও হয় তরুণ বয়সে।

এক সময় ওয়েজলারে গ্যেটে আইন বৃত্তি শুরু করেন। কিন্তু সে সময় এক সুন্দরীর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা ঘটনার আবর্তে পড়ে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি আত্মহত্যারও উদ্যোগ করেছিলেন। The Sorrows of Young Werther কাব্যগ্রন্থটি তাঁর এই ব্যক্তিগত ঘটনা-কেন্দ্রিব।

১৭৭১-'৭৫ সন গ্যেটের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সফল রূপায়ণে সমৃদ্ধ। এ সময়েই তিনি বিখ্যাত Faust কাব্য-নাটকটি লিখতে শুরু করেন। প্রথম পর্বটি শেষ হয় তাঁর একান্ন বছর বয়সে, দ্বিতীয় পর্বটি পঞ্চাশ বছরে আরম্ভ করে ি শি বছর বয়সে শেষ করেন। এটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি বলে স্বীকৃত।

১৭৭৫ সনে ডিউক কার্ল আগস্ট-এর নিমন্ত্রণে গ্যেটে জার্মান সাহিত্য এবং সংগীতের তীর্থক্ষেত্র ভাইমের শহরে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তিনি বাস করেন।

জীবিত কালে রাষ্ট্রমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় নাট্যবিভাগের অধিকর্তা এবং আরও বহু দায়িত্বশীল পদ গ্যেটে অলংকৃত করেছেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :—Hermann and Dorothea, West—Osticher Divan এবং Dichtung and Wahrheit ও Wilhelm Meisters Lehnjahne। পরের দু'টি আত্মচরিতমূলক কাব্যগ্রন্থ।

হেইনরিখ হাইনী (Heinrich Heine), ১৭৯৭-১৮৫৬

জার্মান সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। দরিদ্র ইহুদা পরিবারের সন্তান ছিলেন হাইনী। উত্তর কালে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

গোড়াতে পিতার ইচ্ছায় হাইনী ব্যবসায়ী হবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, সে পথ তাঁর নয়। তখন এক ধনী খুল্লতাতের সৌজন্যে ব্যবসা ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দেন। তিনি বন্ এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

তখনও তিনি স্নাতক উপাধি লাভ করেন নি। ছাত্র জীবনে এক অপ্রীতিকর প্রণয়-ঘটনা কেন্দ্র করে তাঁর কাব্য-প্রতিভা প্রথম বিকশিত হয়।

পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর কবিতা-গুচ্ছ প্রথম প্রকাশিত হলেও, ১৮২৬-'২৭ সনে ভ্রমণ-কেন্দ্রিক দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত তিনি সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। ঐ বছরই তাঁর The Book of Songs প্রকাশিত হতে হাইনীর কবিখ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অবশ্য এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন আগেই তিনি সাহিত্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে সিদ্ধান্ত করেন। এর পর একে একে তাঁর বিভিন্ন অনবদ্য সৃষ্টি প্রকাশিত হতে থাকে এবং হাইনী'র খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৩০ সনের জুলাই মাসে বিপ্লব শুরু হ'তে নানা প্রতিকূল অবস্থার আবর্তে পড়ে কবিকে স্বদেশ ত্যাগ করে প্যারিস-শহরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। বাকী জীবন তিনি প্যারিসে কাটান। জীবনের শেষ সীমান্তে দীর্ঘ আট বছর হাইনী বাতে পঙ্গু হয়ে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল শেষ পর্যন্ত প্রাণবন্ত, সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জ্বল। এই সময়ই সৃষ্টি হয়েছিল দু'টি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ —Last Poems এবং Thoughts. কবির মৃত্যুর পর উক্ত কাব্য-গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হ'তে তাই কাব্যরসিকমণ্ডলী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছিলেন। তাঁরা নীরবে কবির উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন বিনম্র শ্রদ্ধা।

(রুশ)

আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন (Alexander Puskin), ১৭৯৯-১৮৩৭

রুশ-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শুধু কবিকুলের শিরোমণি নন, কাব্যরূপের আবিষ্কর্তা।

মস্কো শহরে পুরনো অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। বিশেষ করে মাতৃকুলের গরিমায় পুশকিন বিশেষ গৌরব বোধ করতেন। অভিজাতদের প্রচলিত রীতিমতো তাঁদের ঘরের ভাষাও ছিল ফরাসী ; পুশকিনও সে ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। রুশ ভাষা তিনি শিখেছিলেন মেহনতীদের মুখ থেকে ; বাড়ির ঝি-চাকর বিশেষ করে পালিকা ঝি'র মুখ থেকে ; লোকগাথা শুনে-শুনে তিনি সে-ভাষার প্রাণবস্তু জেনেছিলেন।

পুশকিন কবিতা লিখতেন বালক বয়স থেকেই—ফরাসী এবং রুশ উভয় ভাষাতেই। ষোল বছর বয়সে তিনি যখন পরীক্ষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, দেরঝাভিন আত্মহারা হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেন।

বারো বছর বয়সে শিক্ষার জন্য পীতর্সবুর্গের 'জার-সদন' শিক্ষায়তনে তিনি ভর্তি হন। ছ'বছরে স্নাতক হন। বিশেষ করে পড়েছিলেন

ভলতেয়ার এবং লাতিন। আর সেই সঙ্গে হাত পাকাচ্ছিলেন জাতীয় ভাবের কবিতা লেখায়।

পাঠ শেষে বৈদেশিক বিভাগে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি 'দেকাব্রিস্ত চক্র'-এ আনাগোনা করতে দ্বিধা করেন না। এই সময় 'রুসলন ই ল্যুদমিলা' কথাকাব্য প্রকাশিত হতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

অবশ্য এটি প্রকাশের অল্পদিন আগে পুশকিনের উদ্দামতাকে দমনের জন্য সরকারী আদেশে তিনি দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রেরিত হন, বিশেষ করে "স্বাধীনতা"-র স্তবগীত কাব্যটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেখানেও তাঁর উদ্দামতা শান্ত হয় না—'ককেশাসের বন্দী'দের উদ্দেশ্যে দুঃসাহসিক কবিতা লেখেন। ফলে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে কর্মচ্যুত করে তাঁর পিতার জমিদারিতে তাঁকে অন্তরীণ করেন।

চার বছরের ঐ অন্তরীণে তিনি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে বেপরোয়া ভাবে কাব্য সাধনা শুরু করেন। 'য়েভ্‌গেনিয় অনিগিন' এই সময়ই পুশকিন লিখতে আরম্ভ করেন। এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি—দীর্ঘ আট বছর ধরে কাব্যটি রচনা করেন। 'পোল্‌তভা' আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। 'বোরিস গোদুনভ' কাব্যনাটকটিও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

রাষ্ট্রবিপ্লবের ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়লেও জার-এর সৌজন্যে তিনি মুক্তি পেয়ে পীতর্সবুর্গে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পান।

তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। স্ত্রীকে কেন্দ্র করে এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহত হয়ে পুশকিনের মৃত্যু হয়।

(আমেরিকা)

হেনরী ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো (H.W.Longfellow), ১৮০৭-'৮২

ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ জনমন-জয়ী কবি। জীবিতকালে বিশ্বের অন্য কোন কবি লংফেলোর মতো স্বদেশবাসীর

কাছে অত জনপ্রিয় হয়েছিলেন বলে জানা নেই। লংফেলো ছিলেন একজন সত্যিকারের দরদী কবি। তাই তিনি কালগত হয়েও কালজয়ী।

দীর্ঘ জীবনে কবি লিখেছেন অজস্র। শুধু বড়দের জন্যই নয়, কিশোরদের মন-জয়ী কবিতাও তিনি বড় কম লেখেননি।

তাঁর সৃষ্টির ব্যাপ্তি যেমনি ছিল বিপুল, তেমনি বিচিত্র। রূপে, বর্ণে স্বাদে কোনটিই কম লোভনীয় নয়।

Hiawatha এবং Evangeline কাব্যগ্রন্থ দু'টি বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু কবির নিজের মতে—'Christus' তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এটি তিনটি কাব্যগ্রন্থের সমষ্টি, প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সনে।

দান্তের বিখ্যাত Divine Comedy-ও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অনুবাদ করে মার্কিন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। বোডিন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তী কালে উক্ত শিক্ষায়তন দু'টিতে তিনি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনায় ব্রতী হন—১৮২৯-'৩৪ সন বডিন কলেজে এবং ১৮৩৬-'৫৪ সন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৪৩ সন থেকে তিনি ক্যাম্‌ব্রিজে স্থায়ী ভাবে বাস করেন।

শিক্ষকতার কাজে যোগ দেবার আগে লংফেলো তিন বছর ইয়োরোপের নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ঐ ভ্রমণের ফলে তিনি শুধু সে-সব আঞ্চলিক ভাষাই আয়ত্ত করেননি, তাঁর সেই ভ্রমণ-লব্ধ অভিজ্ঞতা উত্তরকালে অনেক অসামান্য কবিতা সৃষ্টির উৎস হয়েছিল।

তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। বিশেষ করে দ্বিতীয়া স্ত্রী'র মর্মান্তিক মৃত্যুর আঘাত লংফেলোকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পীড়া দিয়েছে। অত নাম যশের মধ্যেও তিনি সে ব্যথা ভুলতে পারেননি। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের সেই বেদনা কখনও কবির সৃষ্টির অন্তরায় হয়নি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লিখেছেন।

এডগার অ্যালেন পো (Edgar Allan Poe), ১৮০৯-'৪৯

বিশ্বসাহিত্যে পো'র প্রভাব অসামান্য। তিনি শুধু বিশ্বের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না, সমালোচক এবং ছোটগল্পের লেখক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না।

কবি ইয়েটস তাঁকে একজন 'মহান লিরিক কবি' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। আর, টেনিসনের মতে, তিনি ছিলেন আমেরিকানদের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক প্রতিভার অধিকারী।

তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে বহু বিচিত্র অবদানে পো যেমন মার্কিন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন নিঃস্ব, তা ছিল হতাশায় ভরা।

বস্টনে তাঁর জন্ম। মাত্র দু'বছর বয়সেই তিনি পিতা-মাতাকে হারান। অনাথ শিশু এক ধনী তামাক-ব্যবসায়ীর দয়ায় বড় হতে থাকে। দশ বছর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান। এক সহৃদয় ব্যবসায়ীর সৌজন্যে সেখানে স্কুলে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি সে-পরিবারের সঙ্গে আমেরিকায় ফিরে এসে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু কিছুদিন বাদে তাঁর পালক-পিতা পো'কে পড়াশুনা ছাড়িয়ে একটি ব্যবসায় ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু সে চাকুরি তাঁর ভাল লাগে না। ইস্তফা দিয়ে সেনাবিভাগে নাম লেখালেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মন টেঁকে না। কিছুদিন পর ছাড়া পেয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নেন। আরও কিছুদিন পরে তাঁর পালক-পিতার মৃত্যু হতে পো বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হন। জীবিকার জন্য সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। নানা পত্রিকায় তিনি কাজ করেন। নিয়ত তাঁকে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। মনে দারুণ অশান্তি। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবুও তিনি আমেরিকার সাহিত্যের গৌরব বাড়িয়েছেন আপন সৃষ্টির গুণে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ দি র‍্যাভেন, টু হেলেন, ড্রিমল্যাণ্ড ইত্যাদি।

ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman), ১৮১৯-'৯২

তিনি ছিলেন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। সে-দেশের গণতন্ত্রের কবি, জাতীয় কবি বলেও হুইটম্যান স্বীকৃত। তিনি সাধারণ মানুষের জয়গান করেছেন, তাদের গৌরবও বাড়িয়েছেন। এই চারণ-কবির সমগ্র সৃষ্টি মানবতার জয়গানে মুখরিত। তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও তিনি ছিলেন একজন বড়ো প্রবক্তা। বলেছিলেন, এমন কোন কিছুকেই আমি ভালো মনে করি না, যাতে ব্যক্তি-মানুষ উপেক্ষিত হয়।

ব্রুকলিন শহরে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করারও সুযোগ তিনি পাননি। মাত্র এগার বছর বয়সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে হুইটম্যানকে অফিস-বয়ের কাজ নিতে হয়। তারপর কখনো প্রেসের টাইপ-সেটার কখনও বা লেখকের লেখায় তিনি জীবিকা অর্জনের প্রয়াস পান।

১৮৩৬ সনে তিনি একটি ভ্রাম্যমাণ পল্লী-শিক্ষকের চাকুরি পান। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে হুইটম্যান খবরের কাগজে সম্পাদনা এবং মুদ্রণের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন। পাঁচ বছর ঐ শিক্ষকতার কাজে ব্রতী ছিলেন। তারপর নিউইয়র্কে এসে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি বেশ কিছু কবিতা লেখেন। সে-সব কবিতা সংগ্রহ করে ১৮৫৫ সালে **'লিভস্ অব গ্রাস'** নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বারটি কবিতার সংকলন। উত্তরকালে এই গ্রন্থটি একটি অসামান্য সাহিত্য-কীর্তি বলে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত হয়। প্রধানতঃ এই গ্রন্থটি-ই হুইটম্যানকে অমর করে রেখেছে। সংকলনটি আত্মচরিত-মূলক হলেও মানবতার জয়গানে মুখরিত।

উক্ত গ্রন্থের কবিতাবলীর রচনা শুরু হয়েছিল কবির ত্রিশ বছর বয়সে এবং তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত যত কবিতা লিখেছেন তা সবই এই

কাব্যগ্রন্থটির নতুন সংস্করণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবির মৃত্যুর বছরে ঐ গ্রন্থটির শেষ সংস্করণ (নবম) ৪২৩টি কবিতা নিয়ে নবরূপে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সংস্করণে নতুন নতুন সংযোজনের মাধ্যমে মানুষ এবং সমাজের বিবর্তনও যথাযথভাবে বিধৃত হয়েছে।

'ডেমোক্রাটিক ভিস্টাস' (১৮৭১) অর্থাৎ 'গণতান্ত্রিক পথ-দৃশ্য' তাঁর আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এটি হুইটম্যানের স্বদেশ ও স্বকীয় সমাজলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

হুইটম্যান আজীবন সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের জয়গান গেয়ে গেছেন। তাই তাঁর আত্মকথা সহজেই সকলের কথা হিসেবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রবার্ট ফ্রস্ট (Robert Frost), ১৮৭৫

সানফ্রান্সিসকোতে জন্ম হলেও ছেলেবেলা থেকেই ফ্রস্ট নিউ ইংলণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা।

ঠিক কবে থেকে বা কি করে তাঁর সাহিত্য-চেতনার উন্মেষ হয়েছিল বলা মুস্কিল। তবে ফ্রস্টের প্রথম কাব্যগ্রন্থ—A Boy's Will ১৯১৩ সনে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ১৯৩০ সন পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছর একটি করে অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ তিনি কাব্যরসিকদের হাতে তুলে দেন।

ফ্রস্টের কাব্যসম্ভার রসোত্তীর্ণ। তাঁর সে-সব সৃষ্টি প্রধানতঃ নিউ ইংলণ্ডের পল্লীঅঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনামূলক। পল্লীঅঞ্চলের সেই অপরূপ রূপ নিপুণ শিল্পীর হাতে নিখুঁত ভাবে রূপায়িত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ফ্রস্ট অনন্যসাধারণ, তাঁর সৃষ্টি হৃদয়স্পর্শী।

১৯১৬ সন থেকে দীর্ঘ দশ বছর তিনি আমহার্স্ট কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজে ব্রতী ছিলেন। মাঝে দু' বছর (১৯২১-২২) সেই শিক্ষকতার কাজে ছেদ পড়েছিল, হয়তো সাহিত্যের তাগিদে। সে সময় তিনি সাহিত্যে পুরোপুরি ব্যাপৃত ছিলেন।

(স্পেনীয়)

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল (Gabriela Mistral), ১৮৮৯-১৯৫৭

চিলির আধুনিক কাব্য প্রবর্তনের গৌরব শ্রীমতী মিস্ত্রাল-এর। তাঁর আসল নাম—'লুসিয়া গদয় আলকায়াগা'—ছদ্মনামের অবগুণ্ঠনে প্রায় অজ্ঞাত।

চিলির উত্তরাঞ্চলে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। স্কুলের পাঠ শেষ করে পনেরো বছর বয়সে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে মিস্ত্রাল শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার থেকে কন্যার মধ্যে কাব্য-প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। তারপর প্রথম যৌবনে যে পুরুষকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হতে মিস্ত্রাল দারুণ আঘাত পান। এই আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই তাঁর কবিতার সৃষ্টি।

দীর্ঘদিন তিনি গোপনে কাব্যচর্চা করেছেন। তারপর ১৯১৪ সনে এক কবিতা প্রতিযোগিতায় মিস্ত্রাল এই ছদ্মনামে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তবুও তিনি আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন। উক্ত প্রতিযোগিতার পর থেকে মিস্ত্রাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে কবিতা লিখতে শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে চিলির কাব্য-রসিকদের মধ্যে তাঁর আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে তিনি দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবেও কাজ করবার সুযোগ পান এবং যোগ্যতার সঙ্গে তা সম্পন্ন করেন।

১৯২২ সনে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Desolacion নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় গ্রন্থটি—Tala বা Havoc—১৯৩৮ সনে আত্মপ্রকাশ করে। সুইডিশ ভাষায় তাঁর কবিতা অনুবাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৫ সনে মিস্ত্রাল নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

তবুও তাঁর মতো উপেক্ষিতা হয়তো আর কেউ নেই। উক্ত দুর্লভ পুরস্কার পাবার এগারো বছর পরে আজ পর্যন্ত তাঁর রচনার মাত্র

একটি ছোট্ট সংকলন ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে—Selected Poems, tr. by Langston Hughes. Oxford Companion to English Literature নামক বিরাট গ্রন্থটিতেও এই দুঃখের কবি স্থান পাননি।

প্রসঙ্গতঃ, শ্রীমতী মিস্ত্রাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের শুধু বিশেষ অনুরাগীই ছিলেন না, তাঁর রচনা শ্রীমতীর কাব্যাদর্শকেও প্রভাবান্বিত করেছিল।

ফাদারিকো গারথিয়া লরকা (Federico Garcia Lorca), ১৮৯৯-১৯৩৬

আধুনিক স্প্যানিশ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—নিঃসন্দেহে লরকা ছিলেন স্প্যানিশ জনগণের সবচেয়ে বেশী প্রিয় কবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে তিনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করতে স্থির করেন। কবিতা লিখে প্রকাশ্য রাজপথে লরকা তা আবৃত্তি করতেন। শুনতে শুনতে লোকের ভিড় জমে যেতো। ১৯২১ সনে তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি লোকগাথার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল।

১৯২৯ সনে লরকা আমেরিকার নানা অঞ্চলে ভ্রমণে যান। ঐ সময় সেখানে তাঁর কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হতে তাঁর কাব্য-প্রতিভার সুখ্যাতি দেশের গণ্ডির বাইরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

'জিপসী-গাথা' কাব্যগ্রন্থটি সম্ভবত লরকার শ্রেষ্ঠ অবদান—জনগণের সবচেয়ে প্রিয় তো বটেই। সব শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করবার মতো এমন একটি কাব্যগ্রন্থ ঐ সাহিত্যে দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়নি। এটির প্রকাশকাল ১৯২৮ সন।

তাঁর কবিতাগুলি এক সময় লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে; কোথাও বা লরকার কবিতার সার্থক নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছে। কোন কবির জীবিতকালে তাঁর কবিতার এমন সমাদর দুর্লভ। নাটক

লেখায়ও লরকা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি কম সুখ্যাতি পাননি।

ছাত্র সমাজেও লরকার প্রতিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। প্রগতিবাদী কবি হিসেবে জনগণের হৃদয়ে তাঁর আসন ছিল সুদৃঢ়। ফ্রাঙ্কো সরকার হয়তো এঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত হয়েছিল। ফলে ফ্রাঙ্কোর ষড়যন্ত্রে নির্মমভাবে লরকার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। গৃহ-যুদ্ধের ডামাডোলে অন্যান্য লোকের মতে আকস্মিক ভাবে লরকার মৃত্যু হয়নি। হয়তো তাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যুও লরকার কবি-খ্যাতির পথ আরও সুগম করতে সাহায্য করেছিল।

(পারসিক)

ওমর খৈয়াম (Omar Khayyam), ১০৫০-১১২৩

'রুবাইয়াৎ' এই বিশ্ববন্দিত কাব্যগ্রন্থটির নাম কে না জানে? কালগত হয়েও কালজয়ী। মূল গ্রন্থটি ফারসী ভাষায় লেখা, প্রায় পাঁচ শ' রুবাই বা চতুষ্পদী কবিতার সংকলন। রচয়িতা—ওমর খৈয়াম। এই ছোট্ট কাব্যগ্রন্থটি লিখে ওমর খৈয়াম যে জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব।

কিন্তু মজার কথা, জীবিতকালে তাঁর কোন কবি-খ্যাতি ছিল না—একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে 'ওমর প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ওমর বা 'গিয়াসুদ্দীন আবুল-ফতহ ওমর বিন্ ইব্রাহিম্ অল-খৈয়ামী' পারস্য দেশের খোরাসান অঞ্চলের নীশাপুরে জন্মেছিলেন।

বীজগণিত সংক্রান্ত আরবী ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থ এবং ঐ শ্রেণীর আরও কয়েকটি রচনার জন্য সে সময়কার শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের অন্যতম বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। রাজসভায় সুলতানের জ্যোতির্বিদের আসনটিও তিনি অলংকৃত করেছিলেন।

নিজের খেয়াল খুশিতে এই বিজ্ঞানী কখন লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সমস্ত চতুষ্পদী কাব্য রচনা করেছিলেন বলা মুস্কিল। এই অমূল্য কাব্য-রত্ন হয়তো চিরদিন বিশ্ববাসীর অজ্ঞাতই থেকে যেতো, যদিনা ঘটনাচক্রে কবি এডওয়ার্ড ফিট্‌জজেরাল্ড (১৮০৯-'৮৩) এর সন্ধান পেতেন।

গোড়াতে কবি ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড ছদ্মনামে পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করে প্রকাশিত করেন, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এর ন' বছর বাদে পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য বহু সংস্করণ হয়।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'রুবাইয়াৎ'-ও ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে। তাও একটি দু'টি সংস্করণ নয়।

সাদী (Sadi), ১১৮৪-১২৯১

প্রসিদ্ধ ফারসী কবি। তাঁর আসল নাম ছিল—মুসলিহুদ্দিন আবদুল্লা। জন্ম পারস্য দেশের সীরাজ শহরে।

বাগদাদ-এ তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি ভবঘুরের মতো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কোথাও বেশী দিন স্থির হয়ে থাকতেন না। তবে প্রধানত ভারতবর্ষ এবং আবিসিনিয়ার নানা অঞ্চলের প্রতিই যেন এই ভবঘুরে কবির প্রাণের টানটা বেশী ছিল। এমনি ভাবেই ভ্রমণের মধ্যে তাঁর ত্রিশ বছর কেটে যায়। তারপর সাদী একসময় সুফী ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সীরাজ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

তাঁর প্রতিভাও প্রধানতঃ গীতি-কাব্যে বিকশিত হয়। সে-ব্যঞ্জনা ফারসী সাহিত্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যান্য ভাষায়ও রূপায়িত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বস্তান' এবং 'গুলিস্তান' কাব্যগ্রন্থ দু'টি সাদীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি ইংরেজীতে অনূদিত হয় যথাক্রমে ১৮৭৩ এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গীত-রসিকদের কাছে সাদী'র গজলগুলি আজও অম্লান হয়ে আছে।

হাফিজ (Hafiz), ?—১৩৮৯

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফারসী কবি। তাঁর আসল নাম ছিল—শামসুদ্দিন মহম্মদ।

ঠিক কবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলা শক্ত। তা গবেষণার বিষয়বস্তু। তবে নিঃসন্দেহে হাফিজ পারস্য দেশের সীরাজ শহরের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথমে এ পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন। কবির জীবন-দীপটি নিভেছিল আনুমানিক ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।

তাঁর সৃষ্টি প্রধানতঃ গীতি-কাব্য। কখনও বা প্রকৃতি-কেন্দ্রিক। 'দিয়ান' কাব্যগ্রন্থটি হাফিজের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে চিহ্নিত। মূলত এই গ্রন্থটি কতগুলি অনবদ্য গজল গানের সমষ্টি।

স্বদেশের বাইরেও উক্ত কাব্য-গ্রন্থটি সমাদর লাভ করেছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল, গদ্য-ছন্দে।

হাফিজের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত উত্তরসূরিগণ তাঁর প্রভাব এড়াতে পারেননি।

মৃত্যুর পর সীরাজ শহরেই তিনি সমাধিস্থ হন। আজও হাফিজের সেই সমাধি তীর্থস্থানের মর্যাদা পেয়ে থাকে।

(ভারতীয়)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬১-১৯৪১

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বিশ্বকবি নামে তিনি প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়।

১৯১৩ সনে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এসিয়াবাসীদের মধ্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র রবীন্দ্রনাথ-ই সাহিত্যে উক্ত পুরস্কারটি লাভ করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ তাঁকে ঐ

পুরস্কারটি এনে দিয়েছিল। তবুও ভাগ্যিস, রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থটি নিজে অনুবাদ করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কার পাবার পর সে সময় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে হৈ-চৈ'র অন্ত ছিল না।

দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ বিদেশে শুধু একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী বিস্ময়কর প্রতিভার তুলনা কোথায়?

উক্ত কাব্যগ্রন্থটি আর যাই হোক রবীন্দ্রপ্রতিভার একমাত্র পরিচায়ক গ্রন্থ নিশ্চয়ই নয়। যদিচ এটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ কবি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে বিপুলতর সৌভাগ্যের অধিকারী হতেন। পরাধীন দেশে জন্মেও বিশ্বের দরবারে তিনি যে আসন অধিকার করে গেছেন—তাও বিস্ময়কর!

বিশেষ করে প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই জাতীয় কবির জীবন-চরিত পড়া একান্ত কর্তব্য। উৎসাহী পাঠকের পক্ষে এই মনীষীর নির্ভরযোগ্য জীবন-চরিত সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য নয় জেনে এখানে তার পুনরুল্লেখ করে বর্তমান গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করতে বিরত হলাম।

কথাসাহিত্য

(প্রাচীন যুগ)

ইস্কাইলাস (Aeschylus), ৫২৫-৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ

যে গ্রীক ট্র্যাজেডির ব্যাপ্তি এবং গভীরতা আজও বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যের প্রেরণার আকর তার প্রথম উন্মেষ দেখা যায় ইস্কাইলাস-এর রচনায়। গ্রীক-নাটকের জনকও তিনি। একজন উঁচুদরের কবি বলেও ইস্কাইলাসের খ্যাতি কম ছিল না।

ইলিয়ুসিস্ নগরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা সম্ভবত এথেন্সের শেষ রাজা কডরাসের বংশধর ছিলেন।

ঠিক কবে থেকে তাঁর ভেতর সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বা তিনি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন বলা শক্ত। তবে খ্রীঃ পূঃ ৪৯৯-তে ইস্কাইলাস স্বদেশে প্রচলিত নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ৪৮৫ খ্রীঃ পূঃ উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারটি লাভ করার গৌরব অর্জন করেন। উত্তরকালে তিনি তেরবার পুরস্কৃত হন।

একসময় এই প্রতিযোগিতায় তাঁর উত্তরসূরী সোফোক্লেস-এর কাছে পরাজিত হতে মনের দুঃখে ইস্কাইলাস্ দেশত্যাগী হন। এথেন্সে তিনি আর কোনদিন ফিরে আসেন নি। সিসিলির গেলা অঞ্চলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইস্কাইলাস শুধু সাহিত্য-চর্চাই করতেন না, পারস্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ম্যারাথন এবং সালামিসের যুদ্ধেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

তাঁর রচিত প্রায় সত্তর খানা নাটকের মধ্যে মাত্র সাতটির সন্ধান পাওয়া যায়। The House of Atreus ইস্কাইলাসের শ্রেষ্ঠ অবদান। এটি আসলে তিনটি নাটকের সমষ্টি—Agamemnon, The Libation-Bearers এবং The Furies.

সোফোক্লেস (Sophocles), ৪৯৫-৪০৫ খ্রীঃ পূঃ

এই নাট্যকার এথেন্সের শহরতলী কোলনাস্-এ জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর কাটে এবং ভালভাবে লেখাপড়া করারও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। গোড়াতে অভিনেতা হবার তাঁর স্বপ্ন ছিল। দু'বার অভিনয়ে অংশ গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর দুর্বল থাকার দরুণ সার্থক নট হবার বাসনা ত্যাগ করে সোফোক্লেস নাটক রচনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

৪৬৪ খ্রীঃ পূঃ নাটক রচনার প্রতিযোগিতায় শক্তিমান পূর্বসূরী ইস্কাইলাসকে পরাজিত করে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। উত্তরকালে অবশ্য সোফোক্লেস অন্যূন বিশবার ঐ দুর্লভ পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। সে সময় এথেন্সের রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

শতাধিক বিয়োগান্ত নাটকের তিনি স্রষ্টা। কিন্তু আজ আর সাতটির বেশীর সন্ধান পাওয়া যায় না।

সোফোক্লেস শুধু একজন শক্তিমান নাট্যকারই ছিলেন না, নৃত্য এবং গীতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ৪৮০ খ্রীঃ পূঃ পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় উৎসবে সংগীত-গোষ্ঠীকে পরিচালনা করবার জন্য সুদর্শন তরুণ সোফোক্লেস নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জীবিত কালেই যিনি খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্রের হীন চক্রান্তে তিনি কম বিড়ম্বিত হননি। পুত্রটি পিতার মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে বলে মিথ্যা অপবাদ রটাবার চেষ্টা করেছিল।

উল্লেখযোগ্য নাটক :—Oedipus, Antigone, Electra ও Ajax.

এউরিপিদেস্ (Euripides), ৪৮০-৪০৬ খ্রীঃ পূঃ

কৈশোরে তিনি শারীরিক ব্যায়াম-চর্চা করেন, প্রথম যৌবনে দর্শন-শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। লোকে ধরে নিয়েছিল, এউরিপিদেস্ নিশ্চয়ই একজন পেশাদার মল্লবীর হবেন। কিন্তু মাত্র আঠারো বছর বয়সে সকল জল্পনা মিথ্যা করে এউরিপিদেস্ গ্রীসবাসীর হাতে একটি অনবদ্য নাটক তুলে দিলেন। তিনি হলেন নাট্যকার।

৪৪১ খ্রীঃ পূঃ নাটক প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য একাধিক বার তিনি উক্ত পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেন। গ্রীসের অন্তর্গত অ্যাটিকায় এউরিপিদেস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কিন্তু সালামিস্-এ অতিবাহিত হয়।

প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেতিস শুধু তাঁর আজীবন অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিলেন না, বিশেষ গুণমুগ্ধও ছিলেন। তাঁর রচিত প্রতিটি অভিনয়ে সক্রেতিস্ উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করতেন।

জানা যায়, এক সময় একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের অনুগামী হওয়ার জন্য নির্যাতনের আশঙ্কায় এউরিপিদেস্ স্বদেশ ছেড়ে নিরাপত্তার জন্য ম্যাসিডনে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মরদেহ এথেন্স নগরে সমাধিস্থ করার জন্য তাঁর স্বদেশবাসীরা ম্যাসিডনের রাজার কাছে আবেদন করেন। কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করেন না। রাজোচিত ভাবে এউরিপিদেসের মৃতদেহ ম্যাসিডনে সমাধিস্থ হয়। তাঁর রচিত ৯২টি নাটকের মধ্যে আঠারোটির সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Medea, Electra এবং Iphigenia।

আরিস্তোফানেস্ (Aristophanes), ৪৪৮-৩৮৫ খ্রীঃ পূঃ

আরিস্তোফানেস্ এথেন্স নগরের অধিবাসী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি আসলে প্যানডিওনিস্ নামক উপজাতি-বংশোদ্ভব। উত্তরাধিকার সূত্রে অ্যাজিনা দ্বীপে তাঁর কিছু সম্পত্তিও ছিল।

এই প্রখ্যাত নাট্যকার প্রকৃতিতে রক্ষণশীল ছিলেন। হয়তো সে কারণে এথেন্সের নবজাগরণ তাঁর মনঃপূত ছিল না। গণতন্ত্রের আদর্শেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে সোফিস্টদের ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শও আরিস্তোফানেসের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি।

তিনি ছিলেন কমেডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাহিত্য জীবনে আরিস্তোফানেস্ প্রায় অনুরূপ সংখ্যক নাটক রচনা করেছেন। যদিও মাত্র এগারটির বেশী আজ আর আমাদের লভ্য নয়।

কবি হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্লেটো আরিস্তোফানেসের কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মতে, আরিস্তোফানেস্ ছিলেন মাধুর্যের প্রতিমূর্তি।

The Clouds তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। অন্যান্য নাটকের মধ্যে Bird এবং Frogs বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(আধুনিক যুগ)

(ইংরেজী)

উইলিয়ম সেক্‌স্‌পীয়র (William Shakespeare), ১৫৬৪-১৬১৬

কালগত হয়েও যে নামটি আজও বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে বেশী প্রোজ্জ্বল সেটি—উইলিয়ম সেক্‌স্‌পীয়র। সম্ভবত তিনি ১৫৬৪ সনের তেইশে এপ্রিল জন্মেছিলেন। আভন নদীর তীরে স্ট্রাটফোর্ড শহরে তাঁর জন্মস্থান আজ একটি তীর্থক্ষেত্র।

তাঁর পূর্বপুরুষদের পেশা ছিল চাষাবাদ। অবশ্য তাঁর পিতা স্থানীয় পৌরসভায় একটি সাধারণ কাজ করতেন।

পল্লীর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে বালক উইলিয়মের হাতেখড়ি হয়। ক্রমে তিনি লাতিন গ্রামার ও সাহিত্য এবং প্রাচীন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হন। কিন্তু পিতার নির্দেশে তেরো বছর বয়সেই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে কিশোর উইলিয়মকে কাজে নামতে হয়।

অল্পদিনের মধ্যে সে-জীবন তাঁর কাছে বিষময় হয়ে ওঠে। ঐ গতানুগতিক জীবনধারার বিরুদ্ধে উইলিয়মের মন বিদ্রোহ করে ওঠে। তেইশ বছর বয়সে উইলিয়ম ভাগ্যের সন্ধানে লণ্ডনের উদ্দেশে একদিন যাত্রা করেন। পেছনে থেকে যায় পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রী।

অপরিচিত জায়গায় নতুন পরিবেশে যুবক উইলিয়ম দিশেহারা হয়ে পড়েন। জীবিকার জন্য বহু কষ্টে মঞ্চের অভিনেতাদের ঘোড়াগুলি দেখাশুনা করার জন্য সামান্য বেতনে একটি চাকুরী জুটিয়ে নেন। ক্রমে ছোটখাট দু' একটা চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগও পান। তারপর নাটকের পাণ্ডুলিপির অনুলিপি, পুনর্লিখন ইত্যাদি কাজে অশংগ্রহণ করতে করতে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

তাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু হয় ১৫৯২ সনে। উইলিয়মের প্রথম সৃষ্টি "চতুর্থ হেনরী"। সেই থেকে একে একে সৃষ্টি হতে থাকে বিভিন্ন অনন্যসাধারণ নাটক—যা তাঁকে এনে দেয় আশাতীত খ্যাতি, অর্থ এবং

প্রতিপত্তি। ক্রমে তিনি নাট্যজগতে শিরোমণির গৌরব অর্জন করেন। রাণী এলিজাবেথও তাঁকে সম্মান দেখাতে দ্বিধা করেননি।

অনেকের মতে Hamlet তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। নাট্যকারের নিজের মতেও। এটির রচনাকাল ১৫৯৩ সন।

উইলিয়াম মেকপীস্ থ্যাকারে (W.M. Thackeray), ১৮১১-'৬৩

থ্যাকারে আমাদের এই কলকাতায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা এখানে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন।

সাহিত্যের তাগিদে স্নাতক উপাধি লাভ করা তাঁর পক্ষে আর হয়ে ওঠেনি। হয়তো সেই কারণে কর্মজীবন আইনবৃত্তি নিয়ে শুরু হলেও সে জগতে বেশীদিন থ্যাকারে ছিলেন না। ক্রমে তিনি সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেন। সেই সঙ্গে নিয়মিত ভাবে তিনি প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এমনি ভাবে শুরু হয় তাঁর সাহিত্য-জীবন।

অন্যূন ত্রিশখানা বই থ্যাকারে লিখেছেন। Vanity Fair তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

সমাজের প্রতিপত্তিশালীদের মধ্যে কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করলেই তাঁর লেখনী সক্রিয় হয়ে উঠত। বিভিন্ন স্তরের সামাজিক দোষগুণ বর্ণনায় থ্যাকারে ছিলেন নিপুণ শিল্পী। সংকীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা সম্বন্ধে তিনি ক্ষমাহীন ছিলেন। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়।

থ্যাকারের ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। স্ত্রী উন্মাদ হ'তে তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর অনেক রচনায় কারুণ্যের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

অন্যান্য গ্রন্থ : Barry Lyndon, Henry Esmond, The Virginians ইত্যাদি।

চার্লস ডিকেনস্ (Charles Dickens), ১৮১২-'৭০

শিশুকাল তাঁর কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। তাই শিক্ষায়তনের শিক্ষা দূরের কথা, নিয়মিত ভাবে তিনি লেখাপড়াই করতে পারেননি। ভাগ্যবিড়ম্বিত বালক ডিকেনস্‌কে ন' বছর বয়সেই উপার্জনের সন্ধানে রাস্তায় বেরুতে হয়। লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে ঐ বয়সেই তিনি কঠোর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উত্তরকালে এই অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বিধৃত হয়। তবুও এক সময় যাহোক করে দু' বছর সর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা লাভ করেন। চার্লস তাবপর পত্রিকা অফিসে রিপোর্টারের কাজে যোগ দেন। কাজে সুনাম অর্জন করতে তাঁর বেশী দিন লাগল না। কিন্তু তাঁর ভেতরের শক্তি পূর্ণ-বিকশিত হওয়ার জন্য ভিন্ন পথ খোঁজে।

রঙ্গমঞ্চ চার্লসকে হাতছানি দেয়। অভিনয় করে তিনি কিছু সুনামও অর্জন করেন। কিন্তু ক্রমে অন্যের কল্পনা আবৃত্তি করতে তাঁর মন বিদ্রোহ করে। তাই নিজের ভাবনাকে বাস্তব-রূপ দেবার জন্য চার্লস স্থির করেন। এবার শুরু হয় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সাধনা। ১৮৩৫ সনে তাঁর একটি রচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে চার্লস অগণিত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরের বছর 'পিক্‌উইক্ পেপারস্' প্রকাশিত হতে তিনি সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেন। 'ডেভিড্ কপারফিল্ড' তাঁর আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

১৮৪২ সনে আমেরিকা ভ্রমণ করে 'আমেরিকান নোটস্' এই ব্যঙ্গাত্মক রচনাটি লেখেন। তিন বছর বাদে ইতালি ঘুরে এসে 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকার সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু 'পিকচারস্ ফ্রম ইতালি' গ্রন্থটি লেখার তাগিদে অল্প কিছুদিন বাদে চাকুরিটি ছেড়ে দেন।

এবার গৃহসুখের আশায় তিনি সুন্দরী ক্যাথারিনকে ভালবেসে বিয়ে

করেন। কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয় না। তারপর একসময় এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ভগ্ন-স্বাস্থ্য, স্নায়বিক দুর্বলতায় ক্লিষ্ট, তায় অনিদ্রা ব্যাধির যন্ত্রণা। তবুও চার্লস হাতের লেখনী ছাড়তে পারেন না। এমনি এক বিনিদ্র রাত্রে তাঁর প্রিয় লেখনীটি হাতে নিয়েই লেখক চার্লস চোখ বুজলেন। আর চোখ খুললেন না।

টমাস্ হারডি (Thomas Hardy), ১৮৪০-১৯২৮

শিশুটি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হ'তে সকলে তাকে মৃত বলেই ধরে নেয়। অভিজ্ঞ ধাত্রীর মনে কিন্তু সন্দেহ জাগে। ঐ ধাত্রীটির এক প্রবল ঝাঁকুনিতে শিশুটির প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়। সেদিনের সেই শিশুটি উত্তরকালে ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল টমাস হারডি নামে প্রসিদ্ধ।

বাল্যকালে সংগীতের ওপর তাঁর গভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, এবং স্কুল-জীবনেই জীবন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তার উন্মেষ হয়। ষোল বছর বয়সে হারডি স্নাতক উপাধি লাভ করেন।

হোরেস মোলের কাছে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করবার সময় হারডি সাহিত্য ব্রতে দীক্ষিত হন। কিন্তু গুরুর দুঃখভারাক্রান্ত জীবনের প্রভাব হারডি এড়াতে পারেননি। বাইশ বছর বয়সে লণ্ডনে স্থাপত্যবিদ্যা এবং সাহিত্যচর্চা যুগ্মভাবে শুরু হয়। স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে তিনি হাকস্‌লি ও মিল-এর রচনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেন। এই সময় স্থাপত্যের ওপর একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখে তিনি সুধীজনের স্বীকৃতি পান এবং পুরস্কৃত হন। তখন তাঁর কিছু কবিতাও প্রকাশিত হয়।

কিছুদিন বাদে স্বাস্থ্যের অবনতি হতে হারডিকে তাঁর জন্মস্থানে ফিরে যেতে হয়। স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হতে তিনি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর 'ডেস্‌পারেট

রেমেডি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'আণ্ডার দি গ্রীনউড্ ট্রী' প্রকাশিত হ'তে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরের বছর 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড' প্রকাশিত হতে হারডি সুনামের শিখরে ওঠেন। Tess of the d'Urbervilles তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই উপন্যাসটি হারডিকে দেয় অপ্রত্যাশিত খ্যাতি এবং অর্থ। হারডির জীবন-দর্শনের মূল কথা,—মানুষ এক উদাসীন নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র।

অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' এবং রাজদরবার 'অর্ডার অফ্ মেরিট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

জর্জ বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw), ১৮৫৬-১৯৫০

জীবনের অর্ধেকের বেশী বয়স পর্যন্ত যে নাট্যকারকে ভাগ্যের সন্ধানে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল ১৯২৫ সনে তাঁর নামে নোবেল পুরস্কারটি ঘোষিত হয়।

পুরস্কারের টাকাটা কিন্তু বার্নার্ড শ' গ্রহণ করলেন না। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত টাকায় অ্যাংলো-সুইডিস লিটারারি ফাউণ্ডেশান স্থাপিত হয়। সে সংস্থার উদ্দেশ্য, সুইডিস সাহিত্যের ভালো ভালো বইগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করা। নাট্যকার হিসাবে পুরস্কৃত হলেও, সমালোচক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না।

তিনি পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পারিবারিক অবস্থার জন্য স্কুলের পাঠও তিনি শেষ করতে পারেননি। জীবিকার জন্য প্রথমে কিছুদিন কোন এক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। তারপর ১৮৭৬ সনে লেখক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লণ্ডনে যান। তিন বছর বাদে প্রথম উপন্যাসটি (Immaturity) শেষ করেন। কিন্তু কোন প্রকাশক জুটলো না। এ সময় অল্প কিছুদিনের জন্য টেলিফোন কোম্পানীতে তিনি সাধারণ কাজ করেন।

লণ্ডনে এসে দীর্ঘ দশ বছর তাঁকে মা ও বোনের উপার্জনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই সময় প্রতিদিন পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখে শ' একে একে পাঁচখানা উপন্যাস লেখেন। কিন্তু এবারেও কোন প্রকাশক পেলেন না। তখন নগদ প্রাপ্তির আশায় সংগীত ও নাটক সমালোচনা শুরু করেন। তারপর উইলিয়াম আর্চারের পরামর্শ এবং উৎসাহে শ' নাটক লিখতে ব্রতী হন। সময়টা মোটামুটি ১৮৯৪ সন।

শ্রীমতী শার্লটের সঙ্গে তাঁর বিয়েটাও হয়েছিল নাটকীয় ভাবে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন রহস্যে মণ্ডিত। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে শ'র উক্তিগুলি চমকপ্রদ। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী।

উল্লেখযোগ্য নাটক ঃ Saint Joan, Man and Superman, Getting Married ইত্যাদি।

জেমস্ জয়েস্ (James Joyce), ১৮৮২-১৯৪১

প্রখ্যাত আইরিশ ঔপন্যাসিক জেমস্ জয়েস তাঁর শৈশব থেকেই পিতার গর্বের সন্তান ছিলেন।

অনুভূতিপ্রবণ বালক জেমস্ ছ' বছর বয়সে জেস্যুইটদের সেরা বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। কিন্তু পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ তিন বছর বাদে জেমস্-এর শিক্ষায় ছেদ পড়ে। অগত্যা তাঁকে বাড়িতে দু' বছর বসে কাটাতে হয়।

তারপর পিতার চেষ্টায় ডাবলিনের বেলভেডিয়ার শিক্ষায়তনে বিনা বেতনে জেমস্ আবার পড়তে শুরু করেন। পনের বছর পর্যন্ত তিনি এখানেই শিক্ষা পান। মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তখন থেকেই লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই সময় 'ইউলিসিস'-এর ওপর একটি রচনা লিখে (My favourite hero) জেমস্ পুরস্কৃত হন।

পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও নানা বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে পড়াশুনা

করতেন। ল্যাটিন, ইতালি এবং ফরাসী ভাষা তিনি ঐ বয়সেই আয়ত্ত করেছিলেন। নাট্যকার ইবসেনের রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভের আগ্রহে নরওয়েজীয় ভাষাটিও জেমস্ শিখে নেন। তিনি কবিতাও লিখতেন। জেমস্ শুধু লেখা-পড়াতেই অগ্রণী ছিলেন না, শিক্ষায়তনের পাণ্ডাও ছিলেন। ১৯০২ সনে স্নাতক উপাধি লাভ করে জেমস্ ভাগ্যের সন্ধানে প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে নেন একটি পরিচয়-পত্র, কয়েকটি স্বরচিত কবিতা এবং এক স্টার্লিং।

জীবিকার জন্য পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়ান। এমনি ভাবে বছর গড়িয়ে যায়। রুগ্না মা তখন অন্তিমশয্যায়। জেমস্ ছুটে আসেন মা'র কাছে।

ক'দিন বাদে মা'র মৃত্যুর পর তিনি আবার বেরিয়ে পড়েন। ক্লিফটন স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকের কাজ করবার পর জেমস্ বিয়ে করেন। তারপর বার্ষিক অ.শি স্টার্লিং বেতনে শিক্ষকের পদে তিনি অস্ট্রিয়ায় পাড়ি দেন। এখানেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত Ulysses রচনা করেন। এটির পরিকল্পনা ১৯০৬ সনে তাঁর মাথায় এলেও, সৃষ্টি হয় ১৯১৪-তে।

অন্যূন দশবার তাঁর চোখে অস্ত্রোপচারের ফলে শেষ বয়সে জেমস্ প্রায় দৃষ্টিহীন ছিলেন। তবুও কিন্তু তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না। তখন তিনি বড় বড় হরফে আস্তে আস্তে লিখতেন।

(ফরাসী)

ফ্রাঁসোয়া রাবেলে (Francois Rabelais), ১৪৯০-১৫৫৩

ব্যঙ্গরসের এই প্রখ্যাত লেখক ফ্রান্সের সিনন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিস নগরে তিনি স্বর্গত হন।

মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালীন রাবেলে গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালিয়, জার্মান, স্প্যানিস, আরবী ইত্যাদি বহু ভাষা আয়ত্ত করেন।

১৫৩০ সনে সাহিত্যে স্নাতক উপাধি লাভ করে কিছুদিন পর

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় মন দেন। ১৫৩৭ সনে ডাক্তার হয়ে সে-বিদ্যার শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে ডাক্তার হিসেবে জীবিকার জন্য মেটিজে স্থায়ীভাবে বাস করতে তিনি স্থির করেন। কিন্তু সাহিত্যের নেশার কাছে তাঁর ডাক্তারী পেশাকে হার মানতে হয়।

এবার তিনি সাহিত্যচর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উপন্যাসমালা—Gargantua and Pantagruel আজও বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে হাস্যরসাত্মক এবং অদ্ভুতরসাত্মক সৃষ্টি হিসেবে অম্লান হয়ে আছে। অবশ্য পাঁচ খণ্ডে পরিকল্পিত এই বিরাট গ্রন্থটির শেষ খণ্ড পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে।

জীবনে তিনি উপার্জন করেছেন প্রচুর। তবে সেই উপার্জিত অর্থের অনেকটা তিনি আর্তের সেবা এবং সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করেছেন। সমাজ সেবায়ও তাঁর অবদান বড় কম ছিল না।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল এবং কোন কালিমা তাঁর চরিত্র স্পর্শ করতে পারেনি।

মলিয়ের (Moliere), ১৬২২-'৭৩

তাঁর আসল নাম—জঁা ব্যাপতিস্তে পকেলিন। প্যারিস-নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কমেডির অন্যতম স্রষ্টা।

আইনবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও গোড়া থেকেই নাটকের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল, অভিনেতা হবার মলিয়ের-এর ছিল অদম্য বাসনা। তাই শিক্ষান্তে ক'জন বন্ধুকে নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন একটি নাট্যসংস্থা। তারপর তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁকে আশাহত হতে হয়। তখন তাঁর বয়স একুশ।

মলিয়ের কিন্তু হতাশ হলেন না। ছোট্ট দলটি নিয়ে পল্লী অঞ্চলে, কখনও বা শহরের উপকণ্ঠে, অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি কুড়িয়ে মলিয়ের আবার এক সময় ফিরে আসেন প্যারিসে।

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে দলবল নিয়ে প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে নামলেন। দর্শকগণের খুশীর উচ্ছ্বাসে মলিয়েরের মন ভরে যায়।

তারপর একে একে গুণমুগ্ধ দর্শকবৃন্দকে অনেক বিয়োগান্ত নাটক উপহার দেন। ক্রমে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শহরে একটি স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা হয়।

Les Precienses Ridicules নাটকটিতে তিনি সমকালীন ভাষা, পোষাক এবং প্রচলিত আচরণের ওপর বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছেন। এই নাটকটি শুধু তাঁর খ্যাতিকেই সুদূর-প্রসারিত করেনি, সামাজিক কু-সংস্কার দূর করতেও এটির অবদান কম নয়।

Tartuffe তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান, যদিও এটির জন্য তাঁকে কিছুটা বিড়ম্বিত হতে হয়েছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি : Misanthrope, Miser।

ইতালি এবং স্পেন-এর সাহিত্য থেকে মলিয়ের প্রভূত প্রেরণা পেয়েছিলেন।

চতুর্দশ লুই তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। দক্ষ পরিচালক হিসেবে তিনি রাজার কাছ থেকে অবসর-ভাতা পেয়েছিলেন।

বালজাক (H. De. Balzac , ১৭৯৯-১৮৫০

উনিশ বছরের তরুণ ছেলেটির প্রতি তার পিতার কঠিন নির্দেশ হল : দু' বছরের মধ্যে বই লিখে অর্থ উপার্জন করতে হবে, অন্যথায় তাকে সে-পথ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হবে।

অখ্যাত তরুণ লেখক কিন্তু দমে না। চারমাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে বালজাক একটি কাব্য-নাটক শেষ করলেন। রচনাটি পড়ে সাহিত্যিক বন্ধুরা এক বাক্যে উপদেশ দেন,—এটি পুড়িয়ে ফেল। তবুও বালজাক হাল ছাড়েন না।

নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হতে তখন মাত্র দেড় মাস বাকী। ঐ সময়ের

মধ্যে তিনি একটি উপন্যাস শেষ করেন। প্রকাশক পাওয়া গেল। এবার তাঁর হতে কিছু অর্থ আসতে বালজাকের সাহিত্য-জীবন শুরু হয়।

গতানুগতিক শিক্ষারীতিতে তিনি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এজন্য ছাত্র-জীবনে তাঁকে কম বিড়ম্বনা সইতে হয়নি। পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসার থেকেও বালজাক বঞ্চিত ছিলেন।

হয়তো সেই কারণেই তাঁর ব্যক্তি- এবং সাহিত্য-জীবনে প্রৌঢ়া মাদাম দ্য বার্নির অখণ্ড প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এই মহিলা ছিলেন বালজাকের সাহিত্য-সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা।

বালজাক ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী, বেপরোয়া প্রকৃতির। তাই তিনি কখনও ঋণমুক্ত হতে পারেননি।

দেনার চাপে মহৎ সাহিত্য রচনা অসম্ভব উপলব্ধি করে নানা উপায়ে তিনি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু আশাহত হয়ে তিনি আবার সাহিত্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অনুকরণে তিনি 'হিউম্যান কমেডি'র পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা মতো ১৩৮টি উপন্যাসমালা লেখবার কথা ছিল। কিন্তু এক শ'টির বেশী তিনি শেষ করতে পারেন নি।

বালজাক ছিলেন ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল, রিয়ালিজ্‌মের গুরু।

গুস্তভ ফ্লোবেয়ার (Gustave Flaubert), ১৮২১-'৮০

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে দু'জন ফরাসী সাহিত্যিক বিশ্বসাহিত্যে গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিলেন—ঔপন্যাসিক ফ্লোবেয়ার তার অন্যতম। অপর জন—বালজাক। শুধু তাই নয়, ফ্লোবেয়ার ফরাসী সাহিত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তকও বটে। তাঁর প্রভাব স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে ইংরেজী এবং অন্যান্য সাহিত্যেও বিস্তার লাভ করেছিল।

চিকিৎসা এবং আইন দু'টি বিদ্যাই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু

কর্মজীবনে ফ্লোবেয়ার সেদিকে পা বাড়াননি। শিক্ষান্তে স্থির করেন, সাহিত্য সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করবেন। তখন লিখবার জন্য তাঁর না ছিল কোন উপাদান, না কোন অভিজ্ঞতা।

অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ফ্লোবেয়ার বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। দীর্ঘকাল প্রাচ্য দেশে ঘুরে প্যারিসে ফিরে আসেন। তারপর এই ভ্রমণ-লব্ধ অভিজ্ঞতা আর ছ' বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সৃষ্টি করেন—Madame Bovary, তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। এটি প্রকাশিত হতে চারিদিকে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

এরপর টিউনিশিয়া ভ্রমণ করে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস—Salammbo লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। এটি ১৮৬২ সনে প্রকাশিত হবার পর তাঁর প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়।

Sentimental Education তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

এমিল জোলা (Emile Zola), ১৮৪০-১৯০২

প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার সাহিত্য-জীবন শুরু হয় সাংবাদিক হিসেবে।

১৮৬৪ সনে Contes a Ninon—ছোটগল্প-গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে তিনি পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম গ্রন্থ হলেও, এটি-ই জোলাকে খ্যাতি এবং প্রচুর অর্থ দুই-ই দিয়েছিল। এই সাফল্যের পরই লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন।

১৮৬৭ সনে 'থেরেসে র‍্যাকুইন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে, এক নতুন সাহিত্যধারার পথিকৃৎ হিসেবে জোলা প্রতিষ্ঠা পান। পরবর্তী রচনা একটি উপন্যাসমালা ; এর অন্তর্ভুক্ত—"দি বেলি অফ প্যারিস", ১৮৭৪, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৪ সনে J'acuse (ইং অনুঃ I condemn) প্রকাশিত

হতে জোলার খ্যাতি আরও বিস্তার লাভ করে। এটির জন্য তাঁকে অবশ্য এক বছরের কারাজীবনের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

জীবনের শেষের দিকের রচনার ভেতর Germinal উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। 'লা টেরে'-ও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

১৮৯৯ সনের এক সময় ক'মাস ইংলণ্ডে কাটিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। তিন বছর বাদে বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় মর্মান্তিক ভাবে তাঁর জীবন-দীপ নিভে যায়।

আধুনিক যুগে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রবর্তক হিসেবে জোলা সমগ্র বিশ্বের গভীর শ্রদ্ধা পেয়ে গেছেন।

আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France), ১৮৪৪-১৯২৪

যিনি এককালে ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন; যিনি ১৮৯৬ সনে ফ্রেঞ্চ আকাদেমীতে বিশিষ্ট সভ্য রূপে মনোনীত হয়েছিলেন এবং ১৯২১ সনে নোবেল পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেছিলেন সেই আনাতোল ফ্রাঁস-এর সাহিত্য-জীবনের উৎস ছিল তাঁর পিতার বইয়ের দোকানটি।

প্রত্যহ বহু জ্ঞানী, গুণী এবং সু-সাহিত্যিক আসতেন তাঁর পিতার ঐ বড় দোকানটিতে, আড্ডা জমাতে। আসরে আলোচনা হ'ত—শিল্প এবং সাহিত্য বিষয়ে।

কতটুকুই বা বুঝতেন, তবুও বালক আনাতোল চুপ করে বসে থাকতেন এক কোণে। আগ্রহভরে শুনতেন অগ্রজদের সেই সব আলোচনা। এমনি ভাবে শুনতে শুনতে ক্রমে আনাতোলের মনে অঙ্কুরিত হয় সাহিত্যের বীজ।

কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করলেও উপন্যাস সৃষ্টিতে তাঁর পূর্ণ বিকাশ হয়। মাঝে কিছু নাটকও আনাতোল লিখেছিলেন।

The Crime of Sylvestre Bonnard তাঁর প্রথম উপন্যাস

হলেও এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে ফ্রেঞ্চ আকাদেমী কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন এবং এটিই তাঁকে এনে দিয়েছিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—Thais, Penguin Island এবং The Life of Joan of Arc।

তাঁর আসল নাম ছিল, জ্যাকে আনাতোল থিবো। জন্ম হয়েছিল প্যারিস শহরে।

আঁদ্রে জিদ্ (Andre Gide), ১৮৬৯-১৯৫১

প্যারিসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এগার বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। পিতৃবিয়োগের ফলে ছেলেবেলায় জিদ্‌কে বিশৃঙ্খলা এবং একাকীত্বের মধ্যে দিন কাটাতে হয়।

প্যারিসে এক প্রোটেস্টাণ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়েছিল। ঐ বয়সেই জিদ্ সাহিত্য এবং সংগীতের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন।

প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হলেও ক্রমে কবিতা, জীবন-চরিত, সমালোচনা, নাটক. উপন্যাস এবং অনুবাদের মধ্যে তাঁর প্রতিভা অভিব্যক্তি খোঁজে।

১৯১৭ সালের কাছাকাছি সময়ে জিদ্ ফরাসী যুবাদর্শের একটি প্রতীক বলে চিহ্নিত হন। তাঁর সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বক্তব্য এক হিসেবে অন্তহীন বিতর্ক ও আক্রমণের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

জিদ্-এর মধ্যে দুই জাতি এবং দু'টি ধর্মবিশ্বাসের অভূতপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছিল : একদিকে ছিল ক্যাথলিক ও নর্মান জাতির ধারা, অন্যদিকে ছিল প্রোটেস্টাণ্ট ও ফরাসী জাতির ধারা। তাঁর পিতামাতা দু'জনেই ছিলেন গোঁড়া ক্যালভিনিস্ট।

তিনি বহু এবং বিচিত্র রচনা করেছেন। The Coiners জিদ্-এর

একটি অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর নিজের মতে, এটিকেই সত্যিকারের উপন্যাস বলা চলে।

প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কয়েকটি গীতিকাব্য ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য জিদ্ বিশেষ করে বাঙালীর ধন্যবাদার্হ।

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে—Strait is the gate, If its die বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

মার্সেল প্রুস্ত (Marcel Proust), ১৮৭১-১৯২২

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প্যারিসের শহরতলীতে তাঁর জন্ম। সুন্দরী ইহুদী জননী তাঁর সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করে রুগ্ন সন্তানটিকে প্রতিপালন করতে ত্রুটি করেন না। মার্সেল ধীরে ধীরে বড় হন।

কিন্তু পিতা-মাতার সতর্ক নজর মিথ্যা করে ন' বছরের বালক মার্সেল একদিন বিকেলে বেরিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে দারুণ শ্বাসকষ্টে ক্লিষ্ট হন। সে-যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেন কিন্তু সারা জীবনের জন্য প্রায় পঙ্গু হলেন।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা তিনি পাননি। বিদ্যালয়ের একজন সহৃদয় শিক্ষকের সৌজন্যে মার্সেল সেণ্ট সীমনের স্মৃতিকথার পরিচয় লাভ করেন। ফলে, বালক মার্সেল সপ্তদশ শতাব্দীর আড়ম্বরময় ফরাসী দেশের প্রতি কৌতূহলী হন।

দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানে মার্সেল বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ১৮৯২ সনে সরবোন থেকে তিনি স্নাতক হন।

১৯০৬ সন। সহসা সমাজের নীচতা এবং কৃত্রিমতা উপলব্ধি করে মার্সেলের মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। পার্থিব সব কিছুর ওপর তাঁর মনে এক গভীর অনীহা জাগে। তিনি স্থির করেন, সব কিছুর থেকে মুক্ত

হয়ে নীরবে তিনি সাহিত্য চর্চা করবেন। তারপর পিতা-মাতাকে হারিয়ে মনের অস্থিরতায় কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। কোন ফল হয় না। এবার তিনি চিরদিনের জন্য নিজেকে একটি ছোট্ট ফ্লাট বাড়ীতে বন্দী করে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। তাঁর দীর্ঘ সতর বছরের নিঃসঙ্গ জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বিশ্বসাহিত্য পেল Remembrance of Things Past—এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসমালা। ঐ আস্তানা থেকে মার্সেল কচিৎ বাইরে যেতেন, গেলেও খুব অল্প সময়ের জন্য এবং গভীর রাত্রে।

জঁা পল সার্তর (Jean Paul Sartre), ১৯০৫—

প্যারিসে তাঁর জন্ম। ছাত্র জীবনে মেধাবী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তবে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দর্শনশাস্ত্র ছিল সার্তর-এর বিশেষ প্রিয়। শিক্ষান্তে কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন তিনি শিক্ষকতা করেন।

১৯৩৮ সনে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়। ঐ বছর-ই তাঁর প্রথম উপন্যাস La Nausu (বিবমিষা) প্রকাশিত হয়। অনেক সমালোচকের মতে ি ি বর্তমান শতাব্দীর দস্তয়েভ্স্কি।

জার্মান অধিকারের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪০ সনে জার্মানদের হাতে বন্দী হয়ে ন' মাস তাঁকে নাৎসী ক্যাম্পে লাঞ্ছিত জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

মুক্তি পেয়ে তিনি ফ্রান্সেই ফিরে আসেন। কিন্তু দেশ তখনও শত্রুদের হাতে। স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য শত্রুদের সতর্ক নজর এড়িয়ে তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই সঙ্গে রচনা করেছেন, দেশপ্রেমমূলক নাটক—যেগুলি প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতেই তাঁর খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সার্তর-এর রচনা দু'টি বিশেষ গুণের দ্বারা

চিহ্নিত : প্রথমটি অস্তিত্ববাদ, অন্যটি—তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং স্বাধীনতা-প্রীতি।

Being and Not Being (L' Etre et le neant) বইটিতে তিনি অস্তিবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচনা প্রায় সবই দর্শনমূলক। The Roads to Freedom উপন্যাসমালা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীর্তি।

দার্শনিক এড্‌মাণ্ড হু সারল্, মার্টিন হাইডেগার এবং সোরেন কিয়ের কেগার্ডের রচনা এবং চিন্তাধারা সার্তর-এর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯৬৪ সনে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান—যদিও সার্তর পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আলবেয়ার কামু (Albert Camus), ১৯১৩-'৬০

অ্যালজিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে এক দরিদ্র চাষী পরিবারে কামু জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর পিতা স্বর্গত হন।

ঐ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই নিজের চেষ্টায় ১৯৩৬ সনে কামু বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।• দর্শনশাস্ত্র ছিল তাঁর বিশেষ পাঠ্য বিষয়।

প্রথম জীবনে কঠিন দারিদ্র্য এবং রোগভোগ কামুকে গভীর নিরাশাবাদী করেছিল। শিক্ষান্তে যখন অকস্মাৎ জানতে পারেন তিনি একজন যক্ষ্মারোগী—মৃত্যু হতে পারে যে-কোন দিন, তখন তাঁর উক্ত ধারণা দৃঢ় হয়।

অবশ্য কিছুকাল পরে তাঁর জীবন-দর্শন বোধের ভিতরেই কামু বাঁচবার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন। ক্রমে তাঁর বিশ্বাস হয়, দুনিয়াতে 'অ্যাবসার্ডে'র বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম করবার মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর, এই সংগ্রাম-ই মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

ফ্রান্সের কোন একটি সম্পাদকীয় দপ্তরে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তারপর কিছুদিনের জন্য তিনি একটি স্কুলের শিক্ষকতা করেন। এই স্কুলের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে তাঁর সাহিত্য-চর্চা শুরু হয়েছিল।

১৯৪২ সনে ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনে কামু সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৪৭ সনে তাঁর 'দি প্লেগ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই বইটির প্রায় সওয়া লক্ষ কপি বিক্রী হয়। কামুর অন্য কোন রচনা এত জনপ্রিয় হয়নি। ১৯৫৭ সনে তাঁর নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হলে. কামু বলেছিলেন.—আমার ধারণা ছিল, যাঁরা জীবনের সাধনা সম্পূর্ণ করেছেন অথবা যাঁরা বয়সে প্রবীণ, এ পুরস্কার তাঁদেরই প্রাপ্য।

১৯৬০ সনে একটি মোটর দুর্ঘটনায় অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ—দি আউটসাইডার, দি ফল, দি মিথ অব সিসিফার।

(জার্মান)

টমাস মান (Thomas Mann), ১৮৭৫-১৯৫৫

বিংশ শতাব্দীর জার্মান-কথাসাহিত্যিকগণের মধ্যে টমাস মান অন্যতম শ্রেষ্ঠ। লুবেকে তাঁর জন্ম হয়।

পনের বছর বয়সে তাঁর পিতা অকালে স্বর্গত হন। সেই সঙ্গে পারিবারিক ব্যবসাটি উঠে যায়। ফলে, পরিবারে আসে চরম বিপর্যয়। একসময় বসতবাড়ীটি বিক্রী হতে আশ্রয়ের জন্য তাঁদের সকলকে ম্যুনিকে চলে আসতে হয়।

জীবিকার জন্য মানকে ম্যুনিকে একটি বীমা অফিসে সাধারণ কেরানীর কাজ গ্রহণ করতে হয়। এই কাজের সূত্রে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব ও প্রীতি তিনি অর্জন করেন। এঁদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মান

সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রেরণা পান। যদিও অল্প বয়স থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, তবুও ১৯২৪ সনে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস—The Magic Mountain প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বদেশ এবং বিদেশে এই গ্রন্থটিই ছিল তাঁর একমাত্র পরিচয়।

তারপর ১৯২৬ সনে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হবার পর মানের সাহিত্য-সৃষ্টির গতিবেগ দ্রুত বেড়ে যায়।

নাৎসীবাদের বিরোধিতার অপরাধে মানকে স্বদেশ থেকে চিরতরে নির্বাসিত হতে হয়। কিছুদিন চেকোশ্লোভাকিয়ায় থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। প্রায় আশী বছর বয়সে তিনি জুরিখে লোকান্তরিত হন।

১৯৪৬ সনে অকস্‌ফোর্ড এবং মৃত্যুর দু' বছর আগে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় টমাস মানকে 'ডক্টর অফ লিটারেচার' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Dr. Faustus, The Genesis of a Novel এবং The Tales of Jacob।

হেরমান হেস্ (Herman Hesse), ১৮৭৭—

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৪৬ সন) এই সাহিত্যিক একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী এবং সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

পনেরো বছর বয়স থেকে দীর্ঘ দশ বছর ভাগ্যের সন্ধানে হেস্-কে নানা কাজ করতে হয়—জেলে, মালী এবং বইয়ের দোকানে সাধারণ কর্মচারী হিসাবে।

বাইশ বছর বয়সে ঐ বইয়ের দোকানে কাজ করতে করতেই হেসের মনে সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

হেসের সে সময়কার মনের প্রতিক্রিয়া লেখকের প্রসিদ্ধ উপন্যাস—'পিটার ক্যামেনৎসিনদ্'-এ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গতঃ, হেসের মা'র জন্ম হয়েছিল আমাদের এই ভারতবর্ষে। উত্তরকালে তাঁর পিতা এবং মাতামহ দু' জনেই ভারতবর্ষে পাদ্রী হিসাবে এসেছিলেন। তিনি নিজেও এদেশে ঘুরে গেছেন, ১৯১১ সনে।

কিন্তু এই বাহ্যিক যোগাযোগটাই বড় কথা নয়। ভারত-আত্মার সঙ্গে হেসের নিবিড় পরিচয়টাই উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। সেই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হেস বহু অনবদ্য রচনা সৃষ্টি করেছেন; 'সিদ্ধার্থ' কাব্যোপন্যাসটি আমাদের এই দেশের পটভূমিকায়-ই রচিত।

দক্ষিণ-জার্মানীর এক ছোট্ট শহরে তাঁর জন্ম। কিন্তু পরবর্তীকালে নাৎসীবাদের সমর্থক ছিলেন না বলে, হেস্‌কে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব বরণ করতে হয়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—Herman Laus'cher, Demian, Steppenwolf ইত্যাদি।

(রুশ)

ইভান তুর্গেনেভ (Ivan Turgeniev), ১৮১৮-৮৩

তাঁর মাতা ছিলেন প্রভুত্বপরায়ণা, রুক্ষ মেজাজের আর পিতা ছিলেন আত্মসুখী। তাই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেও বালক ইভান-এর মনে সুখ ছিল না। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় মস্কো শহরে, উচ্চশিক্ষা পান বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পারিবাবিক গ্রন্থাগারটিও ইভানের জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করেছিল।

পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত তুর্গেনেভের চিত্ত স্বাভাবিক ভাবেই বঞ্চিত মানুষের প্রতি দরদী হয়ে উঠেছিল। তাই স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কর্মজীবন শুরু হতে ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি এক রিপোর্ট পেশ করেন। ফলে, সরকার বিরূপ হয় এবং তুর্গেনেভকে চাকুরীটি হারাতে হয়।

এবার তিনি সাহিত্য চর্চায় মন দেন। কিন্তু তাতে পেট ভরে না।

ওদিকে মা'র ইচ্ছানুসারে বিয়ে না করাতে মা'র দেওয়া মাসহারা থেকে তিনি বঞ্চিত হন। এই সময় দারুণ অর্থকষ্টে তাঁর দিন কাটে।

কিছুদিন পরের কথা। মা'র মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তুর্গেনেভ প্রচুর বিত্তের মালিক হন। ক্ষমতা লাভ করে এবার তিনি ভূমিদাসদের গ্লানিকর জীবন থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু তাঁর এ সহৃদয়তা সরকার সুনজরে দেখে না। তারপর গোগলের মৃত্যুর পর তুর্গেনেভ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখেন সেটিকে উপলক্ষ্য করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। আঠারো মাস অন্তরীণ-জীবনের লাঞ্ছনা ভোগ করার পর তিনি মুক্তি পান।

১৮৪৩ সনে ছদ্মনামে একটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। তারপর তাঁর দীর্ঘ একত্রিশ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফল হিসাবে গুণমুগ্ধ পাঠকগণ পেয়েছেন বহু এবং বিচিত্র রচনা। Virgin Soil তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান—বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন।

বহু দুঃস্থ সাহিত্যিককে তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। মোপাসাঁ এবং জোলার বই রুশ-ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করায় এঁরাও তুর্গেনেভের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। গোটা য়ুরোপের সাহিত্যিক সমাজে তাঁর বিশেষ সমাদর ছিল।

ক্লাসিক-যুগের পর রুশ সাহিত্যে যে সুবর্ণ যুগের সূচনা হয় তার অন্যতম নিয়ামক ছিলেন তুর্গেনেভ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—Fathers and Sons, Smoke, A House of Gentlefolk ইত্যাদি।

ফিওদর মিখাইলোভিচ্ দস্তোয়েভস্কি (F. M. Dostoevsky), ১৮২১-'৮১

তাঁর পিতা ছিলেন দুর্বিনীত, ক্রুদ্ধ, লম্পট এবং দুর্দমনীয় প্রকৃতির। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর ভূমিদাসরা একদিন তাদের এই অভিজাত প্রভুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তরুণ দস্তোয়েভস্কি তখন পীতস বুর্গের সামরিক পূর্ত-বিদ্যালয়ের ছাত্র। পিতার এই শোচনীয় মৃত্যু তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে; এক অপরাধ-প্রবণতা দস্তোয়েভ্স্কির সত্তাকে আচ্ছন্ন করে।

শৈশব থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে হয়েছিল। পাশ করে সরকারী নক্সা বিভাগে যোগ দিলেও অল্প কিছুদিন বাদে সাহিত্যের তাগিদে সে চাকুরীতে তিনি ইস্তফা দেন।

ভাড়াটে লেখক হিসাবে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। ১৮৪৫ সনে প্রথম উপন্যাস 'গরীব মানুষ' প্রকাশিত হলে সুধী সমাজে সমাদৃত হয়।

১৮৪৮ সনে সরকার-নিষিদ্ধ বই পড়ার অপরাধে তিনি গ্রেফতার হন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু বধ্যভূমিতে উপস্থিত হবার পর রহস্যজনক ভাবে সে আদেশ মকুব হয়। পরিবর্তে দীর্ঘ আট বছরের জন্য দস্তোয়েভস্কি সিবিরিয়ায় নির্বাসিত হন। এই ক্রূর অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া তিনি এড়াতে পারেন নি, মৃগীরোগের প্রকোপ বেড়ে যায়।

নরক-জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে দস্তোয়েভ্স্কি ফিরে আসেন পীতস বুর্গ শহরেই। তারপর নতুন উদ্যমে শুরু হয় তাঁর সাহিত্য-সাধনা। পর পর প্রকাশিত হয় অসাধারণ উপন্যাস-সম্ভার। কিন্তু তাঁর মনটি শূন্য থাকে। জুয়া আর মদের নেশায় সেই মনকে ভরে রাখবার চেষ্টা করেন। মন ভরে না, ফলে ঋণে দিশেহারা হয়ে ওঠেন।

দেনা পরিশোধের উদ্দেশ্যে মাত্র ছাব্বিশ দিনে স্টেনোগ্রাফারের সাহায্যে তিনি শেষ করেন "গ্যামব্লার"। স্টেনোগ্রাফার অ্যানা তাঁর অর্ধেক বয়সী। তবু দুঃখের প্রলেপ হিসেবে অ্যানাকে তিনি গ্রহণ করেন। অ্যানার প্রেমে দস্তোয়েভ্‌স্কির বিক্ষুব্ধ জীবনের অবসান হয়।

এই শান্ত জীবনে সৃষ্টি হয়,—The Brothers Karamazov, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশখানা উপন্যাসের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম, যদিও কথাশিল্পের বিচারে Crime and Punishment-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অনেকে মনে করেন। অনেকের মতে, তিনিই শ্রেষ্ঠ রুশ ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের আধুনিক রূপের পথিকৃৎ। আধুনিক 'অস্তিবাদ'-এর উদগাতাও তিনি।

লেভ্‌ তলস্তয় (Lev Nikolayevich Tolstoy), ১৮২৮-১৯১০

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও রুশ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ তলস্তয় রাশিয়ার বিখ্যাত অভিজাত বংশের সন্তান। ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানায় তাঁর জন্ম হয়।

আঠারো মাস বয়সে তিনি মা'কে হারান, সাত বছর বয়সে তাঁর পিতা স্বর্গত হন।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তলস্তয় শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু অভিজাত বংশীয় যুবকদের মতো যথারীতি প্রমোদ-ব্যসন ও উচ্ছৃঙ্খলতাদিতে লিপ্ত হতে তরুণ বয়সেই তিনি অর্থকষ্টে পড়েন। সেই অভাবের তাড়নায় পীতর্সবুর্গে সৈন্যবিভাগে অফিসার পদে যোগ দেন। ককেশাস-এ কিছুকাল সেনাধ্যক্ষ হিসাবেও ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ 'কসাক' গল্পটি সেই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর 'সেবাস্তোপল' গল্পমালা এ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর।

সেনাবিভাগ থেকে অবসর নিয়ে তলস্তয় গ্রামের কৃষকদের শিক্ষা-

দানের ব্রত গ্রহণ করেন। চাষী ভাইদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিলেন ক্ষেতখামারের কাজে। কাজের খাতিরে নানা জায়গায় তাঁকে ছুটতে হলেও নিজের জন্মস্থানটিই ছিল তলস্তয়ের সাধনার পীঠস্থান।

জন্মসূত্রে তরুণ বয়সেই সব ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও, গোড়া থেকেই তাঁর অন্তরে ছিল আত্মসন্ধানের প্রবল ঔৎসুক্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'শৈশব ও বাল্যের ডায়েরি' এবং 'স্মৃতিককথা' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

তাঁর বিবাহিত-জীবন সুখের ছিল না। দাম্পত্য জীবনের চরম লাঞ্ছনার থেকে মুক্তির জন্য বৃদ্ধ তলস্তয়কে এক সময় মর্মান্তিক ভাবে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল।

War and Peace তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। বিশ্বসাহিত্যে দশখানা উপন্যাসের মধ্যে এটি অন্যতম। Anna Karenina আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এ উপন্যাস দু'টি সর্বকালের অমূল্য রত্ন। নাট্য-সাহিত্যেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

এই মনীষীর ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ এবং শিল্পাদর্শ তাঁর 'আমার জবানবন্দী' এবং 'শিল্প কি গ্রন্থ দু'টিতে বিধৃত আছে।

ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky), ১৮৬৮-১৯৩৬

শিশু বয়সে তাঁর পিতা স্বর্গত হন। তখন তাঁর মা পুনরায় বিয়ে করেন। মাতাল মাতামহের অত্যাচার সয়ে যাহোক করে গোর্কি বড় হতে থাকেন।

পাঁচ মাস মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর আট বছরে পৌঁছুতে জীবিকার সন্ধানে তাঁকে বেরোতে হয়। ভাগ্যের সন্ধানে গোর্কিকে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরতে হয়। কোন ফল হয় না। হতাশায় একসময় তিনি আত্মহত্যা

করতেও চেষ্টা করেন। এর ফলে গভীর মানবতাবোধে গোর্কি উদ্বুদ্ধ হন আর তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তাঁর সাহিত্য-রচনার প্রেরণা।

১৮৯২ সনে সাহিত্য-জগতে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু স্বনামে নয়, ছদ্মনামে—'ম্যাক্‌সিম গোর্কি'। গোর্কি কথার অর্থ—'তিক্ত'। ক্রমে তাঁর আসল নাম—আলেক্সি ম্যাকসিমোভিচ পেশ্‌কফ্‌—লোকে ভুলে যায় এবং এই ছদ্মনামটিই হয় বিশ্ববিখ্যাত।

১৮৯৩ সনে এক সহৃদয় বন্ধুর সৌজন্যে সংবাদপত্রে গোর্কি একটি চাকুরি পান। দু' বছর বাদে 'চেলকাস্‌' নামে তাঁর একটি বড় গল্প প্রকাশিত হয়। এর তিন বছর বাদে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করলে তার লক্ষাধিক কপি বিক্রী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাহিত্যের দরবারে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০১ সনে তাঁর রচিত 'নাদ্‌নে' বা 'নীচের মানুষ' নাটকটি মঞ্চস্থ হলে মস্কো শহরের আর্ট থিয়েটার জনতার চাপে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু গোর্কির নামে জনতা যখন পঞ্চমুখ, পুলিশ তখন তাঁর ওপর খড়্গহস্ত। তারপর বিপ্লবের ঝড় শুরু হতে পীতর্স্‌বুর্গের কুখ্যাত কারাগারে গোর্কি বন্দী হন।

দেশ-বিদেশের জনতার দাবীতে গোর্কি সেই লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে চলে যান আমেরিকাতে। কিছুদিন পর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পাড়ি দেন ইতালির কাপ্রি দ্বীপে। ১৯০৭ থেকে ১৯১৩ সন পর্যন্ত গোর্কি কাপ্রিতেই ছিলেন। এখানে থাকাকালীন-ই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস—Mother ('মা') প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

গোর্কিকে দিয়েই সোভিয়েত সাহিত্যের শুরু। তাঁর সাহিত্য-কর্মের মাধ্যমেই সে দেশের সংস্কৃতির বীজও অঙ্কুরিত হয়েছিল।

তাঁর অন্য ক'টি অনবদ্য সৃষ্টি—'স্মৃতিকথা', 'ডায়েরির নোটস' এবং 'ফোমা গর্‌দেয়েভ্‌'।

বোরিস পাস্তেরনাক (Boris L. Pasternak), ১৮৯০-১৯৬০

Doctor Zivago—একটি রুশ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ। মূল গ্রন্থটির লেখক পাস্তেরনাক। অনুবাদটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। লেখকের খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এই বইটিকে কেন্দ্র করে ১৯৫৮ সনে লেখকের নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়।

কিন্তু স্বদেশের রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে পাস্তেরনাককে উক্ত পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করতে হয়। তিনি মুক্তকণ্ঠে জানান, উপন্যাসটি রাজনীতিক নয়। তবুও তিনি রাজরোষ থেকে রেহাই পান না। বইটির জন্য লেখক চিহ্নিত হন দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক বলে। পাস্তেরনাক দম্পতিকে হতে হয় সমাজচ্যুত, একঘরে।

স্কুলের পাঠ শেষ করে পাস্তেরনাক প্রথমে আইন পড়বার জন্য মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাবুক মন কিছুদিন পর দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হতে, আইন অধ্যয়ন ছেড়ে দর্শনশাস্ত্র পড়তে তিনি যান জার্মানীতে।

১৯১৪ সনে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সুধীমহলে পাস্তেরনাকের রচনা সমাদৃত হয় যুদ্ধের পরে। অনুবাদ ছাড়া বারো তেরোটি মৌলিক গ্রন্থের লেখক তিনি; যদিও তার অধিকাংশই কাব্যগ্রন্থ। উপন্যাস তিনি ঐ একটি মাত্রই লিখেছেন। এটির রচনাকাল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সন।

পাস্তেরনাকের শেষ জীবন বড়ই করুণ। তবুও জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, সাহিত্যিক তাঁর স্বধর্ম বিক্রয় করেন না। লাঞ্ছিত জীবনে আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেও অমৃতের গান কণ্ঠে নিয়ে রাশিয়ার এই জাতিচ্যুত সাহিত্যিকের মৃত্যু ঘটেছে। বিশেষ করে এই কারণেই বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পাস্তেরনাক বিশেষ গৌরব অর্জন করেছেন।

মিখাইল শলোখফ (Mikhail Sholokhov), ১৯০৫—

দক্ষিণ সোভিয়েত অঞ্চলে এক সাধারণ কসাক পরিবারে তাঁর জন্ম। শলোখফের মা ছিলেন তুর্কী রমণী। মস্কোর স্কুল থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর রাষ্ট্রবিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের আবর্তে পড়ার দরুন তাঁকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিতে হয়। তাঁর পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করা তাই আর সম্ভব হয়নি।

গৃহযুদ্ধের অবসান হলে কিশোর শলোখফকে জীবিকা অর্জনের জন্য কিছুদিন রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে হয়।

সতেরো বছর বয়সে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়। ১৯২৫ সনে তাঁর প্রথম রচনা Tales of the Don প্রকাশিত হলে তিনি স্বদেশে সাহিত্যিকের মর্যাদা লাভ করেন। এর তিন বছর বাদে ডন নদীর উপ-কূলে কসাকদের জীবন এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিকায় তাঁর উপন্যাসমালা Tikhiy Don-এর প্রথম পর্ব আত্মপ্রকাশ করলে সারা দেশে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ক্রমে সে আলোড়নের ঢেউ দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪ সনে উক্ত গ্রন্থটির প্রথম দু'টি পর্ব একত্র করে ইংরেজীতে অনূদিত হয় And Quiet flows the Don নামে। এই গ্রন্থের চতুর্থ পর্বটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সনে। গ্রন্থটি লেখকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এটি অন্যূন চল্লিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিশেষ করে এই অসাধারণ উপন্যাসমালাটির জন্য তিনি ১৯৬৫ সনে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৪১ সনে স্তালিন পুরস্কার এবং ১৯৬০ সনে লেনিন পুরস্কারের গৌরবও শলোখফ অর্জন করেছেন। শহরের কোলাহলমুখর জীবন তাঁর কাছে অসহ্য। বড় কোন সভাসমিতিতে উপস্থিত হতেও শলোখফ কুণ্ঠিত। তাড়াহুড়ো করে লেখা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। অতি প্রত্যূষে নিয়মিত লেখার ফাঁকে মাঝে মাঝে মাছ ধরবার বা জঙ্গলে শিকারের সুযোগ পেলে তিনি খুশী হন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—Virgin Soil Upturned ; Don flows Home to the Sea.

(ইতালি)

লুইগি পিরানদেল্লো (Luigi Pirandello), ১৮৬৭-১৯৩৬

ইতালিয় সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল লুইগি পিরানদেল্লো সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেন। রোম নগরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছেলেবেলাতেই একদিকে সিসিলির আবহাওয়া এবং মৃত্তিকা অন্যদিকে ইতালির প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা, সেই সঙ্গে বর্তমান যুগের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ পিরানদেল্লোর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রথম জীবনে অর্থাৎ ১৮৯৭ থেকে ১৯২২ সন পর্যন্ত রোম নগরে তিনি ইতালিয় সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে ব্রতী ছিলেন। এরপর পিরানদেল্লো সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে তিনি কবিতা, উপন্যাস এবং কিছু ছোটগল্পও লিখেছেন। ক্রমে তিনি নাটকের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেন। মানব-চরিত্রের দ্বিধাবিভক্ত দ্বন্দ্বমুখর সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেই পিরানদেল্লোর নাটকের সার্থকতা।

১৯২৫ সনে রোম শহরে তাঁরই পরিচালনায় 'আর্ট থিয়েটার' আত্মপ্রকাশ করে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার নানা দেশে পিরানদেল্লো ভ্রমণ করেছেন।

১৯২৯ সনে তিনি ইতালিয়ান একাডেমীর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৩৪ সনে।

The Late Mattia Pascal তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে সারা ইউরোপ এবং আমেরিকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনাঃ The Old and the Young. প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন।

আলবার্তো মোরাভিয়া (Alberto Moravia), ১৯০৭—

মোরাভিয়ার আসল নাম Alberto Picherle। ছদ্মনামের অবগুণ্ঠনে তাঁর পিতৃদত্ত নামটি ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়া বড় কেউ জানেন না।

ফাসিস্ত আমলের শেষের দিকে মোরাভিয়ার রচনা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু তাতে তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয় না। তিনি ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। ইতালি জার্মান অধিকারে আসবার পর থেকে ১৯৪৪ সনের মে মাস পর্যন্ত মোরাভিয়াকে পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে বেড়াতে হয়েছে।

তবুও যুদ্ধোত্তর যুগে ইতালিয় সাহিত্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির কৃতিত্ব অনেকটা আলবার্তো মোরাভিয়ার।

মোরাভিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃ দু'-তিন ঘণ্টা লিখে থাকেন। তাঁর মতে,—মানুষের কাজ ও জীবন দুই-ই থাকা প্রয়োজন। এখানে জীবন অর্থ অবসর; অবসর না পেলে কোন মানুষেরই চরিত্র গঠন হয় না।

মোরাভিয়া রোম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ন' থেকে প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত ক্রমাগত অসুখে ভোগার দরুণ তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি। ষোল বছর বয়সে একটি স্বাস্থ্যাবাসে থাকাকালীন তিনি ফরাসী, জার্মান এবং ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। এখানেই সতেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসটিও এখানে ঐ সময়ই সৃষ্টি হয়। তারপর সংবাদদাতা হিসাবে ইতালিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

প্রসঙ্গতঃ তাঁর স্ত্রী—এলসা মোরান্তে-ও ইতালির একজন খ্যাতনাম্নী লেখিকা।

The Woman of Rome মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা—Conjugal Love, A Ghost at Noon, The Conformist.

(আমেরিকা)

ইউজিন ও'নীল (Eugene O'Neill), ১৮৮৮-১৯৫৩

যিনি তিরিশ বছর বয়সেই আমেরিকার একজন অবিসম্বাদিত প্রতিভাশালী নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন, উত্তর কালে নোবেল পুরস্কারের (১৯৩৬ সন) গৌরবও অর্জন করেন, ক' বছর আগে তাঁর প্রতিভার কোন লক্ষণ বিকশিত হওয়া দূরে থাক উক্ত নাট্যকারের জীবনটাই ছিল নিতান্ত অনিশ্চিত।

তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে ডাক্তাররা যক্ষ্মা সন্দেহ করে ও' নীলকে স্যানাটোরিয়ামে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। আশ্চর্য, পাঁচ মাস পরে ঐ স্বাস্থ্যনিবাসেই ও'নীল প্রথম লেখার প্রেরণা অনুভব করেন। তিনি লিখতে শুরু করতে তাঁর অস্থির প্রকৃতি দূর হয়, মনটি আত্মস্থ হয়।

নিউ ইয়র্ক শহরে ইউজিন ও'নীল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত অভিনেতা। বালক ও'নীল তার দুরন্ত প্রকৃতির জন্য বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। জলে-স্থলে তিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছেন।

সাহিত্য জীবনে ও'নীল এক শ্রেণীর বিদ্রোহী ছিলেন। হয়তো সেই কারণেই চিরজীবন শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

তাঁর সৃষ্টির মধ্যে--Anna Christie, Desire under the Elms, Strange Interlude, The Emperor Jones বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিজীবনে ও'নীল ছিলেন প্রচার-বিমুখ। জীবনে যিনি খ্যাতির চূড়ায় উঠেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ও'নীলকে রাখা হয় একটি সাধারণ কফিনে। ঐ একই কারণে সে সময় কোন পুরোহিতও ছিলেন না। কবরস্থানে উপস্থিত ছিলেন শুধু তাঁর স্ত্রী, একজন ডাক্তার ও নার্সটি।

উইলিয়াম ফক্‌নার (William Faulkner), ১৮৯৭—

'আমি একজন সাধারণ চাষী, সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে একটু সাহিত্য চর্চা করি'—আত্মপরিচয় সম্বন্ধে ১৯৪৯ সনের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফক্‌নার-এর উক্তি।

তিনি ছিলেন নিতান্ত প্রচার-বিমুখ। কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাও ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

মিসিসিপির অন্তর্গত অ্যালবেনী-তে উইলিয়াম ফক্‌নার জন্মগ্রহণ করেন। মিসিসিপির বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। অবশ্য স্নাতক হতে পারেন নি।

প্রথম জীবনে ভাগ্যের সন্ধানে ফক্‌নারকে নানা জায়গায় রংয়ের কাজ থেকে অনেক সাধারণ কাজ করতে হয়েছিল।

কাব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে তিনি মসী ছেড়ে অসি ধরেন ; বিমান-বাহিনীতে তিনি যোগ দেন।

'দি সাউণ্ড অব দি ফিউরি' এবং 'অ্যাজ আই লে ডাইং' গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হলে ফক্‌নার সাহিত্য জগতে স্থায়ী আসন লাভ করেন। তবে 'লাইট ইন আগস্ট' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

তাঁর ঠাকুরদার বেপরোয়া চরিত্র বালক ফক্‌নারের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। উত্তরকালে এই ঠাকুরদা নাতির অনেক ছোটগল্প এবং উপন্যাসে স্থান পেয়েছেন।

ফক্‌নারের মতে,—সাহিত্যিককে সত্যসন্ধানী হতে হবে, তাঁকে আশার বাণীও শোনাতে হবে।

আর্নেস্ট [মিলার] হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway), ১৮৯৮

ডাক্তার পিতার একান্ত ইচ্ছা, তাঁর পুত্রটিও চিকিৎসক হোক।

আর মা চেয়েছিলেন ছেলেটিকে একজন সঙ্গীতশিল্পী করতে। কিন্তু পিতা মাতা দু'জনই আশাহত হলেন।

স্কুলের পাঠ শেষ করে উনিশ বছর বয়সে হেমিংওয়ে 'কানসাস সিটি স্টার' পত্রিকা অপিসে রিপোর্টারের কাজ গ্রহণ করেন। এবং এখানেই তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপ তখন বিপর্যস্ত। পত্রিকা অপিসের সাত মাসের চাকুরী ছেড়ে হেমিংওয়ে ইতালির পদাতিক বাহিনীতে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাজ নিয়ে সীমান্তে ছুটে গেলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর ভাবে আহত হতে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। ফিরে এসে কিন্তু তিনি বসে রইলেন না; ঐ যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হল—Farewell to Arms.

১৯১৯ সনে ছেলেবেলার বান্ধবীকে বিয়ে করে পরের বছর আবার রিপোর্টারের চাকুরী নিয়ে হেমিংওয়ে চলে যান তুরস্কে। কিন্তু সে-কাজ বেশী দিন ভাল না লাগায় প্যারিসে এসে বাসা বাঁধেন।

ক'বছর বাদে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হ'তে সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়ে সেখানে ছুটে যান। সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখলেন—For Whom the Bell Tolls, তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

ব্যক্তিগত ভাবে হেমিংওয়ে ছিলেন একজন মুষ্টিযোদ্ধা, ছিলেন তিনি গভীর জলের মৎস্য-শিকারী, বড়দরের শিকারী। এই প্রখ্যাত জঙ্গী সাহিত্যিক পৌরুষের পূজারী হয়েও কিন্তু কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন না; কোন ভাল কাজ কারবার আগে সুলক্ষণ কুলক্ষণগুলি ভালভাবে মিলিয়ে নিতে হেমিংওয়ে কখনও ভুল করতেন না। তবুও তাঁর মৃত্যু হয়েছিল মর্মান্তিক ভাবে।

১৯৫৪ সনে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: The Sun also Rises, The Old Man and the Sea.

(স্পেন)

মিগুয়েল দ্য কারভানটেস্ (থেরভানতেস) সাভেদ্রা,

১৫৪৭-১৬১৬

ছেলেবেলাতেই কাব্য সাহিত্যের প্রতি তার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সে সময় সনেট, ব্যালাড, এলিজি প্রভৃতি রচনায় কিছুদিন তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন।

তারপব সেনাবাহিনী তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ১৫৭০ সনে কলোন্নার নেতৃত্বে তুর্কি এবং আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন। উত্তরকালে স্পেনের রাজার বাহিনীতে যোগ দিয়ে শ্রেষ্ঠ সৈনিকের গৌরব অর্জন করেন।

কিন্তু ১৫৭৫ সনে সৈনিক সাভেদ্রার জীবনে চরম বিপর্যয় আসে। শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে তিনি ক্রীতদাস হিসাবে আলজিরিয়াতে বিক্রীত হন। সাত বছর তাঁকে সেই লাঞ্ছিত জীবন ভুগতে হয়। তারপর বন্ধু ও আত্মীয়দের সৌজন্যে তিনি মুক্তি পান।

১৫৮৩ সনে সেনাবাহিনী থেকে সাভেদ্রা (Miguel de Cervantes Saavadra) অবসর গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তিনি সাহিত্য-চর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

স্পেনের মাদ্রিদ শহরে এক অভিজাত পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন। তবুও ১৫৮৬ সন পর্যন্ত ভাগ্য-বিড়ম্বনা তাঁকে কম সইতে হয়নি। সাহিত্য রচনা থেকে উপযুক্ত উপার্জন না হ'তে সাভেদ্রাকে জীবিকার জন্য সামান্য বেতনে নানা নগণ্য চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছে। সে সময় অসৎ সহকর্মীদের চক্রান্তে চুরির অপরাধে সাভেদ্রাকে দু'বার কারাজীবনের দুর্ভোগও নীরবে সইতে হয়েছে (১৫৮৭-১৬০৩)।

তবে এই কারাজীবনেই Don Quixote de la Mancha এই অমর গ্রন্থটির পরিকল্পনা সাভেদ্রার মাথায় এসেছিল। জেলে এবং 'হোটেলে বসে গ্রন্থটি তিনি সৃষ্টি করেন। ১৬০৫ সনে গ্রন্থটির প্রথম পর্ব

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে; দশ বছর পরে দ্বিতীয় পর্বটি প্রকাশিত হলে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাভেদ্রা স্থায়ী আসন লাভ করেন।

(নরওয়ে)

ক্নুট হামসুন (Knut Hamsun), ১৮৫৯-১৯৫২

পূর্ব নরওয়ের কোন এক অখ্যাত পল্লীতে একটি দরিদ্র চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম। বালক বয়সেই তাঁর হাতেখড়ি হয়—সাহিত্যে নয়, পৈতৃক আমলের লোহা পেটানোর কাজে। জীবিকার জন্য শৈশব থেকেই এঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। ঐ কঠোর সংগ্রাম কিন্তু তাঁর শিল্পীমনটিকে কোনদিন এতটুকু ম্লান করতে পারেনি।

একসময় কাকার শাসনে উত্ত্যক্ত হয়ে হামসুন বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি মুচির দোকানে আশ্রয় নেন। দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে জুতা সেলাই করে তাঁর দিন কাটে।

ক'দিন বাদে তাঁর মন বিদ্রোহ করে ওঠে। ভাগ্যের সন্ধানে হামসুন তখন আমেরিকায় পাড়ি দেন। কিন্তু সেখানেও মনের মতো কোন কাজ তাঁর জুটলো না। অগত্যা তাঁকে কারখানার কুলির কাজই গ্রহণ করতে হয়। তারপর কিছুদিন তিনি সেল্‌সম্যান এবং শিকাগোর ট্রাম-কন্‌ডাকটার হিসাবেও কাজ করেন। দেশে ফিরে এসে তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কঠিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখলেন একটি উপন্যাস। ১৮৮৮ সনে এই অখ্যাতনামা লেখকের উক্ত উপন্যাসটি ডেনমার্কের কোন একটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হতে সাহিত্য-জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। উপন্যাসটির নাম ছিল—Sult, ইং অনুঃ Hunger. প্রথম দিকে তিনি কিছু কবিতাও লিখেছেন। তাঁর এই ছদ্মনামের অবগুণ্ঠনে ঢাকা আসল নামটি—ক্নুট পেডারসন—ক্রমে চাপা পড়ে যায়।

ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯২০ সনে। অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য রচনা : Pan, Growth of the Soil.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্প ঃ চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci),

১৪৫২-১৫১৯

এক আধারে তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থাপতি, শিল্প-সমালোচক এবং সঙ্গীতজ্ঞও। সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। নিঃসন্দেহে লিওনার্দো ছিলেন ইতালির নবজাগরণের অন্যতম হোতা।

ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ করে চিত্র আঁকতে এবং মূর্তি গড়তে তাঁর বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তারপর উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে এসে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ দেখে গুরু চমৎকৃত হন। গুরুর অসমাপ্ত কাজ শিষ্য নিখুঁত ভাবে শেষ করলে তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে-ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এমনি ভাবে মাত্র ষোল বছরে পৌঁছুতে লিওনার্দোর শিল্পী-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ঐ বয়সে শুধু চিত্রশিল্পে নয়, কাঠ, মার্বেল পাথর এবং নানা ধাতুর কাজে অর্থাৎ কারুশিল্পে তাঁর জুড়ি ছিল না।

কিন্তু একমাত্র 'নৃপাত-বন্দনা' (Adoration of King) ছাড়া তাঁর প্রথম বয়সের আর কোন ছবির সন্ধান মেলে না। বাকী সবগুলো কালের অতলে তলিয়ে গেছে।

পঁচিশ বছর বয়স থেকেই তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে শুরু করেন। কোন প্রাচীন রীতি-নীতি তিনি অনুসরণ করেন নি। উত্তর-সূরীদের কোন প্রভাবও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। আপন ভাবধারাকে আদর্শ করে তিনি নিজের সাধনার পথে এগিয়ে গেছেন।

প্রকৃতিকে প্রথম চিত্রে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব লিওনার্দোর। আলো-ছায়ার রূপটিকেও তিনিই প্রথম চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

মিলান শহরের নবরূপের পরিকল্পনাটি লিওনার্দোর, শহরের সুন্দর গীর্জাটিরও। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নক্সাগুলির পরিকল্পনা ছিল রমণীয়।

চিত্রশিল্পের মধ্যে 'লাস্ট সাপার' এবং 'মোনালিসা'-ই লিওনার্দোর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'লাস্ট সাপার' শুধু তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান নয়, বিশ্বের চিত্র-জগতের গৌরব। তাঁর 'ভার্জিন অব দি রকস্'ও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

চিত্রশিল্প-জগতে তিনি এক অনন্যসাধারণ কালজয়ী শিল্পী। কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়।

শরীরতত্ত্বেও আগ্রহশীল ছিলেন বলে মানবদেহের কাঠামোর অনেক নক্সাও তিনি সৃষ্টি করে গেছেন নির্ভুল ভাবে। ডুবো জাহাজ তৈরীর পরিকল্পনাও ছিল তাঁর। মাছের আকার লক্ষ্য করে 'Streamline' জাহাজের নকসা তৈরী করেন লিওনার্দো। বিরাট পাখা সহ উড়োজাহাজের পরিকল্পনার কৃতিত্বও তাঁর ছিল। সব শেষে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের একটি নিখুঁত নকসা করাও বড় কম আশ্চর্যের কথা নয়।

লিওনার্দো শুধু ইতালির নয়, সর্বযুগের বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিস্ময়কর প্রতিভার ধারক।

মাইকেলেঞ্জেলো (Michelangelo), ১৪৭৫-১৫৬৪

সর্বকালের বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী; নবজাগরণের (Renaissance) যুগে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

ইতালির কাপ্রি শহরে তাঁর জন্ম। বালক বয়সেই চিত্রশিল্পী হতে তিনি স্থির করেন। অবশ্য ভাস্কর্যের প্রতিও মাইকেলেঞ্জেলো'র অনুরাগ বা নিষ্ঠা সে-বয়সে কম ছিল না। উত্তরকালে মানবদেহের গঠন সম্পর্কে তাঁর গবেষণার অন্ত ছিল না। গভীর আগ্রহের সঙ্গে কখনও কখনও বা তিনি সুন্দর সুন্দর প্রস্তর মূর্তি গড়তেন।

রোমের ভাটিকান শহরে সিস্টিন গীর্জার ভেতরে ছাদের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রটি মাইকেলেঞ্জেলোর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকীর্তি।

তাছাড়া উক্ত গীর্জার উপাসনাঘরের দেওয়ালে তাঁর অঙ্কিত "শেষ বিচার" চিত্রকর্মটিও বিশ্ববিখ্যাত : যীশুখৃষ্টের অনিন্দ্যসুন্দর ছবি, সেই সঙ্গে তাঁর গৌরবময় উত্থান এবং বেদনাদায়ক পতনের দৃশ্যপট শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যে এঁকেছেন।

পোপের অনুরোধে সেণ্ট পিটারস্ গীর্জার পরিকল্পনাটি মাইকেলেঞ্জেলো করেন। তাঁর সে-পরিকল্পনাটি সাদরে গ্রহণ করা হলেও উত্তরকালে খামখেয়ালী ভাস্করেরা অনেক অংশ নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করে। গীর্জার গম্বুজটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত মাইকেলেঞ্জেলোর পরিকল্পনা অনুসারেই হয়। জীবিতাবস্থায়ই তিনি দেশবিদেশ থেকে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ওপর তাঁর প্রভাব এত গভীর ছিল যে চিত্রশিল্পে এবং ভাস্কর্যে তাঁরা সরাসরি মাইকেলেঞ্জেলোকে অনুকরণ করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর শিল্পকীর্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। সিস্টিন গীর্জা

২। জুলিয়ান গম্বুজ, এবং

৩। 'মেডিসি' ও 'শেষবিচার'

রাফেল (Raphael), ১৪৮৩-১৫২০

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, ইতালীয় নবজাগরণের অনন্যসাধারণ প্রবক্তা। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী প্রশংসাধন্য এবং অসামান্য জনপ্রিয় শিল্পী।

ইতালির আর্বিনো শহরে তাঁর জন্ম। বালক বয়সেই তৈলচিত্রে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

লিওনার্দোর কাছ থেকে তিনি চিত্রের সৌন্দর্যতত্ত্ব শিক্ষা করেন। আর, মাইকেলেঞ্জেলোর কাছে শিক্ষা পান মূর্তির শারীরিক গঠনের

সৌষ্ঠব বিষয়ে। এই সময়ে রাফেল তাঁর প্রসিদ্ধ 'সমাধি' (The Entombment) আঁকেন; প্রখ্যাত ম্যাডোনাগুলির বেশীর ভাগও এই সময়ই সৃষ্টি হয়েছিল।

রাফেলের প্রতিভা শুধু বহুমুখী ছিল না, ছিল সর্বতোমুখী। কি গীর্জার যজ্ঞবেদী চিত্রণে, কি বৃহৎ ঐতিহাসিক দেওয়াল-চিত্রে বা পৌরাণিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাঁকজমক অঙ্কনে সব ক্ষেত্রেই তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। শুধু চিত্র অঙ্কনেই নয়, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও—ছোট এবং বড় সব রকম মূর্তি গড়তেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

জীবনের শেষ বারো বছর রাফেল রোম নগরীতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির সৃষ্টির মধ্যে ডুবে ছিলেন। এই সময় পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস-এর একান্ত আগ্রহে তিনি ভ্যাটিকান শহরে কতগুলি দেওয়াল-চিত্রে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর এঁকে দেন। এ সব চিত্রের মধ্যেই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত 'পার্নাসাস' (Parnassus) এবং 'এথেন্সের শিক্ষাকেন্দ্র' —যেদু'টি নীরবে তাঁর অপূর্ব কীর্তির মহিমা ঘোষণা করে।

তাঁর শেষ মহৎ কীর্তি—"খ্রীষ্টের রূপ পরিবর্তন" চিত্রটি বর্তমানে রোমনগরীর বোরগীজ গ্যালারীতে সযত্নে রক্ষিত আছে। সেকালে এবং পরবর্তী কালে ও দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাফেল ছিলেন বিশ্বের চিত্রশিল্পীদের আদর্শ, প্রেরণার প্রধান উৎস। আর, শিল্পী রাফেলের ব্যক্তি-চেতনায় সমগ্র প্রকৃতি, বিশেষ করে মানব, ছিল সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক।

'ম্যাডোনা টেম্পি', 'কাস্তিগ্‌লিয়ন-ছবি' এবং দেওয়াল-চিত্র 'গালাতেয়া'-কেই রাফেলের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করা হয়।

এল গ্রেকো (El Greco), ১৫৪১-১৬১৪

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের অন্যতম প্রধান। স্পেনের ক্রীট দ্বীপে তাঁর জন্ম।

অল্প বয়সেই চিত্রশিল্পের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করায় এল

গ্রেকো শিল্পের পীঠস্থান ভেনিস শহরে পাড়ি দেন। সেখানে প্রখ্যাত শিল্পী টাইটান (Titan)-এর অধীনে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষানবিশি করেন।

প্রথম জীবনে গ্রেকোর শিল্পীসত্তাকে ইতালির দুই দিকপাল শিল্পী কোরেগিয়ো এবং মাইকেলেঞ্জেলো গভীর ভাবে প্রভাবিত করেন।

কিন্তু স্বদেশে ফিরে এসে গ্রেকো ভেনিস-এর প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠেন। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টি তিনি স্পেনদেশেই করেছিলেন। হয়তো সে কারণে তাঁর অনেক চিত্র নানাভাবে স্পেন-দেশের ধর্মীয় ভাবালুতায় আপ্লুত।

তাঁর ধর্মকেন্দ্রিক চিত্রগুলির মধ্যে "ক্রুশবাহী যাশুখ্রীষ্ট" বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

মানবপ্রতিকৃতি সৃষ্টিতেও গ্রেকোর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তবে সেক্ষেত্রে শরীরের নিখুঁত চিত্র আঁকতে সব সময় বিশেষ আগ্রহী না হলেও অঙ্কিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ভুল ভাবে ফুটিয়ে তুলতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

"কাউণ্ট অরগাজ-এর সমাধি" (The Burial of the Count of Orgaz) এই প্রসিদ্ধ চিত্রটি এল গ্রেকোর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে চিহ্নিত। আর, তাঁর 'টলেডোর দৃশ্য' নামক ছবিটি ভূভাগ দৃশ্যসৃষ্টির ইতিহাসে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বলে স্বীকৃত। রং-এর খেলায় গ্রেকোর খ্যাতি কম ছিল না।

(ভারতীয়)

কি চিত্রকলা, কি ভাস্কর্য অথবা স্থাপত্য শিল্পে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আজও সেই শিল্পনৈপুণ্যের অজস্র নিদর্শন সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু সে-যুগের শিল্পকলার বা যেসব শিল্পী কলাচাতুর্য দেখিয়ে গেছেন—তাঁদের কোন ইতিহাস নেই। তাই সেই বিস্ময়কর শিল্পীদের জীবনচরিত অলিখিতই রয়ে গেছে।

তবুও সেই অনন্যসাধারণ শিল্পীগণ বেঁচে আছেন তাঁদের কালজয়ী সৃষ্টির মাঝে—যা আজও দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছে পরম বিস্ময়।

আধুনিক শিল্পকলার জগতে যাঁরা প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যামিনী রায়
নন্দলাল বসু
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
রামকিঙ্কর বেইজ
কুমারস্বামী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান

প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অকল্পনীয়। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি শুধু এ যুগের বিস্ময়ই নয়, মানুষের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও আশাতীত বাড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব কিছুর মূলে রয়েছে এ-যুগের বরণীয় বৈজ্ঞানিকগণের অক্লান্ত সাধনা। এঁরা নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ করে মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। এই মনীষীদের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য, জগদ্বাসী তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সাধারণত দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম, যা শুধু মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ায়। অন্যটির ফলে—মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ উপকৃত হয়। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের অবদানের মূল্য কম নয়, অপরিসীম। তবুও বিচার করে অনেকে মনে করেন, প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণই যেন পৃথিবীর অগ্রগতিতে বেশী সহায়ক। এঁরাই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় আজ যেন দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছুই নেই—আমাদের কল্পনা বাস্তবে মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে বিস্ময় বোধ করেছে—কখনও বা ভীতত্রস্ত হয়েছে। কেউ কেউ বা নানা উদ্ভট জল্পনা কল্পনা করেছে। আজ বৈজ্ঞানিক ঐ শক্তিকে শুধু আয়ত্তেই আনেন নি, জনকল্যাণে তার সদ্ব্যবহার করছেন। দু'শ বছর আগে এ কথা কেউ ভাবতেও পারেনি।

সূর্যের অত তেজ! কি করে সম্ভব? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের

ফলে সেকথাও আর আমাদের অ-জানা নয়। এমন কি আমাদের শৈশবের সেই চাঁদ-মামার দেশও আজ আর শুধু কল্পনার রাজ্য নয়। আমরা জানি, সেটার দূরত্ব নিতান্তই ভৌগোলিক। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অনেক কিশোর ও তরুণ বন্ধুদের সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বর্তমান কালকে অ্যাটমিক যুগ বলা হয়। অ্যাটমের অসাধারণ শক্তির কথাও আমরা কম বেশী জানি। শুনে স্তম্ভিত হতে হয়, এই অ্যাটমের উৎপত্তি একটি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা থেকে। আর, ইলেকট্রন হ'ল অ্যাটমের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-ই মানুষের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। সেই সব বিস্ময়কর সৃষ্টি মহান্ স্রষ্টাগণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আবিষ্কারের তুলনায় তাঁদের জীবনচরিতও কম চমকপ্রদ নয়। এবার আমরা বিশ্বের ক'জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হবো। আবির্ভাবের কালানুক্রমিক এঁদের বিন্যস্ত করা হ'ল।

বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক

আর্কিমিডিস (Archimedes), খ্রীঃ পূঃ ২৮৭-২১২

একদিন সিরাকুজ অধিপতি হীরো তাঁর মুকুটের সোনা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তাঁর সামরিক এঞ্জিনিয়ার আর্কিমিডিসকে আদেশ করেন। কঠিন পরীক্ষা!

দিনের পর দিন আর্কিমিডিস গভীর ভাবে চিন্তা করেন। কিন্তু সেটি পরীক্ষা করে দেখবার সূত্র আর খুঁজে পান না। সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে সেদিন স্নান করার উদ্দেশ্যে অন্যমনস্ক ভাবে একটি পূর্ণ চৌবাচ্চায় নামেন। তিনি ভেতরে নামতে খানিকটা জল উপচে পড়ে। ঘটনাটি তাঁর নজরে পড়তে আর্কিমিডিস সচকিত হন। নানা প্রশ্ন তাঁর মনে উঁকি দেয়। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁর দেহের সমান আয়তনের

জল উপচে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ অবস্থায়ই রাস্তায় বেরিয়ে উন্মাদের মতো ছুটতে থাকেন, মুখে বলেন—আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি (Eureka ! Eureka !) !

এই সূত্র থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, একটা খাঁটি সোনার মুকুট জলপূর্ণ পাত্রে ডোবালেও কিছুটা জল উপচাবে। জলের মধ্যে ওজন করলে তার ওজন কমবে। কতটা ? সমান আয়তন জলের যা ওজন ততটা। এবার তিনি স্বচ্ছন্দে মুকুটটি পরীক্ষা করে দেখলেন। আর্কিমিডিসের এই সূত্র থেকে সৃষ্টি হল—গাণিতিক পদার্থবিদ্যা।

আমরা জানি, কপিকলের সাহায্যে একটা প্রচণ্ড ভারী জিনিস কেমন সহজ ভাবে তোলা সম্ভব। এই কপিকলও আর্কিমিডিসের অবদান।

জ্যামিতিতে ইউক্লিডের অবদান গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস নানাদিকে প্রসার করেছিলেন। এছাড়া তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। সে গ্রন্থগুলি আজও বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ।

প্রথম যৌবনে তিনি আলেকজেন্দ্রিয়া শহরের বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষালাভ করেন। তারপর সিরাকুজে ফিরে এলে রাজা হীরো তাঁকে সামরিক এঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করেন। যোগ্যতার সঙ্গে সে-কাজ সম্পন্ন করলেও বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্যের উদ্‌ঘাটন করার জন্য আর্কিমিডিস চেষ্টা করতেন।

রোমানগণ এক সময় সিরাকুজ রাজ্য আক্রমণ করে। রাজ্যটি রক্ষা করার ভার আর্কিমিডিসের ওপর পড়ে। তিনি এমন এক অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা বহু দূর থেকে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে থাকে। ফলে, শত্রুদের অনেক জাহাজ ডোবে, তারা দিশেহারা হয়। তারপর ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

তিন বছর বাদে ঘটনাচক্রে রোমানরা সিরাকুজ রাজ্যে প্রবেশ করে। রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ আর্কিমিডিসের প্রতিভার কথা ভোলেন নি। তিনি প্রথম থেকেই এই বৈজ্ঞানিকের গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি

শত্রুরাজ্য দখল করে আর্কিমিডিসকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যগণ প্রভুকে ভুল বোঝে।

আর্কিমিডিস তখন তাঁর সাধনায় মগ্ন, রোমানদের আগমনের খবর তিনি রাখেন না। রাখলেও কে জানে হয়তো তা অগ্রাহ্য করেই এক জটিল সমস্যার সমাধানে ডুবে ছিলেন।

সন্ধান করতে করতে একটি সৈন্য তাঁর সামনে হাজির হয়ে আর্কিমিডিসের নাম জানতে চায়। হয়তো সে প্রশ্ন তাঁর কানে পৌঁছায় না। সে আবার রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করে। এবার তিনি জবাব দেন,—একটু অপেক্ষা করো, আর আমার এই রেখার ওপর পা বাড়িও না......। তাঁর সমস্যার আর সমাধান হয় না! ধৈর্যচ্যুত সৈন্যটির তরবারির আঘাতে সেকালের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus), ১৪৭৩-১৫৪৩

বিজ্ঞান জগতে কোপার্নিকাস পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত। একাধারে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক। একজন পুরোহিত ও রাজনীতিজ্ঞ বলেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত তোরিন শহরে তাঁর জন্ম।

এতদিন পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী স্থির, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে। তাঁর মনে সন্দেহ জাগতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোপার্নিকাস তত্ত্বগতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান,—সূর্যের অবস্থান স্থির এবং তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এবং অন্য গ্রহগুলি আবর্তন করছে। সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত —এই মৌলিক সত্যের উদ্ঘাটনেই কোপার্নিকাসের বেশী খ্যাতি।

সে সময় পোল্যাণ্ড দেশটি অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত

ছিল। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। এই কারণে মাঝে মাঝে নানা অশান্তি দেখা দিত। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির পরিপ্রেক্ষিতে কোপার্নিকাস উপলব্ধি করেন,—ভাল টাকা (Good money) ও মন্দ টাকা (Bad money) যদি একই সঙ্গে বাজারে চালু থাকে, তবে জনসাধারণ ঐ ভাল টাকা লুকিয়ে রেখে শুধু মন্দগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। উত্তরকালে তাঁর এই সিদ্ধান্ত অর্থনীতিতে 'গ্রেসাম সূত্র' হিসেবে বাস্তব জগতে স্বীকৃত হয়।

প্রসঙ্গতঃ এক সময় ব্রিটিশ সরকার অনুরূপ অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্য আইজাক নিউটনের শরণাপন্ন হয়। নিউটন কোপার্নিকাসের সূত্র অনুযায়ী প্রস্তাব করেন এবং সরকার সে প্রস্তাব গ্রহণ করে বিশেষ উপকৃত হয়।

দশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হতে পুরোহিত পিতৃব্যের দত্তক পুত্র রূপে কোপার্নিকাস প্রতিপালিত হন।

আঠারো বছর বয়সে তিনি স্বদেশের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে (Cracow) ভর্তি হন। তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল—দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি এবং ভূগোল।

পরের বছর কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এই সময় কোপার্নিকাস আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ইতালিতে যান এবং সেখান থেকে যথাসময়ে 'ডক্টর অব ল' উপাধি লাভ করেন।

কিছুদিন পর কোপার্নিকাস স্বদেশে ফিরে চার্চের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করেন। সেই সঙ্গে উচ্চতর জ্যোতির্বিদ্যাও।

উত্তরকালে কোপার্নিকাস প্রমাণ করেন, পৃথিবী একটি বৃত্তাকার গোলক। পৃথিবী, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহের গতি-প্রকৃতি বিষয়েও তিনি বিশদ ভাবে লিখে গেছেন। যদিও পরবর্তী কালে তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়েছিল তবুও বিজ্ঞান জগতে কোপার্নিকাসের

অবদান অসামান্য এবং নিঃসন্দেহে তিনি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে গেছেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei), ১৫৬৪-১৬৪২

আধুনিক ফলিত বিজ্ঞানের প্রবর্তক হিসাবে গ্যালিলিও বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, সংগীতজ্ঞ এবং চিত্রশিল্পী। ইতালির পিসা শহরে তাঁর জন্ম।

১৬০৯ সনে তিনিই প্রথমে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্যালিলিও নানা তথ্য আবিষ্কার করেন। ঐ দূরবীক্ষণ দিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, আকাশে যাকে 'ছায়াপথ' বলা হয়, আসলে সেটা বহু সংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টি; বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যের চারটি নক্ষত্র তাঁর নজরে পড়ে; শুক্রের হ্রাসবৃদ্ধিও তাঁর নজরে ধরা পড়ে। আর এও দেখলেন, ঐ গ্রহ যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসে তখন তাকে বড় দেখায়। সূর্যকে যে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে, গ্যালিলিও'র দূরবীক্ষণ তাও সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে। এক কথায় এতদিন পর্যন্ত আকাশে যা-কিছু মানুষের দৃষ্টির অগোচরে ছিল সে-সব দুরবীনের কল্যাণে গ্যালিলিও স্পষ্ট দেখতে পান।

বহু শতাব্দী আগে অ্যারিস্টটল বিজ্ঞানের ওপর যে সব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, জনসাধারণ নির্বিচারে তাঁর সে-উক্তি মেনে আসছিল। গ্যালিলিও-ই প্রথমে উচ্চস্থান থেকে পতনশীল পদার্থ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তাঁর পূর্ব-সূরীর বক্তব্য ছিল, ক্ষুদ্র বস্তুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বস্তু তাড়া-তাড়ি মাটির দিকে নেমে আসে।

গ্যালিলিও বললেন, ছোট হোক আর বড়োই হোক, সকল বস্তুর সমান উচ্চতা অতিক্রম করে মাটিতে পড়তে একই সময় লাগে। ফলে,

তাঁর শত্রু বাড়ে এবং চার্চেরও বিষনজরে তিনি পড়েন। তবুও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের থেকে বিচ্যুত হন না। তারপর ১৫৯১ সনের একদিন সকালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মিনারের পাদদেশে উপস্থিত বিদ্বজ্জনসভার সামনে গ্যালিলিও তাঁর মতবাদ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন।

পতনশীল পদার্থ সম্বন্ধে এছাড়াও তিনি আরও অনেক নতুন তথ্য প্রকাশ করেন।

ঘড়ি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। গ্যালিলিও তখন সতর বছরের ...গ্নার। একদিন পিসা শহরের এক গির্জার অভ্যন্তরে ছাদ থেকে কি... ঝাড় লণ্ঠনটির দোলন তাঁর নজরে পড়ে। তাঁর মনে হয়, সেটির ঝুলন্‌কাল যেন একই। নিজের নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর দোলন...র করেন। দোলনকাল সমান। এ থেকে তিনি একটি নতুন সন্দেহ দূ...। এবার তিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা দিয়ে মানুষের সূত্র পা...তি মাপা সম্ভব হয়। যন্ত্রটি উদ্ভব হতে চিকিৎসকগণ বিশেষ নাড়ীর ...য়। গ্যালিলিও'র নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

উপকৃ... পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রটি ব্যবসায়ী হোক। কিন্তু পিতাকে ... করে অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ...ত হন। তাঁর পাঠ্য-বিষয় হয়—দর্শন এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র।

তিনি গণিতের ছাত্র নন। কিন্তু গণিতের অধ্যাপক গণিতে গ্যালিলিও'র আগ্রহ লক্ষ্য করে কৌতূহলী হয়ে একদিন ছাত্রটির সঙ্গে আলাপ করেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সেদিন থেকে তিনি গ্যালিলিওকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা পান। ক্রমে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।

পুরানো-পন্থীদের হাতে জীবনে তাঁকে কম লাঞ্ছনা পেতে হয়নি। তবুও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা অগ্রাহ্য করে তিনি বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন। তাঁর বয়স তখন আশির কাছে, প্রায় দৃষ্টিহীন

অবস্থা, সে সময় একটি দোলকের সাহায্যে পুত্রকে ঘড়ি তৈরির কৌশল শিখিয়ে দেন। কিন্তু সেই নতুন ঘড়ি তৈরির আগেই গ্যালিলিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উইলিয়ম হার্ভে (William Harvey), ১৫৭৮-১৬৫৭

১৬২৮ সনে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চিকিৎসা-জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন হয়। উক্ত গ্রন্থটির কল্যাণে সারা বিশ্বের চিকিৎসকগণের দৃষ্টি খুলে যায়। মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নবযুগ সৃষ্টি করে। এটি ছিল আমাদের দেহের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের গতি-প্রকৃতি নিয়ে লেখা। লেখক—উইলিয়ম হার্ভে।

এতদিন চিকিৎসকগণের বিশ্বাস ছিল, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চারটি কুঠুরি থাকে। আর, ধমনী ও শিরা পথে রক্ত চলে। কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে ঐ রক্ত চলাচলের পথের যোগাযোগ কি, তাঁরা কেউ জানতেন না। সুতরাং অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ডাক্তারগণ চিকিৎসা করতেন। এর মারাত্মক ফল আজ অনুমান করতেও বিভীষিকা হয়।

হার্ভের মনে সন্দেহ জাগতে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—যে-রক্ত উক্ত বাঁদিকের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসে, সেই রক্তই ক্রমে ক্রমে ডানদিকের কুঠুরিতে ফিরে আসে ; আসলে ব্যাপারটা বৃত্তাকারে চলে। এবং এ প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। হৃদয়টা একটা পাম্পের মতো কাজ ক'রে দেহে রক্ত ছড়িয়ে দেয়, সেই রক্ত আবার একত্র হয়ে হৃদয়ের ডানদিকের কুঠুরিতে ফিরে আসে।—হার্ভে শরীরতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করে প্রচলিত বিশ্বাসকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করেন।

হার্ভের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হতে চিকিৎসকগণ তাঁকে প্রথমে উন্মাদ বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। রোগীরাও একে একে হার্ভের

কাছ থেকে দূরে সরে যায়। হার্ভে কিন্তু তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকেন। ক্রমে চিকিৎসকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বিশেষ উপকৃত হন।

ইংলণ্ডের ফোক্‌স্টোন শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হার্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি পাডুয়াতে যান। সেখান থেকে উপাধি লাভ করে কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকেও অনুরূপ একটি উপাধি নেন। তারপর লণ্ডনে চিকিৎসা-ব্যবসা শুরু করেন।

কিছুদিন পর তিনি বিয়ে করেন। এবার বিবাহ সূত্রে অর্থাৎ ডাক্তার শ্বশুরের মাধ্যমে হার্ভে রাজপরিবারের সান্নিধ্যে আসেন। ক্রমে তিনি রাজার চিকিৎসকরূপে নির্বাচিত হন। অল্পদিনের মধ্যে সে পরিবারের একজন বিশেষ বিশ্বস্ত এবং প্রিয়ভাজন হন। গবেষণার জন্য রাজার নিকট থেকে হার্ভে বিশেষ উৎসাহ এবং অনুগ্রহও পেয়েছিলেন।

যে-ইংলণ্ডের চিকিৎসকমণ্ডলী এক সময় তাঁর গবেষণার জন্য হার্ভের প্রতি মারমুখী হয়েছিলেন, ১৬৫৪ সনে তাঁরাই Royal College of Physicians-এর সভাপতির আসনটি অলঙ্কৃত করবার জন্য হার্ভেকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বার্ধক্যের জন্য সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও, পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে সেবা করবার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুত হন। একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার এবং একটি মূল্যবান মিউজিয়ম সহ একটি বিরাট বাড়ি তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে উপহার দেন।

ক্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে, জীবন-দীপ স্তিমিত হয়ে আসে, তবুও তিনি সাধ্যমতো কাজ করবার চেষ্টা করেন। এমন সময় একদিন হঠাৎ বাতে পঙ্গু হন, সেই সঙ্গে তিনি বাক্‌শক্তি হারান। ক'দিনের মধ্যেই ঐ যন্ত্রণার হাত থেকে হার্ভে চিরদিনের জন্য মুক্তি পান। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সব বিষয়-সম্পত্তি উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে উৎসর্গ করে যান।

তিনি ছিলেন নিঃসন্তান এবং স্ত্রী তাঁর ক'বছর আগেই স্বর্গতা হয়েছিলেন।

স্যার আইজাক নিউটন্ (Sir Isaac Newton), ১৬৪২-১৭২৭

গণিত, পদার্থ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য মৌলিক অবদানের জন্য কালগত হয়েও 'নিউটন' নামটি আজও প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর আবির্ভাবের আগে সৃষ্টিক্রম একান্তভাবে দার্শনিক কল্পনার মধ্যে সীমিত ছিল, পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে কোন যোগসূত্র ছিল না। তাঁর আবিভাবে বিজ্ঞানের নবযুগের সূচনা হয়।

নিউটন-ই প্রথম প্রচার করেন,—প্রকৃতির সকল নিয়মই বিশ্বজনীন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে-সব শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করি, সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে সেগুলি ক্রিয়াশীল।

তাঁর মতে,—যে শক্তি সেদিন আপেলটিকে মাটির দিকে আকর্ষণ করেছিল, সেই শক্তিই গ্রহগুলিকে ধরে রেখেছে তাদের কক্ষপথে। মহাজগতের সৃষ্টির মূলেও সেই একই শক্তির প্রভাব। নিউটন তাঁর আবিষ্কৃত উক্ত মহাকর্ষবলের সূত্র প্রয়োগ করে গ্রহ উপগ্রহ এবং ধূমকেতুর গতিপথ স্থির করেন। সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটাও এই সূত্রে মীমাংসিত হল। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নতুন পথের পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত হল।

মহাকর্ষ-তত্ত্ব আবিষ্কারের পর নিউটন ভরবেগ ও ত্বরণ সম্বন্ধে তাঁর কল্পনা সুনির্দিষ্ট করে 'গতিসূত্র' (Laws of Motion) প্রকাশ করেন। অবশ্য এ আবিষ্কারটি তিনি দীর্ঘ বিশ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছিলেন।

প্রথম সূত্র—বাহির হতে প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে। এবং সচল বস্তু সমবেগে সরলরেখা অবলম্বন করে চিরকাল চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র—কোন বস্তুর ভরবেগের (Momentum) পরিবর্তনের হার বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে হয়।

তৃতীয় সূত্র—প্রত্যেক ক্রিয়ারই (action) সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction) আছে।

আলোর ওপরও নিউটন নানা পরীক্ষা করেন্। সূর্যরশ্মির মধ্যে প্রথমে তিনি-ই সাতটি রং লক্ষ্য করেন। তারপর তিনি আরও গবেষণা করে সিদ্ধান্তে আসেন,—সূর্যের সাদা আলো বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমষ্টি।

এবার তিনি এক নতুন ধরনের দূরবীক্ষণ তৈরী করেন। এতে প্রতিবিম্ব চল্লিশগুণ মত বড় দেখাল। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব বড় বড় দূরবীক্ষণের সন্ধান আমরা জানি, সেগুলি এঁরই প্রবর্তিত প্রণালীতে তৈরী।

আইজাকের বয়স যখন পনর তাঁর মা স্থির করেন, ছেলে চাষী হবে। তিনি তাকে মাঠে পাঠান। কিন্তু সে গরু চরাবে কি, প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে বালক মত্ত থাকে। কিছুদিন যেতে মা ভেবে চিন্তে ছেলেকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে স্থির করেন। তখন নিউটনের বয়স উনিশ।

ছাত্র হিসেবে নিউটনের সুনাম ছিল না। গোড়াতে তাঁর মেধারও প্রকাশ ছিল না। একদিন একজন সহপাঠীর সঙ্গে মারামারি করে নিউটন দৃঢ় সংকল্প করে, লেখাপড়াতেও সে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে যাবে। সত্যিসত্যি এথেকে তাঁর জীবনের গতির মোড় ফিরে যায়।

অযাচিত ভাবে জীবনে তিনি প্রচুর সম্মান পেয়েছেন ঃ অল্প বয়সে অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হন। ক্রমে রয়াল সোসাইটির সভ্য পদে নিযুক্ত হন এবং উত্তরকালে সেখানের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। একসময় ইংলণ্ডের টাঁকশালের অধিকর্তা হিসেবে মনোনীত হন। সবশেষে, রাণী অ্যান নিউটনকে ‘নাইট’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

আঁতোয়া লাভোয়াসিয়ে (Lavoisier Antoine), ১৭৪৩-৯৪

লাভোয়াসিয়েকে আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক বলা হয়ে থাকে। প্যারিসে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। কর্মজীবনে আইনবিদ হবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজেকে তিনি তৈরীও করছিলেন। তবে খেয়াল খুশি মতো ফাঁক পেলে শহরে রসায়নবিদ্যার ওপর কোন বক্তৃতা হলে তিনি তা শুনতে যেতেন। এমনি ভাবে ঐ সব বক্তৃতা শুনতে শুনতে তাঁর মনে বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি রসায়নবিদ্যার চর্চায় অংশ গ্রহণ করেন এবং গবেষণায় ব্রতী হন।

তাঁর আগে রসায়নবিদ্যায় মাপজোকের হিসাব ছিল না। তিনি প্রথমে প্রচলিত জল্পনা কল্পনাকে যাচাই করতে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডের সাহায্য নেন। তিনিই রসায়নবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান।

লাভোয়াসিয়ের পূর্বসূরীদের বিশ্বাস ছিল,—প্রত্যেক দাহ্য পদার্থে দু'টি অংশ বর্তমান—ভস্ম ও ফ্লজিস্টন। পদার্থটা পুড়ে গেলে ফ্লজিস্টনটা উবে যায়, তখন পড়ে থাকে শুধু ভস্ম।

সে সময়কার বিশিষ্ট রসায়নবিদ প্রিস্টলি বায়ু থেকে এক প্রকার গ্যাস বার করে জানালেন সেটা ফ্লজিস্টনবর্জিত; প্রাণধারণের পক্ষে, বিশেষ করে ফুসফুসের ব্যারামে বিশেষ উপকারী।

লাভোয়াসিয়ে উক্ত বৈজ্ঞানিকের উক্তি সাময়িক ভাবে মেনে নিয়ে পরীক্ষায় ব্রতী হন। তিনি ঐ ফ্লজিস্টনবিহীন বায়ুর নাম দেন—অক্সিজেন। পারাটা উত্তপ্ত হতে যে লাল গুঁড়োয় পরিণত হয়, ওজন করে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন, ঐ পারার তুলনায় গুঁড়োর ওজন কিছুটা কমে, আর যতটা কমে ঠিক সেই ওজনের অক্সিজেন বেরয়।

এই পরীক্ষা থেকে লাভোয়াসিয়ে দহন সম্বন্ধে আর একটি অভিনব সিদ্ধান্তে পৌছান। ধাতু গরম হলে ওজনে বাড়ে। তার কারণ হিসেবে তিনি জানালেন, উত্তপ্ত অবস্থায় ধাতু বায়ু থেকে কিছুটা অক্সিজেন গ্রহণ করে—এটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা সংযোগের ফল।

এমনি ভাবে পুরানো ফ্লজিস্টন তত্ত্বর স্থানে রসায়নবিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দৃঢ় হয়।

মানুষ বা কোন জীব শ্বাস গ্রহণ করবার পর ঐ বায়ুর কি পরিবর্তন হয় সে সম্বন্ধেও লাভোয়াসিয়ে পরীক্ষা করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত, ওখানেও দহন ক্রিয়া চলে।—দেহ অক্সিজেন অংশটুকু ভেতরে গ্রহণ করে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড বার করে দেয়।

হাইড্রোজেন গ্যাসের আবিষ্কারের গৌরবও লাভোয়াসিয়ের। পদার্থবিদ্যায়ও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তখন তাঁর বয়স বিশ বছরের বেশি নয়। প্যারিস শহরের রাস্তা আলোকিত করবার পদ্ধতি নিরূপণ করবার জন্য এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। সেই প্রতি-যোগিতায় সাফল্যের জন্য লাভোয়াসিয়ে ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমী থেকে পুরস্কৃত হন। দু'বছর বাদে তিনি আকাদেমীর সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

বিপ্লবের আগে যে প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করতো, লাভোয়াসিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। বিপ্লবী-সরকার ক্ষমতা হাতে পেতে এই বৈজ্ঞানিক অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়।

ফরাসী জাতির বুঝতে দেরী হল না, উন্মত্ত জনতার নৃশংসতা শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই নির্মম ভাবে আঘাত করেনি, বিশ্ববাসীকেও করেছে। তারা রাজাকে হত্যা করেছিল সেটাও বড় কথা নয়, রসায়নবিদ্যার জনক লাভোয়াসিয়ের অমূল্য জীবন অমনি ভাবে নষ্ট করে গোটা মানবজাতির ইতিহাসকে তারা কলঙ্কিত করেছে।

এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner), ১৭৪৯-১৮২০

গ্রামীণ কথা বা বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠলে শিক্ষিত এবং শহুরে লোকেরা সাধারণত হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এটা শুধু আমাদের দেশের

প্রচলিত রীতি নয়, কথাটা কম বেশী প্রায় সব দেশেই প্রযোজ্য। অথচ এমনি একটি বিশ্বাসের ভেতরই লুকিয়ে ছিল বর্তমান কালের বসন্তের টিকা অথবা ঐ মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধকের নিগূঢ় তত্ত্বটি—যার উদ্‌ঘাটন করেন জেনার। এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে জগদ্‌বাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে যেমন বাংলা-টিকার প্রচলন ছিল বিদেশের নানা জায়গাতেও অনুরূপ বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। এ পদ্ধতি মন্দের ভাল হলেও এর হাঙ্গামা বা বিপদও ছিল অনেক, লোকের কষ্টের সীমা ছিল না। অনেকে ঐ যন্ত্রণা বা ক্লেশের ভয়ে সহজে ইন্‌জেকসন নিতেও চাইতো না, এড়িয়ে যেতো। টিকার আবিষ্কারক স্বয়ং জেনারকেও ঐ রকমের টিকাই নিতে হয়েছিল। ফলে তাঁকে ছ'সপ্তাহ শয্যাশায়ী থেকে কষ্ট পেতে হয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই জেনারের মনটা খুব দরদী ছিল। প্রধানতঃ মানুষের সেবা করার উদ্দেশেই তিনি চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করার সিদ্ধান্ত করেন।

জেনারের ছাত্র-জীবনেই সেই গ্রাম্য-কথাটার প্রতি তাঁর মন আকৃষ্ট হয়,—একবার কারুর গো-বসন্ত হয়ে গেলে বা কেউ নিয়ে নিলে তার আর জীবনে বসন্ত হবার ভয় থাকে না।

এ বিষয় নিয়ে তিনি বহু সতীর্থের সঙ্গে আলোচনা করবার চেষ্টা করেন। কোন ফল হয় না। নিজে অনেক অনুসন্ধান করেও কোন কূলকিনারা পেলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি হালও ছাড়লেন না।

ততদিনে তিনি পাশ করে ডাক্তারি শুরু করেছেন। সময়টা ১৭৮০ সাল। এতদিনে ঐ গো-বসন্তের ভেতর কি যেন তিনি খুঁজে পান। স্পষ্ট না হলেও—আশার আলো তো বটে।

কিছুদিন বাদে একটি গোয়ালিনী তাঁর কাছে এসে হাতের বড়ো ফোড়াটা দেখিয়ে ওষুধ চায়। জেনার জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন ওটি

গো-বসন্ত। জেনার মহিলাকে ওষুধ দিয়ে তার ফোড়া থেকে একটু পুঁজ রেখে দেন।

ঐ পুঁজ দিয়ে ক'দিন বাদে নতুন পদ্ধতিতে একটি আট বছরের ছেলেকে জেনার প্রথম টিকা দিলেন। আশ্চর্য ফল পেলেন। ছেলেটির কোন কষ্ট হল না, গা দিয়ে বসন্ত ফুটে উঠল না। ইতিমধ্যে ঐ পাড়ায় বসন্তের দরুণ মড়ক দেখা দিল। কিন্তু ছেলেটির কিছু হল না।

দীর্ঘ বিশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন। তবুও তিনি আরও ত্ব'বছর গবেষণা করলেন। তাঁর নিজের ছেলের ওপরও তিনি ঐ টিকা চালিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না।

১৭৯৮ সনে জেনার এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করতে চিকিৎকগণ তাঁকে রূঢ় ভাবে বিদ্রূপ করতে শুরু করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গচিত্র বেরোয়। কিন্তু তিনি এতটুকুও দমেন না।

ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশের লোকেরা তাঁর আবিষ্কারে আস্থা পায়। সম্রাট নেপোলিয়নও এই টিকা নিয়ে জেনারের গুণগ্রাহী হন। ব্যক্তিগত উপার্জনের কথা ভুলে গিয়ে জেনার খুশি মনে তাঁর আবিষ্কারের পদ্ধতি সবদেশে জানিয়ে দেন। ফলে, পৃথিবী আজ মারাত্মক বসন্ত রোগের বিভাষিকা থেকে মুক্ত।

মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday), ১৭৯১-১৮৬৭

যে তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে আমাদের ঘরে ঘরে পাখা ঘোরে, শহর আলোকিত হয়, ট্রেন বা ট্রাম চলে, টেলিফোন বাজে, টেলিগ্রাফ পাঠানো সম্ভব হয়েছে তার উদ্ভাবক হলেন ফ্যারাডে—উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

তাঁর পিতা ছিলেন একজন সাধারণ কামার আর মা ছিলেন একটি চাষীর মেয়ে। চরম ত্বর্দশা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে যা-হোক করে শিশু ফ্যারাডে বড় হতে থাকেন। তারপর মাত্র তের বছর বয়সে জীবিকার

জন্য এক দপ্তরীর কারখানায় তিনি 'বয়' হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানে এক বছর বাদে বই বাঁধাই-এর কাজে তাঁর পদোন্নতি হয়। লেখা-পড়া বিশেষ কিছু না জানলেও তাঁর জ্ঞানের পিপাসা ছিল অদম্য। এবার ভাল ভাল নানা বিষয়ের বই পড়বার তিনি সুযোগ পান।

পদার্থবিদ্যাটার ওপর-ই ছিল তাঁর বেশী ঝোঁক। বেতন ছিল খুবই সামান্য। তবুও তা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে টিকিট কিনে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে যেতেন। ঘটনাচক্রে একদিন সেসময়কার বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রে ডেভির বক্তৃতা শুনবার তিনি সুযোগ পান। শুনে তিনি অভিভূত হয়ে সেই বক্তৃতার তথ্য এবং তাৎপর্য সংক্ষেপে টুকে নিয়ে পরে সেটি বড় করে লিখে যত্ন করে রেখে দেন।

ক্রমে তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়, বিজ্ঞানের সেবা করা। তিনি রয়াল ইনস্টিটিউশনে আবেদন করেন। এই অশিক্ষিত দপ্তরী ছেলেটির আবেদনে কোন ফল হয় না। এবার ফ্যারাডে ডেভির সেই বক্তৃতার সারাংশ সহ সরাসরি ডেভির কাছে নতুন করে আবেদন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

১৮১৩ সনে তাঁর বাইশ বছর বয়সে ফ্যারাডে রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে একজন সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর আশাতীত দক্ষিণাও পান, সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং।

স্কুলে সাধারণ শিক্ষাও তিনি পাননি। তাই প্রায় গোড়া থেকে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়, বিশেষ করে বিজ্ঞান-বিষয়ে।

কিছুদিন পর ডেভির সঙ্গে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র পরিদর্শন করবার সুযোগ পান। ফলে তিনি প্রভূত উপকৃত হন।

স্বদেশে ফিরে এসে তিনি স্বাধীন ভাবে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। প্রথম দিকে তাঁর অনুসন্ধান ছিল রসায়ন বিষয়ে। ক্রমে একটির পর একটি করে তাঁর আবিষ্কার প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮২৪ সনে ফ্যারাডে রয়াল সোসাইটির সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হন। পরের বছর ডেভি অবসর গ্রহণ করলে তিনি তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করেন।

আরও কিছুদিন পরের কথা। বৈজ্ঞানিকদের সামনে ফ্যারাডে তড়িৎ-চুম্বক সম্বন্ধে পরীক্ষা করে তাঁদের স্তম্ভিত করে দেন। উত্তরকালে এ গবেষণাই তাঁকে অমর করে।

তিনি আবিষ্কার করেন, একটি তামার তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে যদি একটি চুম্বককে চালিত করা যায়, তবে সেই তারের ভেতর তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হবে। এই আবিষ্কারের ফলশ্রুতি—বর্তমানযুগের তড়িৎ জেনারেটার ও তড়িৎ মোটর।

এই আবিষ্কারের পর বিপুল অর্থ উপার্জন করে নিশ্চিন্ত আরামে তিনি বাকি দিনগুলি কাটাতে পারতেন। কিন্তু গরিব থেকে মানব-জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের সেবা করার কঠিন পথটাই তিনি সানন্দে বেছে নেন। মানও ফ্যারাডে চাইলেন না। সোসাইটি দু' দুবার তাঁকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবার প্রস্তাব করে। ফ্যারাডে সবিনয়ে জানান, তিনি মাইকেল ফ্যারাডে হয়েই থাকতে চান। সত্যিসত্যিই অম্লানচিত্তে আজীবন তিনি এ পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার পুষ্ট করে গেছেন।

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনায় রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব কোন গৃহও ছিল না—ঐ প্রতিষ্ঠানের এক কোণে অতি সাধারণ ভাবে তিনি পরমানন্দে জীবন কাটিয়েছেন।

চার্লস ডারউইন (Charles Darwin), ১৮০৯-১৮৮২

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নানা মত ছিল। থেল্‌সের মতে, ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু উৎপত্তি হয়েছিল জল থেকে। আবার,অ্যারিস্টটলের ধারণা ছিল, কুমীরের উদ্ভব নীল নদীর কাদা থেকে।

১৮৫৯ সনের ২৪শে নভেম্বর ডারউইন প্রণীত 'প্রজাতির উৎপত্তি'

(Origin of Species) প্রকাশিত হতে এক বিতর্কের ঝড় ওঠে। তাঁর সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানজগৎ স্তম্ভিত হয়। মানবজাতি চমৎকৃত হয়। ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, জীববিদ্যা সবক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘ বিশ বছর গভীর অনুসন্ধান এবং গবেষণার পর জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ডারউইন বিশ্ববাসীকে নতুন কথা শোনালেন। মানবজাতি জানল, তার উৎপত্তির মূল সূত্র।

ডারউইন জানালেন,—এক প্রজাতি ক্রমে ক্রমে অন্য এক প্রজাতিতে পরিবর্তিত হয়। যত জীব জন্মায় শেষ পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যকই বেঁচে থাকে, বিশেষ করে নিম্নস্তরের জীব-সম্প্রদায়। হাজার হাজার বছরে ঘোড়া একটি ছোট্ট কু-দৃশ্য লোমশ জানোয়ার থেকে তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। জীবন-সংগ্রামে যারা বেশি যোগ্য তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। বানরের ঠিক বংশধর না হলেও অনেকটা ঐ জাতীয় জীব থেকে মানুষের বিবর্তন হয়েছে,—কথাটা শুনে লজ্জা পেলেও ডারউইনের এ সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তি দিয়ে কেউ খণ্ডন করতে পারল না।

ডারউইন তাঁর পূর্বসূরীদের মতো কোন কল্পনার আশ্রয় নেননি, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি গভীর ভাবে দীর্ঘ দিন অনুশীলন করে—নিজের বিচারবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক মতে প্রয়োগ করেছিলেন।

ডারউইন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁর মেধার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্র হিসেবেও নয়। তাঁর পিতার ইচ্ছা তিনি পাদ্রী হোন। সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিক্ষার জন্য তিনি পুত্রটিকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন।

যথাসময়ে চার্লস ডিগ্রী পেলেন। কিন্তু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি মন থেকে কোন সাড়া পান না। কারণ, বালক বয়স থেকেই প্রাকৃতিক অজ্ঞাত রাজ্যের জন্য তাঁর একটি নাড়ির টান ছিল। এখন তিনি গাছ-পালা জীব-জন্তু পর্যবেক্ষণ করে দিন কাটাতে থাকেন। আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। এমন সময় সুযোগ এসে যায়।

'বিগল' নামে একটি জাহাজ দক্ষিণ অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরবে, সেটির জন্য জীববিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু একজন লোকের প্রয়োজন।' ডারউইন মনোনীত হন।

পাঁচ বছর ধরে সে জাহাজে ডারউইন নানা জায়গায় ঘুরলেন। সেসব স্থান থেকে তিনি বহু নমুনা সযত্নে সংগ্রহ করলেন। তারপর তিনি প্রকৃতির বিচিত্র অভিব্যক্তি সম্বন্ধে গভীর ভাবে গবেষণা শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে জগৎবাসী পেলো ডারউইনের ঐ অভিনব সিদ্ধান্ত।

বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তিনি গভীর ভাবে গবেষণা করে গেছেন। ভাবতেও অবাক লাগে' জীববিজ্ঞানী, বিবর্তন-তত্ত্বের উদ্ভাবক চিত্তবিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে শুধু হাল্কা উপন্যাস পড়তেন।

ওএস্টমিনস্টর অ্যাবিতে নিউটনের পাশে ডারউইন সমাধিস্থ হন।

লুই পাস্তুর (Louis Pasteur), ১৮২২-'৯৫

ফরাসী দেশে একসময় ভোট নেওয়া হয়েছিল,—দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কে? সে-ভোটে বহু লোক অংশ গ্রহণ করেছিল। গণনায় দেখা গেল, প্রথম নাম—পাস্তুর, দ্বিতীয় নেপোলিয়ান এবং তৃতীয় ভিক্তর হুগো। আর আজ যদি প্রশ্ন ওঠে কোন্ বৈজ্ঞানিক সমগ্র মানব-জাতির সবচেয়ে বেশী কল্যাণ সাধন করেছেন, নিঃসন্দেহে সেখানেও পাস্তুরের নামটি বলতে হবে। কারণ, পাস্তুর ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবাণুবিদ ও রসায়ন-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

ছাত্রজীবনের গোড়া থেকেই রসায়ন-বিদ্যায় তাঁর ঝোঁক ছিল। যদিও বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি লাভ করবার পর প্রথমে লুই কিছুদিন পদার্থ-বিদ্যায় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, তারপর রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

এ পর্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল জীব থেকেই জীবাণুর উৎপত্তি।

পাস্তুরের মনে সন্দেহ জাগতে অনেক অনুসন্ধান করে জানতে পারেন আগেকার সিদ্ধান্ত ভুল। তিনি প্রমাণ করেন, শুধু বায়ুতে নয়, ধূলি-কণাতেও প্রচুর জীবাণু থাকে—কোথাও কম কোথাও বা বেশি। বদ্ধ শয়ন ঘরে জীবাণুর আধিপত্য বেশী আবার পর্বতের উপরকার বায়ুতে তারা খুব কম থাকে। প্রসঙ্গত, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই লর্ড লিস্টার জীবাণু-নাশক পদ্ধতি প্রবর্তন করে শল্য চিকিৎসায় যুগান্তর সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিছুদিন আগেকার কথা। পাস্তুর তখন লিলির ফ্যাকালটি অব সায়েন্স-এর ডিন। কোহল তৈরির প্রতিষ্ঠান তাঁকে জানায়, তাদের কোহল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, অথচ কারণ কিছুতেই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পাস্তুর দেখলেন, চিনি গেঁজে ওঠা হল কোহল তৈরির মূল কথা; কিন্তু ঐ চিনিকে (ফলজাত) গাঁজিয়ে তোলে জীবাণু। তিনি আরও লক্ষ্য করেন, দুধ যে টকে যায়, মাখনের ওপর যে ছাতা পড়ে, এ সবার মূলেই ঐ একই ব্যাপার। পাস্তুর পরীক্ষা করে দেখলেন, লম্বাটে এক রকমের জীবাণু কোহলকে খারাপ করছে। ঐ জীবাণু বিনাশের ব্যবস্থা করতে, কোহল আর খারাপ হল না।

১৮৬৫ সন। দক্ষিণ ফ্রান্সের গুটিপোকার মড়ক শুরু হয়। ঐ গুটিপোকা চাষ-ই ছিল স্থানীয় অধিবাসীগণের একমাত্র উপজীবিকা। রেশম ব্যবসা বন্ধ হয় আর কি! সরকার পাস্তুরকে প্রতিকারের উপায় নিধারণ করবার জন্য অনুরোধ করে। পরীক্ষা করে পাস্তুর সেই বিশেষ রকমের জীবাণু চিনলেন; প্রতিষেধের ব্যবস্থা করলেন। মড়ক বন্ধ হল। ফ্রান্সের জাতীয় ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত হয়। পাস্তুরের এ আবিষ্কারের ফলে, ১৮৭০ সনে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সকে যে পরিমাণ খেসারত দিতে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ ফ্রান্স উপার্জন করে।

সে সময় 'অ্যানথ্রাক্স' রোগে প্রতি বছর বহু জীবজন্তুর প্রাণনাশ হতো। এবার পাস্তুর সে-রোগের প্রতিকারে মন দেন। গভীর

অনুশীলনের পর তিনি সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পান। তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জেনে পশু চিকিৎসাবিদরা তাঁকে উপহাস করেন। তারপর ১৮৮১ সনের ২রা জুন সমবেত বিশেষজ্ঞ এবং সংবাদিকদের সামনে পাস্তুর তাঁর পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রমাণ করেন।

তাঁর পরিণত বয়সে পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের কারণ ও তার নিবারণের পদ্ধতি নির্ণয় করেন। দূরদেশ থেকে এই প্রতিষেধক সিরাম ইনজেক্‌সন তাঁর পরীক্ষাগার থেকে সংগ্রহ করার অসুবিধা দূর করতে পাস্তুর তাঁর প্রণালী মতে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে আজ পৃথিবী এই মারাত্মক রোগের বিভীষিকা থেকে মুক্ত।

মজার কথা,—**পাস্তুর কোনদিন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেননি।** তবুও তিনি বহু ব্যাধির কারণ নির্ণয় করেছেন এবং চিকিৎসকগণকে তার প্রতি-কারের উপায়ও জানিয়ে গেছেন তাঁর অক্লান্ত সাধনার মাধ্যমে। শুধু চিকিৎসকগণ নয়, তাঁর এই অবদানের জন্য বিশ্ববাসী পাস্তুরের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

জোসেফ ব্যারন লিস্টার (Joseph Lord Lister),

১৮২৭-১৯১২

একটি প্রবাদ আছে,—'নেপোলিয়নের সবগুলি যুদ্ধে যত লোকের প্রাণনাশ হয়েছিল, আজ প্রতি বছর লিস্টারের আবিষ্কার তার চেয়ে বেশী লোকের জীবন রক্ষা করছে'।

উক্ত আবিষ্কারটি ছিল, অ্যানটিসেপটিক বা জীবাণু-নাশক পদ্ধতি। এই অমূল্য আবিষ্কারটি শল্য চিকিৎসায় এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। এখন আর কোন দেশে সেই পুরাতন কথাটা শুনতে হয় না,—অস্ত্রোপচারটা ভাল ভাবেই হয়েছিল কিন্তু পরে রোগীর রক্ত দূষিত হওয়ায় তাকে আর বাঁচান সম্ভব হলো না।

১৮৬৪ সনে পাস্তুরের আবিষ্কার থেকে প্রথমে জানা যায়, শুধু বায়ুতেই অগণিত জীবাণু থাকেনা, তারা মানুষের দেহকোষের মধ্যেও অদৃশ্য থাকে।

পাস্তুরের সিদ্ধান্ত থেকে লিস্টারের মনে হয়, আমাদের দেহের ক্ষত-স্থানের পচন হয়তো সেজন্যই হয়ে থাকে। তাই অস্ত্রোপচারের আগে ঐ বিশেষ জায়গাটিকে এবং পরে সেখানের ক্ষতটিকে জীবাণুমুক্ত করতে পারলে দেহের রক্ত হয়তো আর দূষিত হবে না।

লিস্টার স্থির করেন, এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য খুঁজে বার করতে হবে যা জীবাণুকে নষ্ট করবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কার্বলিক এসিড-কে মনোনীত করেন।

১৮৬৫ সনে লিস্টার প্রথমে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করেন। ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি এটি ঐস্থানে প্রয়োগ করতেন এবং অস্ত্রোপচারের আগে যন্ত্রপাতিগুলো ভাল করে গরম জলে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও তিনিই প্রথম উপলব্ধি করে-ছিলেন।

এমনি ভাবে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহারে লিস্টার আশ্চর্যরকম সুফল পেলেন। পুরাতনপন্থীরা তাঁর পদ্ধতিকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু লিস্টার কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত মতো কাজ করেন। ফলে ওয়ার্ডে মৃত্যুহার আশাতীত কমে যায়। তবুও পাশের ওয়ার্ডের ডাক্তারের হুঁশ হয় না।

ক্রমে ক্রমে লিস্টারের প্রবর্তিত পদ্ধতির মূল বক্তব্য গ্রহণ করে শল্য-চিকিৎসা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে লিস্টার অস্ত্রোপচারের অনেক অভিনব পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন যা যে কোন শল্য-চিকিৎসককে বিখ্যাত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই আবিষ্কারের কাছে তাঁর সেসব অবদান ম্লান হয়ে গেছে। এই আবিষ্কারটিই লিস্টারকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে।

১৮৭৯ সালে আমেস্টার্ডামে সর্বজাতীয় চিকিৎসা কংগ্রেসের এক

অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে সভাপতি সব জাতির তরফ থেকে লিস্টারকে তাঁর আবিষ্কারের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাঁর দেশবাসীও লিস্টারকে প্রচুর সম্মান দেখায়। ১৮৮৩ সনে তিনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন। এর পূর্বে আর কোন চিকিৎসক এই দুর্লভ সম্মান পান নি। এরপর ১৮৯৪ সনে তিনি রয়াল সোসাইটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পর লিস্টারের মরদেহ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি'তে রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়।

রন্‌টগেন (Roentgen), ১৮৪৫-১৯২৩

বর্তমান জগতে একস্-রশ্মি অথবা X-Ray'র প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এক কথায় সভ্যজগতে আজ একস্-রশ্মিকে বাদ দিয়ে বাঁচবার কথা ভাবা যায় না। এক আকস্মিক ঘটনা থেকে এর সৃষ্টি, যা পদার্থ এবং চিকিৎসাবিদ্যার নতুন নতুন প্রবেশ পথ উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করে; যা ছিল মানুষের অজ্ঞাত বা দৃষ্টির অগোচরে, এই রশ্মির মাধ্যমে মানুষ তা দেখতে পেলো স্বচ্ছভাবে।

এই আশ্চর্য রশ্মির সৃষ্টি হয় এর আবিষ্কারক রন্‌টগেন-এর দু'টি খেয়াল থেকে—ফটোগ্রাফি চর্চা এবং কাচের নল গালিয়ে তার বিভিন্ন রূপ দেওয়া। বিজ্ঞানী বলে তখনও কেউ তাঁর নাম শোনেনি। ১৮৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বৈজ্ঞানিকগণ রন্‌টগেনের এই আবিষ্কারের কথা জেনে স্তম্ভিত হয়।

জুরিক্-য়ে শিক্ষান্তে গুরু অধ্যাপক কুণ্ডের সহকারী রূপে রন্‌টগেন কাজ করতে শুরু করেন। কয়েক বছর ঐস্থানে কাজ করবার পর এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যাপক হন।

সে সময় তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে নানা পরীক্ষা চলছিল। রন্‌টগেনও এমনি একটি পরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন। কাচের বাল্‌ব তৈরি করে সেটিকে

যথাসম্ভব বায়ুমুক্ত করে তিনি তার ভেতর তড়িৎমোক্ষণ পাঠাচ্ছিলেন। ঐ টেবিলটির ওপর অনেকগুলো বই, ফটোগ্রাফি নল ইত্যাদিও ছিল। সেদিন কাগজে মোড়া একটি ফটোগ্রাফি-প্লেটের উপর একটি বইর ভেতর চিহ্ন হিসাবে একটি চাবি ছিল।

দু'দিন বাদে একটি আলোকচিত্র নিতে ঐ প্লেটটি রন্‌টগেন ব্যবহার করেন। প্লেটটা ডেভেলাপ করতে চাবিটির ছায়া স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তিনি ভেবে পান না এটা কি করে সম্ভব হলো।

অনেক পরীক্ষার পর রন্‌টগেন লক্ষ্য করেন, ঐ অদৃশ্য রশ্মি বইর পাতা ছাড়া আরও বহু জিনিস সহজ ভাবেই ভেদ করতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা বোধগম্য হয় না।

আবার পরীক্ষা শুরু হয়। এবার তাঁর মনে সন্দেহ হয়, পাত্রের কাচ যখন তড়িৎ-মোক্ষণে দীপ্তি দেয় তখন হয়তো ঐ অদৃশ্য আলোকপাতে অন্য জিনিসও ভাস্বর হয়। অবশেষে রন্‌টগেন লক্ষ্য করেন, ঐ অদৃশ্য আলোটি যখন বেরিয়ম প্লাটিনোসায়ানাইডের ওপর পড়ে তখন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়।

অঙ্ক শাস্ত্রে যেটা অজ্ঞাত থেকে যায় সেটাকে এক্স্ (X) বলেই ধরে নেওয়া হয়। ন্‌টগেনও তাঁর এই অজ্ঞাত আলোর নামটি দিলেন—এক্স্-রশ্মি। ক্রমে তিনি জানতে পারেন, কম ঘনত্বের জিনিসই এই রশ্মি ভেদ করতে পারে, ঘনত্ব বেশি হলে ততটা পারে না। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের হাতের ওপর রশ্মি ফেলে হাতের হাড়ের ছবি দেখে রনটগেন তাঁর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০০ সালে রন্‌টগেন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দীর্ঘকাল তিনি ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

টমাস আল্‌ভা এডিসন (Thomas Alva Edison),
১৮৪৭-১৯৩১

দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আমরা যেদিকেই তাকাই না কেন,—ঘরের বিজলী বাতি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোন, সিনেমা, এমনি আরও কত কি—এসব অমূল্য অবদানের জন্য বিশ্ববাসী এডিসনকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। ভাবতেও অবাক লাগে, এক জীবনে তিনি কি করে বার শ' নতুন যন্ত্রের পেটেণ্ট নিয়েছিলেন। বারশটি আবিষ্কার! নিঃসন্দেহে এডিসন এ যুগের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারক।

মজার কথা, তিনি কোন শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষা পাননি। তিন মাস মাত্র স্কুলে যাওয়া-আসা করেছিলেন। বাড়ীতে মা'র কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পান, বাকীটা নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় আয়ত্ত করেন। অবশ্য বালক বয়স থেকেই বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি এডিসনের গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

তখন তাঁর বয়স এগারোর বেশী নয়। এডিসন একদিন ডাক্তারখানা থেকে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য কিনে এনে বাড়ির এক কোণে নানা পরীক্ষা শুরু করেন। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র গবেষণাকেন্দ্রটিরও তো একটা খরচ আছে। পয়সা কোথায়? অগত্যা তাঁর প্রচেষ্টার স্বার্থেই এডিসনকে উপার্জনের জন্য ভাবতে হয়।

ট্রেনের যাত্রীদের কাছে খবরের কাগজ ইত্যাদি বিক্রী শুরু করেন। আশাতীত লাভ হতে একটি লোকাল ট্রেনের লাগেজ-ভ্যানের এক কোণে তাঁর কাগজ-পত্র নিয়ে আস্তানা নেন। ক্রমে বাড়ীর পরীক্ষাগারটিও ঐ গাড়ীতে গুটিয়ে আনেন। তারপর ঐ গাড়ীতে একটি ছোট্ট ছাপাখানা বসিয়ে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করেন।

চলন্ত গাড়ীতে কাগজ মুদ্রণ এই প্রথম। এডিসনের চেয়ে কম বয়সে কেউ কোনদিন সংবাদপত্রের সম্পাদক হননি। কিন্তু রাসায়নিক

পরীক্ষা করতে করতে একদিন ঐ গাড়ীতে আগুন লাগে। গার্ড ছুটে এসে তাঁর সব জিনিসপত্র সেখান থেকে বাইরে ফেলে দেয়। আর, এডিসনকে আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে দূর করে দেয়। ফলে, চিরদিনের জন্য এডিসনের কান দু'টি নষ্ট হয়ে যায়।

ক'দিন বাদে এডিসন ঐ স্টেশনের স্টেশনমাস্টারের ছোট্ট ছেলেটিকে ট্রেনের এক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচান। এর ফলে ঐ মাস্টারের সৌজন্যে এডিসন টেলিগ্রাফের কাজ শেখার সুযোগ পান। কাজ শেখবার পর টেলিগ্রাফ অফিসে সামান্য বেতনে একটি চাকরি পান।

রাত্রে দ্রুত সংবাদ আসে। বালক এডিসন আর তাল রাখতে পারে না। তখন দু'টো পুরানো মর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র কাজে লাগান। তাঁর ব্যবস্থায় প্রথমে খবরগুলি কাগজে দাগ কাটবে, তারপর সেই দাগ থেকে শব্দ বের করা হবে। এতে সাময়িক অসুবিধা দূর হলো। কিন্তু একদিন তাঁর উদ্‌ভট ব্যবস্থা ফাঁস হতে তিনি চাকুরিটি হারান। ঐ যন্ত্র দু'টি কিন্তু এডিসন হাতছাড়া করেন না।

১৮৬৯ সন। ভাগ্যের সন্ধানে এডিসন নিউইয়র্ক শহরে এসে হাজির হন। চাকরি আর জোটে না। তবুও যা-হোক করে স্থানীয় টেলিগ্রাফ অপিসের ব্যাটারী ঘরে আশ্রয় পান। তিনদিন বাদে সেখানের টেলিগ্রাফের আসল কলটি বিগড়ে যেতে এডিসন অপ্রত্যাশিত ভাবে মাত্র এক ঘণ্টার ভেতর সেটিকে ঠিক করে দেন। পুরস্কার স্বরূপ মাসিক তিনশ ডলার বেতনে তিনি ওখানে ঐদিন থেকে একটি চাকুরি পান। এডিসন স্তম্ভিত হন।

এবার এডিসন নিশ্চিন্ত মনে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এবং অল্পদিনের ভেতর নানা আবিষ্কারের জন্য অন্যূন চল্লিশ হাজার ডলার উপার্জন করেন। এবার ঐ অর্থ দিয়ে তিনি পৃথকভাবে একটি প্রথম শ্রেণীর কারখানা খুলে টেলিগ্রাফ যন্ত্র তৈরী করতে শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ।

এমন সময় টেলিফোন আবিষ্কারের খবর তাঁর কানে পৌঁছায়।

তখনও যন্ত্রটিতে অনেক ত্রুটি। সেসব দূর করে নব পর্যায়ের টেলিফোন এডিসন ব্যবহারিক জগতে চালু করেন।

তারপর তিনি একে একে সৃষ্টি করেন,—ফনোগ্রাফ, বৈদ্যুতিক বাতি, বায়োস্কোপ। মানুষের মনোরঞ্জন করতে গ্রামোফোন এবং সিনেমার চেয়ে আর কি বড় সৃষ্টি থাকতে পারে?

দীর্ঘজীবনব্যাপী তিনি অক্লান্তভাবে বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন। তিনি আশি বছরে পৌঁছুলে স্বদেশবাসী তাঁর জয়ন্তী উৎসব পালন করতে স্থির করে এডিসনকে তাদের অভিলাষ জানাতে তিনি চমকে ওঠেন। এডিসন তাঁর সাধনায় গভীর ভাবে মগ্ন ছিলেন—নিজের বয়স সম্বন্ধেও তাঁর হুঁশ ছিল না। তাঁর মতে প্রতিভার সংজ্ঞা হল,—শতকরা একভাগ অনুপ্রেরণা (inspiration) এবং বাকি নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রম (perspiration)।

মেরী কুরী (Marie Curie), ১৮৬৭-১৯৩৪

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিরী কুরির সঙ্গে যে-বছর তাঁর বিয়ে হয় সে-বছরেই একস্‌-রশ্মির আবিষ্কার হয়। পরের বছর বেকারেল ইউরেনিয়ম থেকে অনুরূপ এক তেজ আবিষ্কার করেন।

মেরী কুরী এতে আকৃষ্ট হয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন, অন্য কোন পদার্থ থেকে তেমন কোন তেজ পাওয়া যায় কি না।

তখন অধ্যাপক কুরীর উপার্জন অল্প, প্রথম কন্যাটি সবে হয়েছে। খরচ বিস্তর। মাদাম কুরীকেও উপার্জনের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে হয়। তবুও তিনি উক্ত গবেষণার সিদ্ধান্ত ছাড়েন না।

একটি স্যাঁৎসেঁতে গুদাম ঘরের এক কোণে কোন রকমে কয়েকটি যন্ত্র যোগাড় করে একটি নড়্‌বড়ে টেবিলে মাদাম কুরী কাজ শুরু করেন।

কিছুদিন পর মাদাম লক্ষ্য করেন, ইউরেনিয়ম বের করে নেবার পর যে-পিচব্লেণ্ড অকেজো বলে পরিত্যক্ত হচ্ছিল সেই অবহেলিত অংশের তেজ ঐ ইউরেনিয়মের চেয়ে অনেক বেশী। কুরী দম্পতি স্তম্ভিত।

এবার অধ্যাপক স্ত্রীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা মিলিতভাবে নতুন উদ্যমে গবেষণায় মগ্ন হলেন। কিন্তু সমস্যা হলো ঐ মূল্যবান পিচব্লেণ্ড খনিজ পদার্থ নিয়ে। তা কিনবার মতো তাঁদের সঙ্গতি ছিল না।

অল্প দিনের মধ্যে অস্ট্রিয়া-সরকারের সৌজন্যে এক টনের মতো পিচব্লেণ্ড তাঁদের হাতে এসে পৌছে। সঙ্গে সঙ্গে কুরী দম্পতি কঠিন সাধনায় মগ্ন হন।

প্রথমে তাঁরা এক নতুন পদার্থের সন্ধান পান, যা ইউরেনিয়মের চেয়ে কিছু বেশী তেজস্কর। মাদাম কুরী তাঁর স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঐ পদার্থটির নামকরণ করেন,—'পলোনিয়ম'।

কিন্তু তাঁদের গবেষণা ক্ষান্ত হয় না। বছর গড়িয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ চার বছর অক্লান্ত সাধনার ফলে ১৯০২ সনে তারা রেডিয়ম নামে এক বিস্ময়কর মৌলিক আবিষ্কার করেন, বিশুদ্ধ অবস্থায় নয়, রেডিয়ম ক্লোরাইড রূপে। এক যুগান্তকারী সৃষ্টি।

পরের বছর (১৯০৩ সনে) কুরী দম্পতি তাঁদের এই আবিষ্কারের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মহিলাদের ভেতর মাদাম কুরীই প্রথমে এই দুর্লভ পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেন।

ফরাসি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি নতুন পদ সৃষ্টি করে এঁদের দু'জনকে সম্মান দেখাতে এগিয়ে আসে। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়ে এবার তাঁরা স্বচ্ছন্দ জীবন শুরু করেন। কিন্তু গৃহ-সুখ তাঁদের বরাতে সইল না। তিন বছর বাদে একদিন রাস্তায় চলবার সময় একটি মোটর দুর্ঘটনায় অধ্যাপক কুরীর জীবন-দীপটি নিভে যায়।

মাদাম তখন নিঃসঙ্গ, স্বামীর বিয়োগে মুহ্যমান। তবুও ক'দিন বাদে তিনি একাকী গবেষণায় নিমগ্ন হন। এবারের গবেষণার ফলে

১৯১১ সনে তিনি বিশুদ্ধ পলোনিয়ম এবং রেডিয়ম বার করে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণকে স্তম্ভিত করে দেন। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যানসার, এবং টাইফাস, কলেরা, অ্যানথ্রাক্স ইত্যাদি চিকিৎসার জগতে রেডিয়মের অবদান অপরিসীম।

তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য মাদাম কুরী ১৯১১ সনে আবার রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। প্রসঙ্গত, এ পর্যন্ত কোন পুরুষ বা নারী দু'বার এ পুরস্কার পাননি।

তিনি পোলাণ্ডের ওয়ারস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় এক স্কুলের বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক। ছাত্র জীবনে মেরী স্কল্ডোয়াস্কা স্কুল থেকে ফিরে পরীক্ষাগারে তাঁর পিতাকে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে সাহায্য করতো। তখন রাশিয়ার জারের অত্যাচারে দেশের পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল না। তাই উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৮৯১ সনে একদিন কুমারী মেরী প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তাঁর নিজের কর্মশক্তি ও ধীশক্তি ছাড়া আর কোন সম্বল ছিল না। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলেন। এবং ক্রমে তিনি অধ্যাপক কুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধ্যাপক তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হন। এমনিভাবে দুই প্রতিভার মিলন হয়েছিল।

আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford), ১৮৭১-১৯৩৭

ব্রিটিশ পদার্থবিদ্ রাদারফোর্ড ছিলেন আণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবক। তিনি-ই অতিপরমাণু (Nuclear) বিজ্ঞানের জনক বলে সর্বজন-শ্রদ্ধেয়।

তিনি আবিষ্কার করেন,প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন দিয়ে অণুগুলি গঠিত। প্রোটনগুলি থাকে ধনাত্মক আধানে আহিত এবং এদের অবস্থিতি অণুর কেন্দ্রস্থলে। আর, ইলেক্ট্রনগুলি থাকে ঋণাত্মক আধানে এবং প্রোটনের চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চারিত।

আলফা রশ্মি সম্পর্কেও রাদারফোর্ড অনেক গবেষণা করেছেন। ইউরেনিয়াম থেকে শক্তিশালী বিকিরণের উদ্ভাবকও তিনি। সে-বিকিরণের তিনি নামকরণ করেছিলেন—'বিটারশ্মি'।

তাঁর আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা ছিল—থোরিয়ামের নিঃসরণ (Thorium emanation) বিষয়ের ওপর। এই গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে থোরন (Thoron) নামে নতুন গ্যাসের আবিষ্কার হয়।

রাদারফোর্ডের জন্ম হয় নিউজীল্যাণ্ডে। তাঁর ছাত্র জীবন কাটে প্রথমে নেলসন কলেজে এবং পরে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ওপর।

১৯০৯ সনে তিনি অধ্যাপক হিসেবে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এর তিন বছর বাদে তাঁর অধীনে গবেষণা করবার জন্য নীল বোর এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন।

কিছুদিন বাদে বিজ্ঞানী মোসলীর সঙ্গে রাদারফোর্ডের পরিচয় হয় এবং এঁরা দু'জনে মিলিত ভাবে গবেষণায় ব্রতী হন। এঁদের সেই গবেষণা থেকে পারমাণবিক সংখ্যার (Atomic number) উদ্‌ভব হয়। এই-সংখ্যার সঙ্গে মৌলিক পদার্থের ধর্মগুলির যোগ থাকায় উক্ত আবিষ্কারটির গুরত্বও অপরিসীম।

গুগ্লিয়েল্মো মার্কনী (Guglielmo Marconi), ১৮৭৪-১৯৩৭

টেলিফোন, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র, টেলিভিসন, মোটরগাড়ী, এয়্যারোপ্লেন এবং বেতার—বিজ্ঞানের এই সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে আধুনিক বেতার বা রেডিও নিঃসন্দেহে এক অনন্যসাধারণ বিস্ময়কর সৃষ্টি।

আজকের দিনে আবালবৃদ্ধবনিতা রেডিওর'র কথা কে না জানে? সুদূর পল্লী-অঞ্চলের নিরক্ষর চাষী ভাই-বোনেরাও রেডিওর সঙ্গে কম বেশী পরিচিত।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই আজ বেতার-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রদীপ্ত ঘোষণা। এই আশ্চর্য আবিষ্কার কিন্তু ঠিক কারুর একক প্রচেষ্টার কৃতিত্ব নয়। এর পেছনে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নীরব সাধনা।

বেতার সৃষ্টির ইতিহাসে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-'৭৯) এবং হাইনরিক রুডলফ হার্ৎস (১৮৫৭-'৭৪)-এর কিছুটা অবদান থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বা আধুনিক বেতার সৃষ্টির কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনী'র।

তাঁর এই অবদানের জন্য মার্কনী ১৯০৯ সনে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। সেই বছর-ই তিনি ইতালির সিনেটর হিসাবে মনোনীত হন। তারপর ১৯২৯ সনে মার্কুইস-এর গৌরবও মার্কনী অর্জন করেন।

ধনীর তনয় মার্কনী পিতার ইচ্ছায় ঘরে বসেই লেখাপড়া শেখেন। তবে বালক বয়স থেকেই পদার্থ-বিদ্যা বিশেষ করে বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের প্রতি মার্কনী অনুরক্ত হন। তাঁর পূর্বসূরী ম্যাক্সওয়েলের ন্যায় জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস-ও সিদ্ধান্তে পৌঁছান,—লাইট ওয়েভস ও ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভস একই ব্যাপার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের সিদ্ধান্ত গবেষণাগারেই সীমিত থাকে। হার্ৎসও তাঁর আবিষ্কার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী করেন না।

হার্ৎস-এর গবেষণা যখন প্রকাশিত হয় মার্কনী তখন পনেরো বছরের কিশোর। তিনি ঐ সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সে বিষয়ে গবেষণায় ডুবে যান।

১৮৯৫-৯৬ সনে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মার্কনীই প্রথম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস দ্বারা শূন্যের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ ইথারে ঢেউ সৃষ্টি করে এক মাইল দূরত্বের ব্যবধানে সংকেত পাঠাতে সক্ষম হন ; ক্রমে দু'মাইল দূরে।

পরের বছর মার্কনী লণ্ডনে তাঁর নব আবিষ্কৃত বেতারের পেটেন্ট

নেন। এবং ১৮৯৭ সনে তিনি ইতালি সরকারের জন্যে স্পীজিয়াতে বেতারে সংকেত পাঠাবার একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন।

অল্পদিন পরে ইংলণ্ডেও মার্কনী অনুরূপ একটি বেতার টেলিগ্রাফ কোম্পানি নামে একটি সংস্থা চালু করেন। এই কেন্দ্র থেকে ইংলিশ চ্যানেলের এপার থেকে ওপারে সুষ্ঠুভাবে সংকেত পাঠানো হত।

তাঁর এই অবদানের কল্যাণেই প্রথম সামুদ্রিক যানবাহনের উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠানো সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে এই আবিষ্কার দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের কাজেও প্রসারিত হয়।

মার্কনী একে আরও উন্নত করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন। সেই সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯০১ সনে ক্রেমওয়েল থেকে দীর্ঘপথ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্যন্ত তিনি বেতারে সংকেত পাঠাতে কৃতকার্য হন। দু'বছর বাদে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমেরিকাতে তিনি একটি বেতার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

১৯১২ সনে মার্কনী তাঁর আবিষ্কার পরিমার্জিত করেন। ফলে, এবার বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে বহুদূর প্রান্ত পর্যন্ত নিখুঁতভাবে শব্দতরঙ্গ পাঠাতেও সক্ষম হন। আধুনিক 'বিম্' সংকেতটিও মার্কনীর সৃষ্টি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইতালি সরকার মার্কনীকে বেতারের সর্বময় কর্তার আসনে মনোনীত করেন।

পরবর্তীকালে মার্কনীর এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই বর্তমান বেতারের সৃষ্টি হয়।

আলবার্ট আইনস্টাইন, ১৮৭৯-১৯৫৫

পদার্থ অবিনশ্বর আর শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। —বৈজ্ঞানিকগণ এই দুই সিদ্ধান্ত অনেকদিন ধরে মেনে আসছিলেন। এর কোন ব্যতিক্রমও কেউ লক্ষ্য করেননি।

১৯০৫ সনে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন জানালেন,

পদার্থ ও শক্তি এক অন্যের রূপান্তরিত অবস্থা। তিনি অঙ্ক কষে দেখালেন, এক গ্রাম পদার্থ রূপান্তরে কি প্রচণ্ড শক্তি হতে পারে। তাঁর উক্তি শুনে বৈজ্ঞানিকগণ স্তম্ভিত হন।

তারপর ১৯৩২ সনে আইনস্টাইনের ঐ সিদ্ধান্ত কক্‌ক্রফ্‌ট এবং ওয়ালটনের এক পরীক্ষায় বাস্তব জগতে প্রমাণিত হয়। ক্রমে তাঁর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অ্যাটম বোমাও তৈরী হয়।

আইনস্টাইনের শ্রেষ্ঠ অবদান—'আপেক্ষিকতাবাদ'। তত্ত্বটি জটিল আঁকজোখের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। প্রথম প্রচারিত হতে সারা দুনিয়ার মাত্র ছ'জন নাকি উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর সত্যেন বোস তাঁদের মধ্যে একজন।

এক ফুট লম্বা একটি জিনিসকে সকলে এক ফুট নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত মতে, এরোপ্লেনে উড়ে যেতে যেতে ঐ জিনিসটিকে যদি দেখা সম্ভব হয়, তবে সেটি লম্বায় এক ফুটের চেয়ে ছোট বলেই মনে হবে। আর প্লেনের বেগ যদি আলোর বেগের সমান হয় (আলোর বেগের বেশি কোন বেগ হতে পারে না) তবে জিনিসটি শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

এই বৈজ্ঞানিক আরও নতুন কথা শোনালেন, আকাশ সমাকার নয়, বক্রাকার। অর্থাৎ, আকাশে কোন সরল রেখাকে আর ইউক্লিডের সরল রেখার সংজ্ঞার্থ দিলে চলবে না। তাঁর কথায় এই দাঁড়ায়,—দেশের সঙ্গে কাল জড়িত। তাঁর মতে, আলোর রশ্মিও মহাকর্ষের হাত এড়াতে পারে না। পৃথিবীর পাশ দিয়ে যে রশ্মিটা যায় পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করে। তবে সেই আকর্ষণটা খুব ক্ষীণ, পরীক্ষায় ধরা পড়ে না।

আইনস্টাইনের উত্তরকালের আর একটি সিদ্ধান্তে প্রকৃতির নানা অদ্ভুত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে তথ্যের নিগূঢ় কথা হচ্ছে,—নক্ষত্র, গ্রহ, আলোক, বিদ্যুৎ এবং অ্যাটম সব ক্ষেত্রে একই নিয়মে কাজ হয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের দাস।

জাতিতে ইহুদী ছিলেন বলে ব্যক্তিগত জীবনে আইনস্টাইনকে বহু অসুবিধা ও অনাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তবুও তিনি ন্যায়ের পক্ষে নিজের মত মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা করেননি।

যে-দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দীর্ঘ কাল যে দেশের সেবা করেছিলেন, উৎকট জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের জন্য তাঁকে সেই স্বদেশ ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় পথচারী হতে হয়েছিল।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ হয়েও তিনি শুধু বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন না, জাতিবৈষম্য, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্ম ইত্যাদি বহু জটিল বিষয়ে তিনি বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রও তাঁর মনকে নাড়া দিত। বেহালা বাদনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারের সঙ্গে আইনস্টাইনের নামটি কিছুটা জড়িত থাকলেও মূলতঃ তিনি ছিলেন অহিংসাবাদী। তাইতো আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদর্শ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯২১ সনে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সে-অর্থ তিনি জনসেবায় দান করেন।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming), ১৮৮১—

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পেনিসিলিন আজ একটি বিশেষ সুপরিচিত নাম। একে বাদ দিয়ে ডাক্তারগণ চিকিৎসার কথা ভাবতে পারেন কিনা সন্দেহ। এ যেন হলুদের গুঁড়ো। নিঃসন্দেহে এটি আবিষ্কার করে ফ্লেমিং চিকিৎসা জগতে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করেছেন।

১৯২৮ সন। ডাঃ ফ্লেমিং তখন লণ্ডনে সেণ্টমেরি হাসপাতালে গবেষণায় নিযুক্ত। একদিন একটি কাচের পাত্রে আগার নামে কিছু জেলি রেখে ফ্লেমিং একজন লোকের ক্ষত স্থান থেকে কিছুটা পুঁজ নিয়ে সেই জেলির ওপর ছড়িয়ে দেন।

পুঁজের মধ্যে একরকম বিশেষ জীবাণু থাকে, আর এই জেলি হল ঐ জীবাণুদের সুখাদ্য। জেলির ওপর পড়ে মুহূর্তের মধ্যে তারা বেড়ে যায়। ফ্লেমিং লক্ষ্য করেন, স্থানে স্থানে ঐ জীবাণুরা দলবদ্ধ হচ্ছে।

হঠাৎ ফ্লেমিং-এর নজর পড়ে, একদিকে একটা যেন নীলাভ ছাতা। ক্রমে তিনি লক্ষ্য করেন, ঐ ছত্রাকের চারদিকের জীবাণুরা যেন অতটা সতেজ নয়। বরং তারা যেন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে।

এবার ফ্লেমিং-এর মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি ঐ ছত্রাক জীবাণুকে ধ্বংস করছে। তাই যদি হয় তবে এটা মানুষের দেহে কি সম্ভব নয়?

অনেক অনুসন্ধানের পর ফ্লেমিং জানতে পারেন, মানবদেহেও ঐ প্রতিক্রিয়া সম্ভব। এবার অন্য জীবাণুর মাধ্যমে তিনি পরীক্ষা শুরু করেন।

পরীক্ষা করে ফ্লেমিং জানালেন, ছত্রাক সরাসরি জীবাণুকে মারে না। এটি জীবাণুদের বৃদ্ধিটা বন্ধ করে। আসলে শ্বেতকণিকারা এদের ধ্বংস করে। আর, ঐ ছত্রাক বন্ধুভাবে শ্বেতকণিকাদের সাহায্য করে।

এবার ছত্রাক থেকে ঐ অদৃশ্য মিত্রদের উদ্ধারের চেষ্টা চলে। রসায়নবিদ্‌রাও ফ্লেমিং-কে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। অনেক চেষ্টার পর ফ্লেমিং কৃতকার্য হন। পেনিসিলিয়ম নোটেটম জাতীয় ছত্রাক থেকে ফ্লেমিং তাঁর ঈপ্সিত বস্তুটি আবিষ্কার করেন। তিনি এটির নাম দেন—পেনিসিলিন।

১৯২৮ সনে লণ্ডনের সেণ্ট মেরি হাসপাতালেই এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি সেদিন হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে এর ব্যবহার বেশ কিছুদিন চাপা ছিল। হয়তো বা সমপর্যায়ের কোন ওষুধের প্রভাবে।

তারপর গত বিশ্বযুদ্ধের তাগিদে পেনসিলিন সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ সচেতন হন। যুদ্ধে এর অবদান ছিল অপরিসীম। সেই থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পেনিসিলিনের ভূমিকা অম্লান হয়ে আছে। আজ এর গুরুত্ব একটি বালকেরও আর অজানা নেই।

নীল বোর (Neils Bohr), ১৮৮৫-১৯৬০

বর্তমানকালের তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে নীল বোর স্বীকৃত।

১৯১১ সনে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। রাদারফোর্ড তখন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং গবেষণায় মগ্ন। পরের বছর বোর রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণায় ব্রতী হন।

তিনি গুরুর পারমাণবিক গঠন এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় করেন। আলফা-রশ্মির বিচ্ছুরণ (scattering) সম্পর্কে গবেষণা করে বোর যে সিদ্ধান্তে পেঁছিন, তা থেকে পারমাণবিক গঠনের তিনি এক অভূতপূর্ব অতিপারমাণবিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন।

তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে বোর পারমাণবিক হাইড্রোজেনের বর্ণালীর (Spectrum of atomic hydrogen) সমস্ত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক গণনা করতে সক্ষম হন। পরীক্ষালব্ধ কম্পাঙ্কের যে মান পাওয়া যায়, গণনাকৃত মানের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই।

তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য নীল বোর ১৯২২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন.

প্রসঙ্গত অতিপরমাণুর ঘটনা সংক্রান্ত 'লিকুইড ড্রপলেট' মডেলেরও বোর ভিত্তি রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর উক্ত মডেলের সাহায্যেই পরমাণুর ভেতরের স্বরূপ অনুধাবনের প্রচেষ্টায় সহায়ক হয়। একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন দিয়ে সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু গঠিত। এ সম্বন্ধে তার চেয়ে আর বেশী কিছু জানা যায়নি। বোরের উক্ত মডেলের কল্যাণে জানা যায়—এ ইলেকট্রন প্রোটনের চতুর্দিকে অবিরত প্রদক্ষিণ করে, যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে গ্রহ। আর, ইলেকট্রনকে তার কক্ষপথে রাখে প্রোটনের তড়িতের আকর্ষণ। যতক্ষণ ইলেট্রন নির্দিষ্ট কক্ষে থাকে, ততক্ষণ পরমাণু কোন তেজ গ্রহণ বা বর্জন করে না।

বিশদভাবে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার উদ্দেশ্য নীল বোর আলবার্ট

আইনস্টাইনের সঙ্গে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডিতে মিলিত হয়েছিলেন।

স্যার জন ডগলাস কক্‌ক্রফ্‌ট (Sir G.D. Cockcroft)

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, পরমাণুকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করতে পারলে তা থেকে বিপুল শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব অর্থাৎ ঐ পদার্থ থেকে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের অদৃশ্য বন্ধন কি ভাবে ছিন্ন করা যায়? এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ব্যর্থ গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এমন সময় ১৯৩২ সনে বিজ্ঞানী-মহলকে চমকিত করে পরমাণুকে ভেঙ্গে চৌচির করার সংবাদ প্রচারিত হয়। এ কৃতিত্বের গৌরব ছিল তরুণ ইংরেজ বিজ্ঞানী ডঃ কক্‌ক্রফ্‌ট এবং তাঁর সহকর্মী-বন্ধু ডঃ ওয়ালটন-এর।

তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে এক অভূতপূর্ব বিবর্তনের সৃষ্টি হয়। এবার ক্রমে ক্রমে আসে আণবিক চুল্লী ও বিদ্যুৎ এবং অসংখ্য কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ। মানবজাতির কল্যাণ সাধনে এসবের প্রয়োজন অপরিসীম। অবশ্য এই আবিষ্কার থেকে আণবিক বোমারও সৃষ্টি হয়েছিল।

পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কক্‌ক্রফ্‌টের এই বিস্ময়কর অবদানের জন্য ১৯৫১ সনে তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। এ ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশ থেকেও অজস্র সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন।

ব্রিটেনের হারওয়েল পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রের অধ্যক্ষের পদ ছাড়াও কক্‌ক্রফ্‌ট জীবনে বহু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন, স্বদেশের গণ্ডির বাইরেও। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনে পরমাণু শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য বলে স্বীকৃত।

১৯৪৮ সনে নাইট, ১৯৫৩ সনে K. C. B. এবং চার বছর পরে Order of Merit উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। এ হচ্ছে স্বদেশ থেকে

পাওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক'টি সম্মান। অন্যান্য দেশ থেকেও তিনি বহু সম্মান পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষও পিছিয়ে ছিল না। ১৯৫১ সনে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৯৫৫ সনে তাঁকে Tata Institute of Fundamental Research-এর একজন সম্মানিত সদস্য বলে নির্বাচন করে ভারতবর্ষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল।

ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি লাভ করে কিছুদিনের জন্য রাদারফোর্ডের অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল তরুণ কক্‌ক্রফটের।

আর্নেষ্ট লরেন্স (Ernest Lawrence), ১৯০১-৫৪

সাইক্লোট্রন (Cyclotron)। অতিপরমাণবিক বস্তুকণাকে দ্রুতগতিবেগসম্পন্ন করবার জন্য সাইক্লোট্রন যন্ত্রটির একান্ত প্রয়োজন। এটির স্রষ্টা হলেন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ আর্নেস্ট লরেন্স।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় উক্ত যন্ত্রটির সাহায্যে লরেন্স ইউরেনিয়ামের আইসোটপগুলি পৃথক করে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। তারপর ১৯৪৬ সনে তিনি 'সিনক্রো-সাইক্লোট্রন' (Synchro-Cyclotron) তৈরী করে কৃত্রিম 'মেসন' (Meson) আবিষ্কার করেন।

তাঁর এই বিস্ময়কর 'সাইক্লোট্রন' আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৩৯ সনে পদার্থবিজ্ঞানে লরেন্স নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯২৫ সনে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লরেন্স পি-এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। এর তিন বছর পরে তিনি কালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সহ-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে ১৯৩৬ সনে তিনি সেখানের অধিকর্তার আসন অলংকৃত করেন।

শুধু অতি-পারমাণবিক বিদ্যায়-ই নয়, জীবতত্ত্ব এবং ভেষজ পদার্থবিজ্ঞানেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না।

প্রাচীন ভারতের অগ্রগতি

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি : এক সময় বিজ্ঞান চর্চায় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আমাদের এই ভারতবর্ষ ছিল জগতে অগ্রদূত।

প্রস্তরযুগ তখনও শেষ হয়নি, তাম্রযুগ সবে শুরু হয়েছে—সে সময় পাশ্চাত্য দেশগুলি অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ সময় সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধুনদীর উপত্যকায় মহেঞ্জোদড়ো এবং হরাপ্পা আবিষ্কার আমাদের সভ্যতার ইতিহাসকে খ্রীষ্টপূর্ব অন্যূন তিন হাজার অব্দে পৌঁছে দিয়েছে। সে সময়কার প্রচলিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিদর্শন আজ প্রশ্নাতীত।

ক্রমে এদেশে আর্যসভ্যতা আসে। তাও খ্রীষ্টজন্মের দেড় হাজার বছর পূর্বে। এ সময়কার জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, এমনকি চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতিতে চমৎকৃত হতে হয়—

পদার্থবিদ্যা : খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ শ' বছর পূর্বে কণাদ পরমাণুবাদের (অ্যাটম) কথা শোনান। পদার্থবিদ্যার আরও অনেক বিষয় তিনি আবিষ্কার করেন। তাঁর থেকে লোকে জানল, আলো এবং তাপ শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র, শব্দ তরঙ্গ দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদ : এ বিষয় উল্লেখযোগ্য দু'টি গ্রন্থ—চরক ও সুশ্রুত। জানা যায়, চরক ছিলেন গৌতম বুদ্ধেরও আগেকার মনীষী। এরপর আসে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্র—বাগ্‌ভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়। ক্রমে ধাতব ওষুধের ব্যবহার বিস্তার লাভ করে।

নানারকম অস্ত্রের যে-সব বর্ণনা সুশ্রুতের শল্যবিদ্যায় পাওয়া যায় তার সঙ্গে আধুনিক সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্টের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির উৎসও আমাদের ভারতবর্ষ।

রসায়নবিদ্যা : নাগার্জুন ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্। আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর খ্যাতির কথা জানা যায়। তাঁকে রসায়নবিদ্যার জনক বলা যেতে পারে।

গণিতবিদ্যা ঃ গণিতে শূন্য (zero)-র ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় গণিতের একটি বিশেষ অবদান। সম্প্রতি প্রচলিত দশমিক পদ্ধতি বিদেশের অনুকরণে চালু হয়নি। এটা এদেশেই এক সময় সৃষ্টি হয়েছিল, হালে পুনঃ প্রচলিত হয়েছে মাত্র। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দু' শত বছর পূর্বে এদেশে গণিতে শূন্য ব্যবহৃত হত। সুতরাং সারা বিশ্বে প্রচলিত দশমিক পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ অবদান।

সূর্যসিদ্ধান্তে গ্রহের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় নির্ধারণ পদ্ধতিও উক্ত পুস্তকে বিধৃত আছে। তারপর আর্যভট্ট (৪৭৬ খৃঃ) জ্যোতিষ বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই প্রথমে ঘোষণা করেন—সূর্য স্থির হয়ে থাকে এবং গ্রহ উপগ্রহ তাকে কেন্দ্র করে বেগে ঘোরে। আর্যভট্টের পর একে একে আসেন বরাহমিহির (৫০৫ খৃঃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮) এবং ভাস্করাচার্য মনীষিগণ। এঁদের অবদানও কম নয়।

জ্যামিতি-র উৎপত্তিও হয়েছিল এদেশে, বৈদিক যুগে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ঃ পাশ্চাত্য দেশে এবিদ্যার পরীক্ষা শুরু হয় মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু এদেশে তার বিশেষ চর্চার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্ট জন্মের অনেক আগে থেকে। কি করে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের সেই প্রোজ্জ্বল আলো ক্রমে ম্লান হয়ে নিভে গেলো বলা মুস্কিল। নিঃসন্দেহে তা জাতির দুর্ভাগ্য। তবে আশার কথা, গত শতাব্দীর শেষে এদেশে ক'জন মনীষীর আবির্ভাবে শতাব্দীর ঘন অন্ধকারের ভেতর যেন উষার আলো ফুটে উঠেছে।

সেই অরুণ আলো যাঁরা দেখালেন ঃ

জগদীশচন্দ্র বসু (J. C. Bose), ১৮৫৮-১৯৩৭

১৮৯৪ সনে জগদীশচন্দ্র বিনা তারে তড়িৎ তরঙ্গ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে বিশ্ববাসীকে

চমৎকৃত করেন। এ ঘটনাকে বেতারের আদিরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এঁর অন্য আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার—স্থানীয় কারিগরদের তৈরী সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে জড়, জীব ও উদ্ভিদের একই ধরনের সাড়ার পরিচয়। তাঁর এই আবিষ্কার থেকে জড়, জীব ও উদ্ভিদ্ রাজ্যে এক বৃহত্তর নিয়মের ইঙ্গিত জানা যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (P. C. Roy), ১৮৬১-১৯৪৪

আধুনিক ভারতের রসায়ন-বিদ্যার জনক। এদেশে রসায়নশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর গবেষণার পথিকৃতের গৌরবও প্রফুল্লচন্দ্রের।

কয়েকটি নতুন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করার কৃতিত্ব রসায়নবিদরা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। মারকিউরাস নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। রসায়ন শিল্পের প্রসারে তাঁর অবদান ভুলবার নয়। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস' প্রফুল্লচন্দ্রের সে-প্রচেষ্টার কথা আজও সগৌরবে ঘোষণা করছে।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ (C. V. Raman), ১৮৮৮—

১৯২৮ সনে তাঁর আবিষ্কৃত আলোক-বিকিরণ (বিশ্ববিখ্যাত 'রমণ-বিকিরণ') ক্রিয়া আধুনিক বিজ্ঞান জগতে এক বিস্ময়কর অবদান। এঁর এই অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৩০ সনে রমণ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধি তিনি লাভ করেন ১৯৫৪ সনে। 'জাতীয় অধ্যাপক'-এর আসনও তিনি অলংকৃত করেছেন।

মেঘনাদ সাহা (Meghnad Saha), ১৮৯৩-১৯৫৬

তাঁর 'আয়নন সূত্র' বিশ্ববিশ্রুত। এই সূত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের

বর্ণালী রেখা থেকে নক্ষত্রের ভেতরের উষ্ণতা ও চাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। জ্যোতিষ্পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এ তাঁর এক বিশেষ অবদান। সৌর কলঙ্ক সম্বন্ধেও তাঁর তত্ত্ব অভিনব। স্বদেশের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা এবং জাতীয় পঞ্জিকা সংস্কারেও সাহার অবদানের মূল্য অপরিসীম। 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (Prof. S. N. Bose), ১৮৯৪—

তাঁর আলোক-কণার সংখ্যায়নিক সূত্রটি মৌলিক। সূত্রটি সংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যায় এক নবযুগের সৃষ্টি করেছে, এর ব্যাপক প্রয়োগ দেখান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, উত্তরকালে যা 'বসু-আইনস্টাইন সূত্র' নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়। আপেক্ষিক তত্ত্বেও তাঁর অবদানের মূল্য কম নয়।

এঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় ১৯৪৮ সনে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (J. C. Ghosh), ১৮৯৪-১৯৫৯

ইলেকট্রোলাইটকে জলে দ্রব করলে দ্রবণ সাধারণ দ্রবণের নিয়ম মেনে চলে না—এটাই ছিল বিজ্ঞানীদের চলতি ধারণা। এই নিয়মের ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা প্রথমে শোনান ডঃ ঘোষ। তাঁর এই ব্যাখ্যা 'ঘোষের তত্ত্ব' নামে বিখ্যাত।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং নানা গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানে স্বদেশবাসী বিশেষ উপকৃত।

কে. এস. কৃষ্ণন (K. S. Krishnan), ১৮৯৮-১৯৬০

কেলাসের চুম্বক-প্রবণতা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যের সন্ধানী এবং চুম্বকধর্মের তারতম্য মাপবার সূক্ষ্ম অথচ সহজ যন্ত্র নির্মাণের কৃতী

বিজ্ঞানী। 'রমণ-বিকিরণ' আবিষ্কারে ডঃ রমণের সহকর্মী হিসাবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ভুলবার নয়।

১৯৫৮ সনে ইনি জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (Dr. H. J. Bhaba)

নবীন ভারতের বিজ্ঞান চেতনার প্রতীক। ভারতের পারমাণবিক যজ্ঞের উদ্‌গাতা। পরমাণু বিজ্ঞানে ইলেকট্রনের বিক্ষেপণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় অবদান ভাবা-স্ক্যাটারিং নামে বিশ্ববিখ্যাত। মহাজাগতিক রশ্মির বিশ্লেষণে তাঁর বিশেষ অবদান ডঃ ভাবাকে আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দেয়।

ট্রম্বের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রটি তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় —যেখানে তৈরী হচ্ছে রেডিও-আইসোটোপ। শুধু তাই নয়, আধুনিক ভারতের পরমাণু শক্তি সংস্থার ইউরেনিয়ম ফ্যাক্টরী, রেয়ার আর্থ কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী, ট্রম্বের অ্যাটমিক এনার্জী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ডঃ ভাবার অসামান্য প্রতিভা, দূরদৃষ্টি এবং উদ্যমের সাক্ষ্য ঘোষণা করছে। মহাকাশ গবেষণার জন্য থুম্বায় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত রকেট স্টেশনটির পরিকল্পনাও তাঁর।

১৯৫৫ সনে শান্তির কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহারের জন্য জেনিভায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান সভাপতির আসনটি অলংকৃত করেছিলেন ডঃ ভাবা।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হবার দুর্লভ গৌরব লাভ করাও বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্রীড়াঙ্গন

অলিম্পিক

খেলার জগতে প্রবেশ করতে স্বভাবতঃ গোড়াতেই অলিম্পিকের কথা মনে জাগে।

আজকের দিনে পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ অপেশাদার খেলোয়াড় অলিম্পিকে যোগদান করবার সুযোগ পেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। এবং সেখানে অংশ গ্রহণ করতে পারলে নিঃসন্দেহে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। আর, বিজয়ী হলে তো কথাই নাই—তাঁর সাফল্যে খেলোয়াড়ের স্বদেশের গৌরবও বেড়ে যায়।

শুধু আধুনিক কালেই নয়, প্রাচীন কালেও পৃথিবীর নানা জায়গায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে অলিম্পিকই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে এর ইতিহাস বড় বিচিত্র।

ঠিক কবে থেকে অলিম্পিক শুরু হয়েছিল, আজও তা পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়বস্তু।

কোন কোন গবেষকের মতে, সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ১৪৫৩-তে অথবা সমসাময়িক কালে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল; এর প্রবর্তন করেছিলেন স্বয়ং হারকিউলিস, দেবরাজ জিউসের তুষ্টির জন্য।

তবে খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬ হতে অনুষ্ঠানটির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ অ্যারিস্টটল হীরা দেবীর মন্দিরে ব্রোঞ্জের একটি 'কোয়েট' দেখেছিলেন। যাতে ঐ প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা হিসেবে স্পার্টার লাইকারগাস এবং এলিস অধিপতি ইফিটাসের নাম এবং প্রতিযোগিতার নিয়মাবলীর স্বাক্ষর ছিল।

সে সময় গ্রীস মহাদেশটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ফলে,

ঐ সব খণ্ড রাজ্যের মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো। কোন রাজ্যেই শান্তি শৃঙ্খলা ছিল না।

তারপর এক সময় শান্তি, প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পার্টা এবং এলিস-এর দুই রাজা খৃঃ পূঃ ৭৭৬-য়ে 'অলিম্পিক ক্রীড়া'র প্রবর্তন করেন। গ্রীসের ইতিহাসও উক্ত তারিখ থেকেই আরম্ভ হয়।

চার বছর অন্তর এ প্রতিযোগিতা প্রচলিত হয় এবং এই চার বছরের ব্যবধান কাল 'অলিম্পিয়াড' নামে খ্যাত।

গ্রীসের দক্ষিণ দিকে, এথেন্স শহরের ১২৫ মাইল অদূরে একটি সুন্দর বিস্তৃত সমতলভূমি ছিল। অলিম্পিয়া। ঐ স্থানেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। এবং ঐ জায়গাটির নাম থেকেই 'অলিম্পিয়া' কথাটার উৎপত্তি।

মজার কথা, গোড়াতে কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানে খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল না।—অলিম্পিয়াড বা ঐ চার বছরের মধ্যে যে-সব উল্লেখযোগ্য গ্রীক মারা যেতেন তাঁদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হতো—সংগীত, আবৃত্তি, ভোজ, সেই সঙ্গে কখনও বা সামান্য এবং সাধারণ খেলাধুলা।

বলা বাহুল্য, গ্রীকগণ প্রথম থেকেই অনুষ্ঠানটিকে ধর্মীয় ভাবে গ্রহণ করেছিল। দেবরাজ জিউসের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে, মন্দির থেকে আগুন জ্বালিয়ে সেই পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের শপথ নিয়ে প্রতিযোগী এবং বিচারকগণ খেলার মাঠে নামতেন।

ক্রীড়ানুষ্ঠানটি হতো পাঁচ দিন ব্যাপী। প্রথম দিনে শপথ গ্রহণ, দেবতার সম্মানে কুচকাওয়াজ এবং উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হতো। দ্বিতীয় দিনে কর্মসূচী অনুযায়ী প্রথমে হতো—রথ চালনা। তারপর পেন্টাথলন অর্থাৎ দৌড়, লং জাম্প, মুষ্টিযুদ্ধ, বর্শা ছোঁড়া এবং কুস্তি—এই পাঁচটি 'এথেলোর' প্রতিযোগিতা হতো। তখনকার রীতি অনুযায়ী অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৭২০ থেকে ক্রীড়াবিদ্‌দের উলঙ্গ অবস্থায় প্রতিযোগিতায় নামতে হতো।

উক্ত খেলায় যে-খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট পেতো, সে-ই বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতো। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ীদের মাথায় ক্যালিস্টোফানোস (অলিভ গাছের পাতার তৈরী মুকুট) পরিয়ে দেওয়া হতো। তখনকার দিনে ঐ মুকুট-ই ছিল ক্রীড়াবিদ্‌দের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

বিজয়ী খেলোয়াড়গণ স্বদেশে ফিরে রাজকীয় মর্যাদা পেতেন। জীবিকার জন্য তাঁদের ভাবতে হতো না। এঁদের আজীবন ভরণ-পোষণের ভার নিতো সে রাজ্যের ব্যবসায়িগণ।

হাঁ, নারীদের কিন্তু এ মজার প্রতিযোগিতা দেখবার অধিকার ছিল না। কোন নারী দেখতে গিয়ে ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতো।

তবে দেবরাণী হেরা'র সম্মানে প্রতি চার বছর অন্তর মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। 'হেরেরা'। এই অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি মহিলারাই পরিচালনা করতেন।

তবুও কিন্তু অলিম্পিকের অনুষ্ঠান দেখবার নারীদের উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল অদম্য। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে কেউ কেউ চুপি চুপি পুরুষদের প্রতিযোগিতা দেখার চেষ্টা করতো। তারপর এক সময় প্রখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা পিসিডোরাস-এর মাতা শ্রীমতী ফেরোনিস-এর প্রচেষ্টায় নারীগণ দর্শক এবং প্রতিযোগী হিসেবে অলিম্পিকে যোগদানের অধিকার লাভ করে।

ক্রমে রোমানরা সমগ্র গ্রীস দেশ অধিকার করে। তবুও কিন্তু অলিম্পিকের খেলা বন্ধ হয় না। নিয়মিত চলতে থাকে। এবং পর পর কয়েকটি অনুষ্ঠান তখনও গ্রীকদের ভেতরে সীমিত থেকেও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

ধীরে ধীরে রোমানরা এতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু বিজিতদের নিয়ম-শৃঙ্খলা তারা মানতে রাজী নয়। তারা নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করে ; প্রকাশ্যে রীতিবিরুদ্ধ ভাবে পেশাদার রোমান ক্রীড়া-বিদ্‌গণ এক রকম জোর করেই অংশ গ্রহণ করে। গ্রীকগণ সরব আপত্তি তোলে। কোন ফল হয় না। উল্টে রোমান শাসনকর্তাগণ

ক্ষমতার জোরে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে, একসময় গ্রীকগণের চাপা অসন্তোষ ফেটে পড়ে—দুই অ্যাথলেট দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হতে দেরী হয় না। রোমানগণ অলিম্পিয়ার ঐ বিরাট এবং সুন্দর স্টেডিয়ামটি নষ্ট করতেও দ্বিধা করে না।

অবস্থা চরমে পৌঁছুতে তখনকার রোম সম্রাট প্রথম থিয়োডোরাস আইন করে অলিম্পিকের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। সময়টা ছিল ৩৯৪ খৃষ্টাব্দ।

এই ঘটনার ক'বছর পরে প্রবল বন্যায় সমগ্র অলিম্পিয়া উপত্যকাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সুখের কথা, জার্মান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর দীর্ঘ সাত বছরের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ১৮৮১ সনে সেই ঐতিহ্যময় লুপ্ত অলিম্পিক-প্রান্তরের অনেকটা অংশ মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হয়েছে।

... ...

ফ্রান্সের ব্যারণ পিয়ারি দ্য কুবার্তিন-এর উদ্যোগে এবং কয়েকটি দেশের সহযোগিতায় আধুনিককালের অলিম্পিকের অনুষ্ঠান চালু হয় ১৮৯৬ সনে।

আগেকার মতো আধুনিক অনুষ্ঠান কোন বিশেষ কেন্দ্র বা জাতির মধ্যে আর সীমিত থাকে না। এবার এটি হয়, একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং ক্রমে ক্রমে আধুনিককালের নানা খেলা অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নির্দেশানুসারে এক একবার এক এক দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে-ই প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক অনুষ্ঠানটি এখনও হয়ে থাকে। তবে কোন কারণে যদি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান না হতে পারে—গুণতির দিক থেকে অলিম্পিক কিন্তু বন্ধ হয় না। যেমন, ১৯৫২ সনে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক আসলে দ্বাদশ নম্বর হলেও সেটিকে পঞ্চদশ অলিম্পিক-ই বলা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গতঃ আধুনিককালের প্রথম অলিম্পিক হয়েছিল ১৮৯৬ সনে এবং গ্রীসদেশের এথেন্স নগরীতে। এতে বারোটি বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন । বিভিন্ন এ্যাথলেটিকস প্রতি-যোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটবৃটেন যথাক্রমে ন'টি এবং দু'টিতে বিজয়ী হয়। আর, ম্যারাথন দৌড়ে গ্রীস দেশের একটি মেষপালক বিজয়ীর গৌরব লাভ করেন।

এ প্রসঙ্গে মেক্সিকো শহরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ১২—২৭ অক্টোবর, উনিশতম অনুষ্ঠানটির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে—

মেক্সিকোর ক্রীড়াঙ্গনে মোট ১১৯টি দেশ যোগ দিয়েছিল এবং সবসুদ্ধ সাড়ে সাত হাজার প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে উনিশটি খেলার কর্মসূচী ছিল।

স্টেডিয়ামের অনলাধারে পূতাগ্নি প্রজ্বলন করেছিলেন একজন মহিলা অ্যাথলেট—এনরিকোয়েটা ব্যাসিলি, হার্ডলস রেসের প্রতি-যোগিনী। অলিম্পিকের ইতিহাসে এটা অভিনব।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আকাশের বুকে হেলিয়াম গ্যাসের বিরাটকায় রঙ্গ-বেরঙ্গের অলিম্পিকের প্রতীক 'পঞ্চবলয়' (পাঁচ মহাদেশের মিলনগ্রন্থি) এঁকে দিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন হয়।

এই উনিশতম অলিম্পিক অনুষ্ঠানে আমেরিকা ৪৫টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য ও ৩৪টি ব্রোঞ্জ মোট ১০৬ পদক পেয়ে মেডেলের তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে। ১৯৫২ সন থেকে মেডেল তালিকায় রাশিয়ার প্রাধান্য ছিল—এবার সেই প্রাধান্য আমেরিকা নষ্ট করে দিয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে এশিয়ার গৌরব জাপান। পদক-এর তালিকায় জাপানের স্থান তৃতীয়। জাপান ১১টি স্বর্ণ পদক ৭টি করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

১৯২০ সনে ভারতবর্ষ প্রথম অলিম্পিকে যোগদান করে। সেবার

অনুষ্ঠানটি হয়েছিল এণ্টোয়ার্প-য়ে। চার জন অংশগ্রহণকারী এ্যাথলেটের ভেতর ছিলেন—

৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়—পি. সি. ব্যানার্জী

ম্যারাথন দৌড়—চোগল এবং দাতার

অন্যান্য দৌড়—কাইকাদী

খেলা ও খেলোয়াড়

ফুটবল

পৃথিবীতে ফুটবল খেলা প্রথম কোন্ দেশে আরম্ভ হয়েছিল তা আজও গবেষণার বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে নানা কিংবদন্তী শোনা যায়—

একদল ঐতিহাসিকের মতে, প্রথমে রোম দেশেই এ খেলা শুরু হয়েছিল। প্রাচীনকালে যুদ্ধের পর বিজয়ী রোমানরা নাকি বিজিত যোদ্ধার খণ্ডিত মস্তকটিকে লাথি মারতো। ফুটবল খেলার ইঙ্গিত!

আবার একদল পণ্ডিত চীনদেশে খেলাটি আরম্ভ হয়েছিল বলে মনে করেন।

তবে বর্তমানের খেলাটি ইংলণ্ডে একাদশ শতাব্দী অথবা তারও কিছু আগে থেকে শুরু হয়েছিল। 'ফুটবল' শব্দটির উৎপত্তিও ইংরেজী শব্দ 'fute balle' হতে—এ কথা আমরা অনেকেই জানি।

অলিম্পিকে প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রবর্তন হয় ১৯০৬ সনে—এথেন্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে।

প্রসঙ্গত,ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাটি হয়েছিল ১৮২১ সনে, বোম্বে শহরে—মিলিটারী এবং আয়ল্যাণ্ড অফ বোম্বে নামক দু'টি দলের মধ্যে। আর, ভারতীয় ফুটবল খেলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৮ সনে।

এবার আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হবো ঃ

স্ট্যানলী ম্যাথুজ

ফুটবল-যাদুকর নামে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। কেউ কেউ মনে করেন, ফুটবলের ইতিহাসে তাঁর মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড় আজ পর্যন্ত জন্মাননি। তিনি ইংলণ্ডের হয়ে ৮০টি আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ গ্রহণ

করেছেন। সে রেকর্ড যে-কোন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। সকলেই জানে, ইংলণ্ডের জাতীয় দল দেশের মাটিতে দীর্ঘ ৯০ বছর যাবৎ সগৌরবে মাথা উঁচু করে ছিল—সে গৌরবের মূলেও ছিল ম্যাথুজের অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের ফুটবল খেলোয়াড়দের আদর্শ। নিঃসন্দেহে আজও তিনি ইংলণ্ডের জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। অলিম্পিক বিজয়ী হাঙ্গেরীর জাতীয় দলের দুর্ধর্ষ অধিনায়ক পুসকাসও মুক্তকণ্ঠে ম্যাথুজের ক্রীড়ানৈপুণ্যের সুখ্যাতি করতে দ্বিধা করেননি। ম্যাথুজের অপূর্ব ছন্দোময় ক্রীড়াকৌশল তাঁর অগণিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাত্র সাত বছর বয়সেই ম্যাথুজকে স্কুলের হাফ হিসেবে খেলার মাঠে দেখা যায়। ঐ বয়সেই তাঁর ফুটবল খেলার নেশা প্রবল হয়। দিনের পর দিন বাড়ির পেছনের খোলা জায়গাটুকুতে বালক ম্যাথুজ নিরলস ভাবে কঠিন অনুশীলন চালিয়ে যায়। তার ঐ অক্লান্ত সাধনার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বিপক্ষ দলের কাছে বালকটি হয়ে দাঁড়ায় এক মারাত্মক বিভীষিকা।

সতেরো বছর বয়সে তিনি স্টোক দলে খেলার সুযোগ পান এবং এক বছরের মধ্যেই তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যে আশাতীত ভাবে দলের গৌরব বাড়ে।

কুড়ি বছর বয়সে ওয়েলসের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ গ্রহণ করেন এবং এই কিশোর খেলোয়াড়ের একটি তীব্র সট-ই সেদিনের খেলা মীমাংসা করেছিল। ওয়েলসের দক্ষ গোলরক্ষকও কম স্তম্ভিত হননি।

দুটি আন্তর্জাতিক খেলা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল: ১৯৩৭ সনে দুর্ধর্ষ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে—যে খেলায় তিনি তিনটি অবিস্মরণীয় গোল করেছিলেন। আর, ১৯৫৩ সনে ব্ল্যাকপুল দলের হয়ে এফ-এ কাপ লাভের মধুর স্মৃতি।

এতবড় প্রতিভার অধিকারী হয়েও ম্যাথুজ তাঁর ব্যবহারে অতি অমায়িক ; তাঁর চালচলন সাধারণ। ইংলণ্ড দলের অধিনায়কের পদ অলঙ্কৃত করবার জন্য যতবারই তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে, ততবারই তিনি বিনম্র ভাবে জানিয়েছেন,—ফুটবলের দীন সেবক হিসাবেই আমি পরিচিত হতে চাই।

বলা বাহুল্য, ফুটবলকে তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসেন। ফুটবলই তাঁর একমাত্র আরাধনার বস্তু। এই খেলাকে পেশা বা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেও, অর্থের কাছে তিনি নিজেকে বিকিয়ে দিতে রাজী নন। আজও তিনি নিরলস ভাবে খেলার অনুশীলন করে থাকেন।

সারা বছরে তিনি কচিৎ 'হেড' করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ম্যাথুজের সলজ্জ উত্তর পাওয়া যায়,-.-খেলাটা পা ও মগজের, অন্য কোন অঙ্গের নয়।

প্রসঙ্গতঃ তাঁর এই সাফল্যের পেছনে অ্যাথলেট পিতার অবদানও বড় কম নয়। খেলায় গতিবেগের অপরিসীম মূল্য তিনি উপলব্ধি করে পাঁচ বছরের ম্যাথুজকে দৌড়ের শিক্ষা এবং খেলার অনুশীলনে উৎসাহী করেছিলেন।

ইংলণ্ডের জনগণ ম্যাথুজকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য গভীর শ্রদ্ধা করে। ১৯৪৮ সনে তিনি 'স্পোর্টসম্যান অব দি ইয়ার'-এর সম্মানে সম্মানিত হন। ১৯৫৫ সনে সি. বি. ই. উপাধি পান।

ফেরেঙ্ক পুসকাস, ১৯২৬—

হাঙ্গেরীর জাতীয় দলের অধিনায়ক পুসকাস নিঃসন্দেহে আধুনিক-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়। ১৯৫০ সন থেকে তাঁর দক্ষ অধিনায়কত্বে হাঙ্গেরী দল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলগুলিকে একে একে পরাজিত করে এগিয়ে গেছে অপ্রতিহত ভাবে। অধিনায়ক পুসকাস

তাঁর দেশের বিজয়-নিশান উড়িয়েছেন—অস্ট্রিয়া, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, রাশিয়া, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে।

তারপর ১৯৫২ সনে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হাঙ্গেরী দলের অধিনায়ক হিসেবে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। সে-খেলাতে গোলটি দেওয়ার কৃতিত্বও ছিল তাঁর-ই।

এরপর অপ্রতিহত অধিনায়ক পুসকাসের দুর্বার অভিযান শুরু হয় দেশ হতে দেশান্তরে। যে ইংলণ্ড তাঁর স্বদেশে নব্বই বছর যাবৎ অপরাজিত ছিল, সেই ইংলণ্ডের জাতীয় দলটিও পুসকাসের দলের কাছে দু' দুবার শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়।

১৯৫৪ সন পর্যন্ত পুসকাস স্বদেশের হয়ে পঁয়ষট্টিটি আন্তর্জাতিক খেলায় সগৌরবে অংশ গ্রহণ করেছেন। তবুও তিনি তুষ্ট নন; বিশ্ববিখ্যাত হাঙ্গেরী'র ফুটবলের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করতে পুসকাস দৃঢ়সংকল্প।

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টে এই অমিতবিক্রম খেলোয়াড়ের জন্ম হলেও, ঐ শহরের অদূরে কিস্‌পেস্টে তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল কাটে।

শৈশব থেকেই ফুটবল খেলার প্রতি পুসকাসের গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ ফুটবল খেলা নিয়েই বালক পুসকাসের সময় কখন কেটে যেতো, তিনি টের পেতেন না। বড় খেলোয়াড় হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। উত্তরকালে তাঁর আত্মজীবনীতেও সে কথা বলা হয়েছে। তখন কিসপেস্টে প্রতি সপ্তাহে পেশাদারী ফুটবল খেলার রীতি ছিল। নির্ভীক বালকটি যে কোন উপায়ে হোক সেই খেলা দেখবার চেষ্টা করতো। এজন্য তাঁকে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হতো, কখনও বা লাঞ্ছিতও হতে হয়েছে।

ক্রমে তাঁর দশ বছর বয়সে ঘটনাচক্রে বালক পুসকাস কিসপেস্ট ক্লাবের প্রধান ফুটবল শিক্ষকের সুনজরে পড়ে। এবার গুরুর অধীনে তাঁর অনুশীলন শুরু হয়। নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ নিপুণ খেলোয়াড় হিসেবে তৈরী করবার জন্য পুসকাসের নিজের চেষ্টারও সীমা ছিল না।

সেই সঙ্গে ছিল তাঁর প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় পিতার উৎসাহ আর উপদেশ-নির্দেশ। কঠিন অনুশীলনের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ফুটবল হয় পুসকাসের অনুগত ভৃত্যের মতো।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি বড়দের সঙ্গে দুর্ধর্ষ 'নেভীগোরড' দলের বিরুদ্ধে নির্বাচিত হন। পরের বছর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক খেলায় জাতীয় দলে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রথম গোলটি দেওয়ার কৃতিত্বও তাঁরই ছিল।

জীবনে নানা প্রলোভন এসেছে—কিন্তু স্বদেশের গৌরবের নামে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুনামের সঙ্গে ফুটবল খেলাই তাঁর জীবনের প্রধান ধর্ম। ঐ খেলা তাঁর কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তবে বিবাহিত-জীবন খেলাধুলার অন্তরায় বলে তিনি মনে করেন না। সারা বিশ্ব-ই পুসকাসের প্রিয় ক্রীড়াঙ্গন।

পেলে (Pele), ১৯৪০—

খেলার জগতে এক বিশ্ববিশ্রুত নাম। আজ 'পেলে' নামটি বাদ দিয়ে ফুটবলের কথা ভাবা যেন অসম্ভব। পেলে—ফুটবলের অবিসম্বাদিত রাজা।

কিন্তু মজার কথা যে নামটি শুধু খেলোয়াড়দের মনে নয়, দর্শকগণের মনেও শিহরণ জাগায় সেই 'পেলে' নামটি কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়। নামটি যে কবে এবং কি করে চালু হয়েছিল তা বলা মুস্কিল। খেলোয়াড় নিজেও ঠিক জানেন না। পরিবারের মধ্যে তিনি Dico নামে অভিহিত হন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁকে Saci বলে ডাকে। আর, খেলোয়াড় ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্রে তাঁর পুরো নামটি—Edson Arantes do Nascimento রাখতে দাবী করেন।

পেলে পর পর দু'টো বিশ্বকাপ বিজয়ী অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর।

অন্যূন এগারটি চ্যাম্পিয়ানশিপ মেডেল লাভ

করেছেন ঃ দু'টো বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায়, চারটে ব্রেজিল চ্যাম্পিয়ান হিসাবে এবং পাঁচটি স্যাও পাওলো স্টেট চ্যাম্পিয়ান হিসাবে। আজ পর্যন্ত তাঁর কোন স্বদেশবাসী পেলের মতো অত বেশী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাননি। কম করে ৭০০ গোল দেবার কৃতিত্ব রয়েছে পেলের। সবচেয়ে বড় কথা, অত অল্প বয়সে এবং অত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের অন্য কোন খেলোয়াড় পেলের ন্যায় খ্যাতির শিখরে আজ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেন নি।

মাত্র ষোল বছর বয়সে ব্রেজিলের স্যাণ্টোস ক্লাবে ফুটবল বিভাগে যোগ দিয়ে পরের বছর আর্জেনটাইনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পান। সেবার স্বদলের পক্ষে গোলটি তরুণ পেলেই দিয়েছিলেন।

পরের বছর তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়ে আঠারো বছর বয়সে ব্রেজিলের জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় পেলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৫৮ সনে।

চার বছর বাদে চিলিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায়ও পেলে ব্রেজিল দলের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাঁর অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের গুণে।

শুধু স্বদেশ ব্রেজিলেই নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের রেকর্ডও পেলের কৃতিত্বের কাছে আজ ম্লান হয়ে গেছে। তাঁর পিতাও একজন কৃতী খেলোয়াড় ছিলেন। হয়তো পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার প্রতিভা কিছুটা লাভ করে আপন চেষ্টা যত্ন এবং অক্লান্ত অনুশীলনে নিজেকে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মনে প্রাণে তিনি একজন সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। শুধুমাত্র নিজের দলের খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ দেন না, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন খেলোয়াড় অসহায় পরিস্থিতিতে পড়লে তিনি সেই পরিস্থিতির সুযোগ নেন না। পেনাল্টির মাধ্যমে গোল দিয়ে বাহাদুরি নিতে ঘৃণা বোধ করেন।

গোড়াতে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ঘরের ছেলে। গরীব বলা যেতে পারে। কিন্তু আজ খেলার দৌলতে পেলে একজন কোটিপতি। এত খ্যাতি এত অর্থ কিন্তু স্বভাবটি তাঁর অদ্ভুত মিষ্টি—মাঠে সে লোকটি যতো দুর্দান্ত-ই হোন না কেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরোলেও নিঃসন্দেহে পেলে একজন তীক্ষ্ণধী পুরুষ, ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ ব্রেজিলের স্যাণ্টোস ক্লাব পেলেকে সমুদ্র-সৈকতে একটি চমৎকার বাড়ি উপহার দিয়েছে। মা-বাপ এবং ভাইবোনদের নিয়ে পেলে ঐ বাড়ীতে সুখে দিন কাটান।

ক্রিকেট

ফুটবল খেলার ন্যায় ক্রিকেট খেলার জন্মের ইতিহাসও কিছুটা অস্পষ্ট। এ বিষয়ে আজো কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছন সম্ভব হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, ফরাসী দেশে নাকি খেলাটি প্রথমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু যদিও 'ক্রিকেট' কথাটি ফরাসী শব্দ criquet থেকেই উৎপত্তি তবুও মনে হয়, ইংলণ্ড-ই এ খেলার জন্মস্থান। কারণ, আনুমানিক একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যখন ক্রিকেট খেলা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল বলে জানা যায় ফরাসী দেশে তখন খেলাটি ছিল অজ্ঞাত। ইংলণ্ডবাসীরা তাদের স্বপক্ষের যুক্তি হিসাবে ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত একটি খেলার ছবির প্রতি সন্দেহবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এই ছবিটি লণ্ডনের কিংস লাইব্রেরীতে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাটি হয়েছিল ১৭২৮ সনে—কেণ্ট এবং সারের মধ্যে।

ভারতবর্ষে এই জনপ্রিয় খেলাটি প্রবর্তন করেছিল ইংরেজরা। এবং এদেশে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৫১ সনে—ইংরেজ সৈনিক এবং তখনকার রাজকর্মচারীদের মধ্যে।

এবার আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট ক্রীড়াবিদ্‌দের পরিচয় লাভ করবো—

ডব্লিউ জি গ্রেস, ১৮৪৮--১৯১৫

বিশ্বের এই দিকপাল খেলোয়াড় ছিলেন ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলার নবযুগের স্রষ্টা। বর্তমান ক্রিকেট খেলায় প্রাণের স্পন্দন জাগাবার কৃতিত্বও এই গ্রেসের। খেলাটির এই জনপ্রিয়তার মূলেও ছিলেন তিনি।

প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় ১২৬টি সেঞ্চুরী এবং অন্যূন ৫৪, ৮৯৬ রাণ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সাতচল্লিশ বছর বয়সেও যিনি এক মাসের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিপক্ষ দলগুলির বিরুদ্ধে সহস্র রাণ করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁর তুলনা কোথায়? একান্ন বছর বয়সেও তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে দেখা গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন টেস্ট খেলায় তাঁর দু'বার শতাধিক করে রাণ করার কথাও ভুলবার নয়। শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়েও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।—২,৮৭৬টি উইকেট লাভ করার কৃতিত্ব বড় কম কথা নয়।

সর্বকালের বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হয়েও গ্রেস কোনদিন কোন বিচারের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করেন নি। খেলার কোন আইন শৃঙ্খলার প্রতিও তাঁকে কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে কেউ কোনদিন শোনেনি। আসলে তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খেলোয়াড়।

ইংলণ্ডের সে সময়কার এক প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলার পরিবারে গ্রেস জন্মগ্রহণ করেন। সেদিক থেকে তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান পুরুষ। তাঁর পিতা হেনরী মিলস এবং অগ্রজ এডওয়ার্ড মিলস গ্রেস দু'জনই ছিলেন প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁর পিতা গ্লস্টার কাউন্টি ক্রিকেটদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও স্মরণীয়। বাল্যকাল থেকেই গ্রেস পিতা এবং অগ্রজের কাছে অনুশীলন করেন। তাঁর জীবনের সাফল্যের গোড়ার কথা ছিল খেলোয়াড় পিতার

অপরিসীম উৎসাহ। তাঁর মা'র অবদানও কম ছিল না। খেলায় সামান্য ভুল ত্রুটি হলে তিনিও ছাড়তেন না। মাত্র ন' বছর বয়সে গ্রেস তাঁর পিতার অধিনায়কত্বে প্রথম ম্যাচ খেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বারো বছর বয়সে তিনি ক্লিফটনের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ রাণ করেন।

কিন্তু তখনও তাঁদের পরিবার গ্রেসের খেলায় খুশি নয়, গ্রেস নিজেও নয়। কিছুদিন পর গ্রেস কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সুস্থ হতে ক্ষীণকায় গ্রেস হয়ে ওঠেন বিরাটকায়, এক বলশালী পুরুষ। আবার তিনি খেলতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মন ভরে না।

কিছুদিন পর বড় ভাই এম সি সি'র হয়ে কেণ্টের বিরুদ্ধে ১৯২ রাণ তুলতে চারিদিকে বন্দিত হতে—গ্রেসের মনেও কেমন এক রোখ চেপে যায়। গুণী বড় ভাইর চেয়ে বড় হওয়ার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন।

এ ঘটনার অল্পদিন পরেই ১৮৬৬ সনে চারবার সেঞ্চুরী এবং একবার ডবল সেঞ্চুরী করে ইংলণ্ডবাসীকে চমৎকৃত করেন। প্রসঙ্গতঃ, শৌখিন খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরব অর্জন করেন।

তিন বছর বাদে, মাত্র একুশ বছর বয়সে গ্রেস ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে স্বীকৃত হন।

১৮৭৮ সনের আগস্ট মাসে কেণ্টারবেরী উদ্যানে কেণ্টের বিরুদ্ধে ৩৪৪ রাণ করে গ্রেস যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন—তা কালগত হয়ে আজও এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

১৯১৪ সনের ২৫শে জুলাই। গ্রেসের জীবনের শেষ খেলা। ঐ সাতষট্টি বছর বয়সেও ৬৯টি রাণ তুললেন, অপরাজিত থেকে। এ খেলার এক বছর বাদে ২৩শে অক্টোবর এই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবন-দীপটি নিভে যায়।

খেলার ফাঁকে শিকার করতে অথবা ছিপ দিয়ে মাছ ধরবার সুযোগ

পেলে তিনি খুশি হতেন। বক্তা হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি কখনও ধূমপান করতেন না।

ভিক্টর ট্রাম্পার, ১৮৭৭-১৯১৫

ক্রিকেট খেলার জগতে বিশেষজ্ঞগণ যে-চারজন দিকপালকে 'বিগ ফোর' বলে থাকেন, ট্রাম্পার তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। খেলার যাদুমন্ত্রে অগণিত দর্শকের ওপর অমোঘ মোহ ছড়াতে ট্রাম্পার ছিলেন অদ্বিতীয়।

ট্রাম্পারের খেলার বৈশিষ্ট্য ছিল, মাঠ জলে ভেজাই থাক অথবা রোদে ফাটাই হোক—তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সমান বেগেই তিনি খেলতেন। 'শ্লো' এবং 'ফাস্ট' তু' শ্রেণীর বলই তাঁর কাছে সমান লোভনীয় ছিল। বিশেষ কোন গতানুগতিক নিয়ম মেনে চলার পক্ষ-পাতী তিনি ছিলেন না। অনেকটা বেপরোয়ার মতো ব্যাট চালাতেন। রাণ তোলা ছিল যেন তাঁর খেয়াল-খুশির ব্যাপার। যে কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে রাণ করায় ট্রাম্পার ছিলেন অনন্য। এই নতুন ভঙ্গীর ব্যাট করার প্রবর্তক হিসেবেও তিনি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

ছেলেবেলা থেকেই আক্রমণাত্মক খেলার প্রতি ট্রাম্পারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রান তোলার দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত নিউ সাউথ ওয়েলস দল ট্রাম্পারকে সে দলের হয়ে খেলবার জন্য অনুরোধ করে।

তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া দলে খেলবার জন্য ট্রাম্পার মনোনীত হন। অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রতি ইনিংসে গড়ে ৪৮ রাণ করে ট্রাম্পার মোট ২,৫৭০ রাণ তাঁর ঝুলিতে তোলেন। এর ভেতর এগারোটি সেঞ্চুরি আজও ইংলণ্ডবাসীদের মনে অম্লান হয়ে আছে।

তিন বছর বাদে নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও ভিক্টোরিয়া দলের বিরুদ্ধে

তাঁর ১৩৯ রাণের কৃতিত্বের গৌরব ব্যাপক ভাবে নানা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়, যার শতটি রাণ তুলতে এই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়ের ৫৭ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

১৯০৫-১৯০৬ সনে ঐ প্রখ্যাত ভিক্টোরিয়া দলের বিরুদ্ধে মেলবোর্ন প্রাঙ্গণে দলের মোট ১৫০ রাণের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত অবদানের সংখ্যা ছিল অন্যূন ১১৯ রাণ।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় ট্রাম্পার ৪৫টি সেঞ্চুরি করেছেন। রাণের সংখ্যা ১৭,১৫০—গড় হিসেবে প্রতি ইনিংসে ৪৫·০১ রাণ। তবে, অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে ৩০০ রাণে অপরাজিত থাকা এই খেলোয়াড়ের জীবনের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ। আবার, মোট ৪৮টি টেস্ট খেলায় ট্রাম্পার ৩,১৬৩টি রাণ তুলেছিলেন।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনী মাঠের অনুষ্ঠানটিই ছিল ট্রাম্পারের জীবনের প্রথম শ্রেণীর শেষ খেলা। এটিও তাঁর জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা। অপরাজেয় ট্রাম্পার ২০১ রাণ

অসুস্থতা এই খেলোয়াড়ের জীবনে বহুবার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তবে একটু সুস্থ হতেই যখনই তিনি মাঠে নেমেছেন—খেলেছেন তিনি অমিত বিক্রমে। তাঁর ক্রীড়া নৈপুণ্যে দর্শকগণ বিস্মিত হয়েছে বারবার।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির। ট্রাম্পার ছিলেন দল ও মতের উর্ধ্বে। দেহ ও মনে তিনি ছিলেন সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে শুধু স্বদেশ অস্ট্রেলিয়াই কাতর হয়নি, সে-গম্ভীর শোকের ছায়া সেদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রণজিৎ সিংজী, ১৮৭৭-১৯৩৩

তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চার জনের মধ্যে অন্যতম এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম ক্রিকেট খেলোয়াড়। বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে ভারতবর্ষের যে-আসনটি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত তার মূলেও সিংজী।

জীবনে সিংজী অনূ্যন ২৫,০০০ রাণ তুলেছিলেন। প্রতি ইনিংসে ঐ রাণের গড়পড়তা ছিল ৫৬টি। এক সময় এক মাসের মধ্যে তিনি সহস্র রাণ কুড়িয়েছিলেন। অপরপক্ষে, প্রথম শ্রেণীর খেলায় বাহাত্তর বার শত রাণ করবার কৃতিত্ব বড় কম কথা নয়।

গতানুগতিক রীতি-নীতির তিনি ধার ধারতেন না। তাঁর নিজস্ব ঢংয়ে বল মারবার কৌশলটি ছিল অনন্যসাধারণ এবং দুরন্ত গতিতে রাণ তুলবার দক্ষতা ছিল অপূর্ব।

১৮৯৫ সনে সাসেক্স দলে খেলবার পরেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পান। তবুও পরের বছর অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পর, দলের স্বার্থে, এই ভারতীয়টি প্রথম ইংলণ্ডের টেস্ট দলে নির্বাচিত হন। খেলাটি ছিল দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সিংজীর অসাধারণ খেলায় সকলে চমৎকৃত হয়। ভবিষ্যতের টেস্ট খেলায় তাঁর আসন দৃঢ় হয়। শুধু তাই নয়, সিংজীর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ১৫৪ রাণই সেবার ইংলণ্ডকে নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা করে।

ঐ বছরের শেষের দিকের কথা। সিংজী ২,৭৮০ রাণ তুলে ইংলণ্ডের 'ব্যাটিং-এভারেজ'-এ প্রথম স্থান লাভ করেন। তাঁর এই রাণ দুর্ধর্ষ পূর্বসূরী গ্রেসের রেকর্ডকেও ম্লান করে দেয়।

অবশ্য ১৯০০ এবং ১৯০৪ সনেও ইংলণ্ডের ব্যাটিং এভারেজে সিংজীর আসনটি-ই ছিল শীর্ষস্থানে।

১৮৯৭-৯৮ সনে ইংলণ্ড দলে তিনি অস্ট্রেলিয়া যান। প্রথম টেস্টে সিডনির মাঠে সিংজী ১৭০ রাণ তোলেন। কিন্তু এডিলেড প্রান্তরে

তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবুও সেখানে ১৮৯ রাণ করেন। সেবারকার অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি নবতম রেকর্ড সৃষ্টি করে সকলকে স্তম্ভিত করেছিলেন। ইংলণ্ডের দলে মোট চৌদ্দটি টেস্ট খেলায় রণজী সগৌরবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৮ সনে সাসেক্স দলের হয়ে সারের বিরুদ্ধে খেলে রণজী ডবল সেঞ্চুরীর কৃতিত্ব দেখান। জীবনে এটাই তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

এরপর নানা ঘটনাচক্রে ক্রমে তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ম্লান হয়ে আসে। কোন এক দুর্ঘটনায় রণজীর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়াও হয়তো এর কারণ।

১৮৮৯ সনে সিংজী ট্রিনিটি কলেজের রেভারেণ্ড বরিশ-এর তত্ত্বাবধানে কেম্ব্রিজে গিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই ক্রিকেট খেলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। শুধু খেলবার নয়, ভাল ভাবে অনুশীলন করবারও সুযোগ পেয়ে যান রণজী।

ক্রমে খেলায় তাঁর আসক্তি বেড়ে যায়। খেলা নিয়ে মেতে থাকেন। তবুও অভিভাবককে আশ্চর্য করে পরীক্ষায় রণজী ভাল ভাবে পাশ করেন।

অল্পদিনের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় রণজীর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি 'নেটিভ' বলে চিহ্নিত হতে কেম্বিজ দলে সহজে স্থান পান না। তারপর এক সময় কর্তাদের মনোভাব পরিবর্তন হতে তিনি মনোনীত হন, তার অল্পদিনের মধ্যেই রণজী কেমৃব্রিজ দলে নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যাস বলে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ডন ব্রাডম্যান, ১৯০৮—

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার কোটামুণ্ড্রা শহরে তাঁর জন্ম হলেও সিডনীর অদূরে বোরাল শহরে ডনের বাল্য ও কৈশোর কাটে।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ব্র্যাডম্যান ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় খেলোয়াড় আজ পর্যন্ত একাধিক বার এক ইংনিংসে তিন শ'র বেশী রাণের কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেননি।

ব্যাটিংয়ে ব্র্যাডম্যান ছিলেন এক আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী। ১৯২৭ থেকে '৪৮ সন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় ৩৩৮টি ইনিংসে তিনি মোট ২৮,০৬৭ রাণের গৌরব লাভ করেন। আর, ১১৭টি সেঞ্চুরী সহ সেই রাণের গড় ইনিংস প্রতি ব্র্যাডম্যানের রাণের পরিমাণ হয় ৯৫'১৪।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত রাণের রেকর্ড ক্রিকেটের ইতিহাসে আজও এক বিস্ময়।

টেস্ট খেলায় তাঁর আশিটি ইনিংসের রাণ সংখ্যা ছিল ৬,৯৯৬ এবং উনত্রিশটি সেঞ্চুরীও নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

তাঁর অধিনায়কত্বও ছিল তেমনি অনন্যসাধারণ। ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে চার পর্যায়ের টেস্ট খেলার স্মৃতি আজও খেলার রসিক মহলে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে।

একদিকে তাঁর দুর্জয় ও বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের কৌশল অন্যদিকে বিদ্যুৎ বেগে রাণ তোলা—এই ছিল ব্র্যাডম্যানের খেলার বিশেষত্ব।

তেরো বছর বয়সে বালক ব্রাডম্যান একদিন পিতার সঙ্গে সিডনির মাঠে একটি টেস্ট খেলা দেখতে যান। সে খেলাটি ছিল ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। প্রথম টেস্ট খেলা দেখে অভিভূত হয়ে সেদিন বালকটি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে পিতাকে বলেছিল,—দেখো, আমিও একদিন এই মাঠে খেলবো।

পুত্রের উক্তি শুনে সেদিন তার পিতা মনে মনে হাসলেও উত্তরকালে তিনি নিশ্চয়ই সে-কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।

অবশ্য এ ঘটনার দু'বছর আগেই তিনি প্রথম ম্যাচ খেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেদিন এই নাম-না-জানা অনভিজ্ঞ এগারো বছরের বালকটি বিপক্ষকে নাজেহাল করে ছেড়েছিলো। অপরাজিত বালকটি পঞ্চান্নটি রাণ করেছিল।

মাত্র তেরো বছর বয়সেই ব্র্যাডম্যান অগ্রজদের দলে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর সতেরো বছর থেকে তাঁকে নিয়মিত ভাবে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় দেখতে পাওয়া যায়।

ব্র্যাডম্যানের কাছে ১৯৩০ সনটির গুরুত্ব প্রগাঢ়। ঐ বছরই শেফিল্ড শীল্ডে কুইনসল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলে ৪৫২ রাণে অপরাজিত থেকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় যে রেকর্ড সৃষ্টি করেন তা শুধু অভূতপূর্ব নয়, আজও সেই গৌরব ভাস্বর হয়ে আছে।

১৯৪৮ সনে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করে বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সে সময় ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেন নি। পরের বছর ব্রিটিশ সরকার বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে ‘নাইট’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

হকি

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন খেলা। সম্ভবতঃ এ খেলাটি প্রথম পারস্য দেশে শুরু হয়েছিল। ক্রমে খেলাটি গ্রীস দেশ এবং গ্রীস থেকে রোমে প্রচলিত হয়। তবে হকি খেলাটি যে প্রাচ্য দেশে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল সে বিষয়ে গবেষকদের মনে কোন দ্বিধা নেই।

আনুমানিক ২,৫০০ বছর আগে গ্রীস দেশে বর্তমান খেলাটির অনুরূপ এক রকম খেলা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এর বহুশত বছর পরে ফরাসী দেশে সেরকম একটি খেলা দেখা যায়; ফরাসী দেশে খেলাটি Hoquet নামে পরিচিত ছিল।

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডবাসীরা ফরাসীদের অনুকরণে খেলাটি তাদের দেশে প্রবর্তন করে। ফরাসীদের ‘হকেট’ খেলা থেকেই বর্তমান হকি (Hockey) কথাটির উৎপত্তি। ক্রমে বিশ্বের সর্বত্র খেলাটি হকি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, ফরাসী দেশেও।

অলিম্পিকে হকি প্রতিযোগিতা প্রথম হয় ১৯০৮ সনে—লণ্ডনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অলিম্পিকে।

বিশ্বের হকি খেলার ইতিহাসে ভারতের স্থান অবিসম্বাদিত। ভারতীয় দল অলিম্পিকে প্রথম অংশ গ্রহণ করে—১৯২৮ সনে, আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে। এবং পর পর পাঁচটি অলিম্পিকে—১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সনে ভারতীয় দল বিজয়ের মুকুট লাভ করে।

বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে যিনি ভারতের গৌরবময় আসনটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করেছেন—বিশ্বের সেই শ্রেষ্ঠ হকি ক্রীড়াবিদের সঙ্গে এবার আমরা পরিচিত হবো,—

ধ্যানচাঁদ, ১৯০৫—

সর্বকালের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়। হকির যাদুকর নামে তিনি দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ। বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে ভারতের গৌরবময় আসনটি অধিকার করার মূলে ধ্যানচাঁদের অবদান অপরিসীম।

১৯২৮ সনের অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল প্রথম যোগদান করে। ধ্যানচাঁদ অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হন। অলিম্পিকের পথে লণ্ডনে ভারতীয় দল পর পর এগারোটি খেলায় বিজয়ী হলেও ইংলণ্ড-বাসীরা বিশেষ চঞ্চল হয় না। কিন্তু সে সব খেলায় নাম-না-জানা ধ্যানচাঁদের বিস্ময়কর প্রতিভা লক্ষ্য করে তারা রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ে। অবশেষে মুক্তকণ্ঠে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না।

অলিম্পিকে ভারতীয় দল একে একে অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক এবং সুইজারল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। কিন্তু হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আসল খেলার দিন বিপদ দেখা দেয়। তিন দিকপাল খেলোয়াড় অসুস্থ। বিশেষ ভরসার স্থল ধ্যানচাঁদও জ্বরে কাতর।

দলের অধিনায়ক অগত্যা ধ্যানচাঁদের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়েন। দেশের মান বাঁচাতে সৈনিক তাঁর শক্ত মুঠিতে হাতিয়ারটি নিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিংহবিক্রমে ধ্যানচাঁদ খেলতে শুরু করেন। তাঁর দুর্বার আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপক্ষ দল দাঁড়াবার শক্তি খুঁজে পায় না। তিন গোলে হল্যাণ্ড পরাজিত হয়। ধ্যানচাঁদের কল্যাণে ভারতবর্ষ বিজয়ী হয়। সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে ধ্যানচাঁদ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৩১ সনে ঝাঁসী হিরোজ দলের অধিনায়ক হিসাবে মানভাদার দলকে পরাজিত করায় কারোয়াই'র নবাব পুরস্কার বিতরণের সময় ধ্যানচাঁদকে 'খিলাত' দেন। দু'বছর বাদে অধিনায়ক ধ্যানচাঁদ শক্তিশালী ক্যালকাটা কাস্টমসকে পরাজিত করে বাইটন কাপ লাভ করেন। এই বিজয়টিকে তিনি জীবনের একটি গৌরবময় ইতিহাস বলে মনে করেন।

১৯৩২ সনের অলিম্পিকের হকি খেলাতেও ভারত বিজয়ীর মুকুট লাভ করে। এ বিজয়ের মূলেও ধ্যানচাঁদের কৃতিত্ব অপরিসীম। লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের শেষে বিজয়ী ভারতীয় দল—হল্যাণ্ড, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরীতে খেলে অপরাজিত গৌরব নিয়ে স্বদেশে ফেরে। ব্যক্তিগতভাবে ধ্যানচাঁদ ১৩৩টি গোল করে অনন্যসাধারণ গোলদাতার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

১৯৩৪ সনে ওয়েষ্টার্ন এশিয়াটিক গেমসে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন ধ্যানচাঁদ। পরের বছর নিউজিল্যাণ্ড সফরে বিজয়ী ভারতীয় দলের নেতাও তিনিই ছিলেন। ১৯৩৬ সনে বার্লিন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার পড়েছিল এই হকি-যাদুকরের ওপর। তাঁর নেতৃত্বে ভারত শুধু বিজয়ী হয়নি, সর্বাপেক্ষা বেশী ৫৯টি গোল করার কৃতিত্বও ধ্যানচাঁদ অর্জন করেছিলেন।

১৯৪৯ সনের মে-মাসে এই কলকাতায় এক প্রদর্শনী খেলায় শেষ খেলা খেলে ধ্যানচাঁদ প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সনে তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। জাতিতে রাজপুত

হলেও শৈশব ও বাল্যকাল এলাহাবাদ এবং পরে ঝাঁসিতে তিনি সপরিবারে বাস করেন। সৈনিক পরিবারের রীতি হিসাবে ধ্যানচাঁদও ষোল বছর বয়সে সিপাই হিসাবে সেনাবিভাগে নাম লেখান, 'ব্রাহ্মিণ রেজিমেণ্টে'। ক্রমে তিনি অফিসার পদে উন্নতি লাভ করেন। অবশ্য ১৯২৬ সন পর্যন্ত তাঁর খেলা সেনাবিভাগের মধ্যেই সীমিত ছিল।

টেনিস

এ খেলাটি প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল ফরাসী দেশে। যদিও সে দেশে খেলাটির নাম ছিল 'লা পাম'। পরবর্তীকালে ফরাসীদের অনুকরণে ইংরেজরা খেলাটি ইংলণ্ডে প্রবর্তন করলে তার নাম হয় 'টেনিস'। ইংলণ্ডে এ খেলাটি প্রচলিত হয় আনুমানিক ১৩৬০ সনে।

তবে বর্তমানের খেলা অর্থাৎ **লন টেনিসের** প্রবর্তন করেন একজন ইংরেজ—মেজর ওয়াল্টার উইংফিল্ড, ১৮৭৩ সনে। আধুনিক যুগের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক টেনিস খেলা অনুষ্ঠিত হয়—উইম্বলডনে, ১৮৭৭ সনে।

সুজানে ল্যাঙ্গলেন, ১৮৮৯-১৯৩৭

এই ফরাসী মহিলা ছিলেন টেনিস সম্রাজ্ঞী। পৃথিবীতে এ খেলা যতদিন থাকবে এঁর স্মৃতিও ততদিন টেনিস-রসিকজনের মনে অম্লান হয়ে থাকবে।

মাত্র পনের বছর বয়সেই বিশ্ব হার্ডকোট টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে জয়ের মুকুট মাথায় পরে ল্যাঙ্গলেন সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন।

তারপর তাঁর উনত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছুতে সমগ্র ফরাসী দেশে তিনি অপরাজেয় খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত হন।

সুজানের প্রতিভার ওপর তাঁর পিতার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম।

স্বদেশে কন্যার এই সাফল্যে পিতার মন ভরে না। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, তাঁদের আদরিনী হোক বিশ্বের দুলালী।

একদিন কন্যাকে নিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের পথে তাঁরা যাত্রা করেন।

১৯১৯ সন। উইম্বলডন। এই প্রায় অজ্ঞাত নারী তখনকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় শ্রীমতী চেম্বার্সের মুখোমুখি দাঁড়ায়। পিতার আশীর্বাদ মিথ্যা হয় না। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করে সুজানে বিজয়িনী হন।

তারপর একটানা দীর্ঘ পাঁচ বছর (১৯১৯-'২৩) পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিখ্যাত অঙ্গনে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড়দের একে একে এই ফরাসী নারীর হাতে পরাজিত হতে হয়েছে। সুজানের সেই অভূতপূর্ব খেলার ইতিহাস আজও অম্লান হয়ে আছে।

ক্রমে তাঁর খেলার খ্যাতি পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ঐ মনোমোহিনী খেলা দেখার জন্য তখনকার ইংলণ্ডের রাজপরিবারও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। সুজানের সেই অদ্ভুত পোষাক হয় মহিলাদের আদর্শ পোষাক!

১৯২৪ সনে তাঁর প্রেরণার উৎস পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। সুতরাং খেলার অনুশীলনও হয় না। কিন্তু উইম্বলডন থেকে যখন ডাক আসে বিজয়ের উন্মাদনায় সুজানে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। পিতার নিষেধ অগ্রাহ্য করেই অসুস্থ শরীরে তিনি ছুটে যান। সেমি-ফাইন্যাল খেলার শেষে তিনি চেতনা হারান। শেষ রক্ষা আর করতে পারলেন না।

কিন্তু পরের বছরের প্রতিযোগিতায় তিনি আবার তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে বাড়ি ফেরেন।

১৯২৬ সনে উইম্বলডনে পরাজিতা হতে সুজানে পেশাদার বৃত্তি বরণ করেন। এর পর বারো বছর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু ঐ স্বল্প সময়ের জন্যেই তাঁর ছন্দময় খেলার বিনিময়ে সুজানে অজস্র অর্থ উপার্জন করেছেন।

শৈশব থেকেই পিতামাতার সতর্ক প্রহরার আড়ালে এবং পেশাদার ইতালিয়ান শিক্ষকের অধীনে সুজানেকে অবিশ্রাম কঠিন অনুশীলন করতে হয়েছে। সামান্য ত্রুটি হলেও মা'র তীব্র ভর্ৎসনার থেকে সুজানে রেহাই পেতেন না। সেই অনুশীলনের সময় তাঁর চোখের জল মুছবারও সুজানে অবকাশ পেতেন না। আর, তাঁর পিতা থাকতেন ছায়ার মতো সব সময় কন্যার পাশে পাশে, বিশ্ববিজয়িনী হবার পরও। এই পিতাই ছিলেন সুজানের উৎসাহ এবং প্রেরণার মূল উৎস।

উইলিয়াম টিল্ডেন, ১৮৯৩-১৯৫৩

তাঁর আসল নাম ছিল—দ্বিতীয় উইলিয়াম টেটাম টিল্ডেন।

শুধু আমেরিকার নয়, টিল্ডেন ছিলেন বিশ্বের টেনিস সম্রাট নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন সে-খেলায় সর্বজ্ঞও।

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার কোন এক অঞ্চলে তাঁর জন্ম। শৈশবেই তিনি পিতামাতাকে হারান। তবুও কৈশোরে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিল্ডেন টেনিস খেলার অনুশীলন শুরু করেন। ক্রমে তিনি ঐ অনুশীলনে এমনি মত্ত হয়ে ওঠেন যে চারদিক থেকে লোকে তাঁকে ক্ষান্ত করবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ বা তাঁকে নানা ভাবে উপহাস, বিদ্রূপ করে। তবুও কিশোরটি তাঁর সংকল্পে অটল থাকে। অদম্য উৎসাহে টিল্ডেন অনুশীলন চালিয়ে যান।

ঐ কিশোর বয়সেই এদিক ওদিক নানা প্রতিযোগিতায় সুনাম অর্জন করে ১৯১৩ সনে আমেরিকার জাতীয় প্রতিযোগিতায় ডাবলস্ বিভাগে, প্রথম বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেন।

এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে তাঁকেও আমেরিকার সেনাবিভাগে নাম লেখাতে হয়। যুদ্ধ শেষে আবার তিনি প্রিয় খেলাটিতে মনপ্রাণ ঢেলে দেন।

১৯১৮ সনে এবং ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সন পর্যন্ত জাতীয় প্রতিযোগি-

তায় তিনি বিজয়ী হন। ১৯২১ থেকে '২৫ সন পর্যন্ত সিঙ্গলস-এ তিনি ছিলেন অপরাজেয় খেলোয়াড়। তিন বছর পর টিল্ডেন আবার দেশের চ্যাম্পিয়ান হন। এর দু বছর আগেই তিনি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ডাবলস্ জুটি হিসাবে স্বীকৃত হন।

এবার তাঁর নিজের অভিযান দেশের গণ্ডির বাইরে দ্রুত এগিয়ে চলে—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, উইম্বলডন এবং ডেভিস কাপে।

উইম্বলডন-এর সিঙ্গলস-এ ১৯২০, ১৯২১ এবং ১৯৩০ সনে তিনি বিজয়ী হন। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে এ গৌরব তিনিই প্রথমে লাভ করেন।

অপরপক্ষে ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সন পর্যন্ত পরপর সাত বছর টিল্ডেনের অধিনায়কত্বে আমেরিকা ডেভিস কাপ বিজয়ের গৌরব লাভ করে। ১৯৩০ সন পর্যন্ত তিনি ডেভিস কাপের খেলায় সতেরটি সিঙ্গলস এবং চারটি ডাবলস খেলায় বিজয়ী হন। তাঁর এই অনন্যসাধারণ বিজয়ের গৌরব আজও অম্লান হয়ে আছে।

ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যা·· এবং মধ্য প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাগুলির সর্বত্রই তিনি বিজয়ের নিশান উড়িয়েছেন। অন্যূন সত্তরটি আমেরিকার ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন।

১৯৩১ সনে তিনি পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেও দীর্ঘ কুড়ি বছর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নাজেহাল করেছেন।

এক সময় খেলতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় তিনি ডান হাতে প্রচণ্ড আঘাত পান। ফলে, একটি আঙ্গুল বিষাক্ত হয়ে যায়। হাতটি রক্ষা করবার জন্য ঐ আঙ্গুলটি কেটে বাদ দিতে হয়। তবুও তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য অপ্রতিহত থাকে। তাঁর খেলা দেখে অগণিত গুণমুগ্ধ দর্শকগণ আশাহত হয় না।

এই বিস্ময়কর খেলোয়াড় দীর্ঘ তিরিশ বছর খেলা করেছেন।

অযাচিত ভাবে দুহাতে অর্থ কুড়িয়েছেন, জীবনে যশও পেয়েছেন আশাতীত, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের জন্য অতি দীন অবস্থায় তাঁর শেষ জীবন কেটেছে। শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করেন এক জঘন্য হোটেলে।

১৯৩৮ সনের ২রা জানুয়ারী টিল্ডেন কলকাতার সাউথ ক্লাবে তাঁর বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে শুধু আমাদের কলকাতাবাসিগণকে নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অগণিত দর্শকমণ্ডলীকেও সেদিন মুগ্ধ করেছিলেন।

হেলেন উইল্‌স, ১৯০৫—

আমেরিকার এই মহিলা টেনিসে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত যে আটবার শ্রীমতী হেলেন বিশ্ববিখ্যাত উইম্বলডনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই তাঁর অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের কাছে প্রতিপক্ষের সকলকে হার মানতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মহিলা বিভাগে শ্রীমতী হেলেন যে অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীমতী হেলেন শুধু টেনিস-সম্রাজ্ঞী সুজানের আসনই অধিকার করেননি, তাঁর মতো এত দীর্ঘদিন আর কোন টেনিস-পটীয়সী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন না।

১৯২৩ থেকে '৩১ সন পর্যন্ত আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় হেলেন যতবার অংশ গ্রহণ করেছেন প্রত্যেক বারই তিনি বিজয়ের গৌরব লাভ করেছেন।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে হেলেন প্যাসিফিক কোস্ট এবং ইউ এস গার্লস চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করেন। তারপর স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় ১৯২৪ সনে উইম্বলডনের সেণ্টার কোর্টে—খেলার কৃতিত্ব দেখিয়ে হেলেন এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

খেলার মাঠে পাছে তাঁর একাগ্রতা নষ্ট হয়, এই ভয়ে শ্রীমতী হেলেন খেলার সময় কোন কথা বলা পছন্দ করতেন না। বিশ্বজগৎ ভুলে এক মনে তিনি খেলা করতেন।

গতানুগতিক নিয়ম মেনে খেলার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে তাঁর ভুলত্রুটি কেউ দেখিয়ে দিলে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না, শুধরে নিতে চেষ্টা করতেন।

হেলেনের বিবাহিত জীবন তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভাকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। বিয়ের পরও দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দেরই তাঁর হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

শুধু তাঁর প্রথম জীবনে অনুশীলনের গোড়াতে নয়, উত্তর জীবনেও হেলেনের প্রত্যেকটি খেলায় তাঁর মা উপস্থিত থাকতেন দর্শক হিসেবে। তাঁর জীবনে মার এই প্রেরণার প্রভাব ছিল অসাধারণ। টেনিস জগতে প্রবেশ করার প্রথম দিন থেকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি লাভ করা পর্যন্ত তাঁর মা-ই ছিলেন শ্রীমতী হেলেনের প্রেরণার প্রধান উৎস।

পৃথিবীতে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৩৮ সন থেকে শ্রীমতী হেলেন ক্রমে ক্রমে খেলার আসর থেকে সংসার এবং লেখার জগতে অনুপ্রবেশ করেন। টেনিস খেলার ওপর তাঁর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ সুধী সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

ডোনাল্ড বাজ, ১৯১৫—

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ওকল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম।

তাঁর পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত টেনিস খেলা তো দূরের কথা, দর্শক হিসেবেও ডোনাল্ড কোন দিন সে-খেলার মাঠে যাননি। নেহাত ব্যক্তিগত জিদের বশেই ১৯৩০ সনে একদিন তিনি টেনিস খেলতে শুরু

করেন। এবং ঐদিনই হয়তো মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন—তিনিও একজন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় হবেন। সত্যিসত্যিই মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই ডোনাল্ড আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

দীর্ঘ দশ বছর পরে ১৯৩৭ সনে ডেভিস কাপ আমেরিকায় ফেরে। এই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের কৃতিত্বের মূলে ছিলেন ডোনাল্ড। সিঙ্গলস্ খেলায় তিনি একে একে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী এবং ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের পরাজিত করেছিলেন। তাঁর ডাবলসের বিজয়ের পথেও কেউ বাধার সৃষ্টি করিতে পারেনি। পরের বছরও ডোনাল্ডের নেতৃত্বে আমেরিকা ডেভিস কাপ লাভ করেছিল।

ঐ বছরই তিনি আমেরিকা, ব্রিটিশ, ফ্রান্স এবং অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় অনায়াসে বিজয়-মুকুট লাভ করেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় পর পর দু'বছরই তিনি 'ত্রি-মুকুট'-এর গৌরবও লাভ করেন। তাঁর এই অসাধারণ কৃতিত্ব টেনিস-সম্রাট টিল্ডেনের গৌরবকেও ম্লান করে দেয়।

মাত্র দু'বছরের মধ্যে ডোনাল্ড বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ের গৌরব লাভ করেন। কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সনে বিপুল অর্থের বিনিময়ে ডোনাল্ড পেশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেন।

পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবেও একটানা তিন বছর (১৯৪০-'৪২) তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সময় তিনি দু'হাতে অজস্র অর্থ উপার্জন করেন। তবুও কিন্তু এই খেলার মোহ বা অর্থের লোভ এই খেলোয়াড়কে বেঁধে রাখতে পারে না। ডোনাল্ড একদিন যেমন অতর্কিতে এই খেলার জগতে প্রবেশ করেছিলেন তেমনি হঠাৎ তিনি টেনিসের জগৎ থেকে দূরে সরে যান। বিশ্ববাসী আজও তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যে মুগ্ধ, বিস্মিত।

How Lawn Tennis is played এবং On Tennis, এই গ্রন্থ দু'টির জন্যে লেখক হিসেবেও ডোনাল্ডের খ্যাতি কম নয়।

১৯৪১ সনে তিনি জীবনসঙ্গিনীকে বেছে নেন। এখন টেনিসের চেয়ে গৃহ এবং গৃহিণীর আকর্ষণই ডোনাল্ডের কাছে বড়। বর্তমানে তিনি নানা ব্যবসায়ে জড়িত।

খেলোয়াড়ের ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনে ডোনাল্ড দেশ বিদেশ থেকে বহু সুন্দর সুন্দর পুরস্কার পেয়েছেন। তবে শ্রেষ্ঠ সৌখীন খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৩৭ সনে স্বদেশ থেকে পাওয়া—'জেমস ই সুলিভ্যান ট্রফি'টি তাঁর যেন সব চেয়ে বেশী প্রিয়।

সাঁতার

জন্তু জানোয়ারের সাঁতার দেখে মানুষ প্রথমে সাঁতার শিখতে উৎসাহিত হয়। তারপর মানুষ যখন দেখল, সাঁতার-না-জানা তার অসহায় স্বজাতি কেমন মর্মান্তিকভাবে জলে ডুবে মরে তখন সে সাঁতার শিখতে আগ্রহী হয়। ক্রমে সাঁতারে পটু পশুরা সেই অসহায় মানুষকে সাঁতার শিখতে দেয় প্রেরণা।

এমনিভাবে প্রাণের দায়ে মানুষ সাঁতার শেখে। কিন্তু ঠিক কবে থেকে তা বলা শক্ত। সেই মানুষ অনুশীলনের মাধ্যমে আজ কতো বিভিন্ন এবং উন্নত সাঁতারের পদ্ধতির-ই না সৃষ্টি করলো।

বর্তমানের উন্নত ধরনের সাঁতারের উদ্গাতাও ইংরেজরা। 'সুইমিং' কথাটির উৎপত্তিও ইংরেজী শব্দ (সুইমিন) থেকে।

প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়েছিল লণ্ডনে, ১৮৩৭ সনে।

সাঁতার অলিম্পিকের প্রতিযোগিতা-সূচীতে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯২০ সনে—এণ্টওয়ার্পে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে।

যাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু—

ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব, ১৮৪৮-'৮৩

দূর পাল্লার সাঁতারের জনক হিসেবে তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ১৮৭৫ সনের ২৪শে আগস্ট তিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছিলেন সেদিন। চ্যানেলটি অতিক্রম করতে তিনি সময় নিয়েছিলেন একুশ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনিই ছিলেন একমাত্র ঐ গৌরবের অধিকারী।

ইংলণ্ডের স্রপসায়ারে তাঁর জন্ম। জলের প্রতি তাঁর টানটা যেন ছিল জন্মগত। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক দামাল প্রকৃতির। তাঁদের বাড়িটি ছিল সেভার্ন নদীর তীরে।

বালক বয়সেই ম্যাথু ওয়েবকে যখন তখন ঐ সেভার্ন নদীতে সাঁতার কাটতে দেখা যেতো। রাতের অন্ধকারে এমনকি বিক্ষুব্ধ নদীর বুকেও।

পাঠ্যজীবন শেষ হতে জলের সঙ্গে মিতালি আরও গাঢ় করতে সকলের উপদেশ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বেছে নেন নাবিকের জীবন।

এই নাবিক জীবনই তাঁকে ইংলিশ চ্যানেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই চ্যানেলের বুক চিরে তাঁর জাহাজ চালিয়ে যেতে-আসতে ক্রমে সেটি সাঁতরে পার হবার বাসনা তাঁর মনে জাগে।

দূর পাল্লার সাঁতার তখনও প্রচলিত নয়। বিশেষ করে ঐ ইংলিশ চ্যানেল!—যার জল বরফ-গলা, হিমশীতল, দুরন্ত তার স্রোত; তায় অজস্র ভয়াবহ সামুদ্রিক জীব-জন্তুর আড্ডাখানা।

তবুও কিন্তু ম্যাথু ওয়েব নিরাশ হন না। উদ্ভট চিন্তাটা মাথায় থেকে যায়।

তারপর সাতাশ বছর বয়সে একদিন বুকভরা আশা আর দুর্জয় সাহসের ওপর ভর করে ম্যাথু ওয়েব ইংলিশ চ্যানেলের জলে নেমে পড়েন। হঠাৎ জলটা খুব বেশী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। সাত ঘণ্টা সংগ্রাম করে সে যাত্রায় ম্যাথুকে ডাঙ্গায় উঠে আসতে হয়।

তারপর ঠিক তিন মাস এগার দিন পর আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি

আবার ঐ জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী ম্যাথু ওয়েবের ওপর প্রসন্ন হন।

তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্যের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় না। এই বীর সন্তানটিকে সম্বর্ধনা জানাতে ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন হয়।

এই সাফল্যের ফলে আশাতীত ভাবে তিনি অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর অর্থের প্রলোভন বেড়ে যায়। আরও বেশী উপার্জনের আশায় তিনি পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করেন।

একদিকে অর্থের লোভ, অন্যদিকে নিজের ঐ সাফল্যের দম্ভে ম্যাথু তখন প্রায় উন্মাদ। নিজের এই খ্যাতিকে ইতিহাসে দৃঢ় করবার জন্য আরও কিছু অসম্ভব কাণ্ড করবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।

হঠাৎ ১৮৮৩ সনে ম্যাথু ওয়েব ঘোষণা করেন, তিনি নায়েগারা জলপ্রপাতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক মাইল সাঁতার কেটে ফের অক্ষত ভাবে তীরে উঠে আসবেন।

আমরা জানি, দুটি উন্মত্ত বিশাল জলধারা ১৬০ ফুট উঁচু থেকে যে স্থানটিতে আছড়ে পড়ে আসলে সেটিই 'নায়েগারা'র উৎস—পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত।

লোকে তাঁর ঐ ঘোষণা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠে। ম্যাথু ওয়েব কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সেই স্মরণীয় চব্বিশে আগস্ট, তিনি নায়েগারার উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু এ যাত্রায় ম্যাথু ওয়েব ডাঙ্গায় আর ফিরে আসেন না। ক'দিন বাদে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি খুঁজে পাওয়া যায়।

জনি উইসমুলার, ১৯০৫—

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঁতারু। স্বদেশ আমেরিকা তথা বিশ্বের দিকপাল সাঁতারুদের প্রেরণার উৎস।

মাত্র ষোল বছর বয়সে অষ্টম অলিম্পিকের সাঁতারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাঁর তিনটি স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব এক যুগান্তকারী ঘটনা। চার বছর বাদে ১৯২৮ সনের অলিম্পিকেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী আজও অম্লান হয়ে আছে।

নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই এই অসাধারণ সন্তরণ বীর সাঁতার শুরু করেছিলেন। তাঁর মনের তাগিদে নয়, ডাক্তারের নির্দেশে নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়।

তের বছর বয়সে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে একদিন তিনি বাড়ির অদূরে নদীতে নেমেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই বিরক্তি কেটে সাঁতারের প্রতি তাঁর মনেজাগে গভীর আসক্তি। অবসর সময়ে দক্ষ সাঁতারুদের অনুশীলনের কৌশলগুলিও গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করেন। তারপর সাধ্যমত নিজে তিনি কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন।

কিছুদিন পর ভালভাবে অনুশীলন করবারও সুযোগ জুটে যায়। ফলে, গুরুর শিক্ষায় তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হতেও দেরী হয় না।

মাত্র ষোল বছর বয়সে অর্থাৎ জলে নামবার তিন বছরের মধ্যে আমেরিকার জাতীয় প্রতিযোগিতায় উইসমূলার অংশ গ্রহণ করেন। আর, এই অখ্যাত প্রতিযোগীটি পঞ্চাশ এবং ২২০ গজ সাঁতারে বিজয়ী হয়ে প্রখ্যাত হন।

ক্রমে সারা আমেরিকায় তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বসূরীদের সকল রেকর্ড ম্লান করে তিনি এক নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করে নিজের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৪ সনের অলিম্পিকের সাঁতারের প্রতিযোগিতায় তিনি যে তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন—সে বিজয় গৌরবে তিনি আজও অদ্বিতীয়।

চার বছর পরে আমস্টার্ডাম-এ যে অলিম্পিক অনুষ্ঠানটি হয়—সেখানে উইসমূলার ১০০ মিটার সাঁতারে তাঁর আগেকার রেকর্ড ভেঙ্গে আবার নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে এবারেও বিজয়ের জয়মালা রূপে সেই দুর্লভ স্বর্ণপদকটি লাভ করেন।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৯ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

আধ মাইল পর্যন্ত সাঁতারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উইসমূলার ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। একটি দু'টি নয় অন্যূন সাতষট্টিটি সাঁতারের অভূতপূর্ব রেকর্ডের গৌরব তিনি লাভ করেছিলেন।

জলের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে উইসমূলার ছায়াছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রেও অগণিত দর্শকের চিত্ত জয় করতে তাঁর দেরী হয় না। টার্জনের বিভিন্ন ছবিতে তাঁর অনবদ্য অভিনয় একদিন সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক, ১৯১৮—

আমেরিকার এই নারী সন্তরণ-সম্রাজ্ঞী সর্বজনশ্রদ্ধেয়া।

মাত্র ছ' বছর বয়সে তাঁকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। তাঁর দশ বছর বয়সের সাফল্যে শ্রীমতীর প্রতিভা সম্বন্ধে কারুর মনে আর কোন দ্বিধা থাকে না।

তখনও তাঁর তের বছর পূর্ণ হয়নি, এই সময় আমেরিকার জাতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী ফ্লোরেন্স অবিশ্বাস্য ভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে আমেরিকার চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর সহজ ভাবেই সামুদ্রিক ম্যারাথন সাঁতারে তিনি সাত বার বিজয়িনী হন। প্রশান্ত মহাসাগরের বুক চিরে পার হতেও এই পটীয়সীর আটকায় না।

দীর্ঘ উনিশ বছর শৌখিন সাঁতারের পর শ্রীমতী পেশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেন। চলচ্চিত্রেও তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। নামের সঙ্গে অজস্র অর্থও উপার্জন করতে থাকেন।

তবুও আরও নাম আরও অর্থের জন্য তিনি ব্যাকুল হন। দূরপাল্লা সাঁতার তাঁকে হাতছানি দেয় নিয়ত।

তারপর আসে সেই স্মরণীয় দিন—৮ই আগস্ট, ১৯৫০ সন। শ্রীমতী

ফ্লোরেন্স ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেলে রাত দু'টা সাইত্রিশ মিনিটে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পঁচিশ বছর পর এই দ্বিতীয় মহিলা অবলীলাক্রমে চ্যানেলটি অতিক্রম করেন। আগেকার মহিলার চেয়ে ফ্লোরেন্স এক ঘণ্টা আট মিনিট কম সময়ে উৎরে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এক বছর পরে তিনি উল্টো পথে ঐ চ্যানেলটি অতিক্রম করেন। পৃথিবীতে একমাত্র তিনি দু'দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেলটি অতিক্রম করার গৌরব অর্জন করেছেন। এই সাফল্যেও শ্রীমতী ফ্লোরেন্সের মন ভরে না। আরও কিছু অসম্ভব সম্ভব করার কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হন।

১৯৫২ সন। ক্যাটালীনা দ্বীপ থেকে লস এঞ্জেলস-এর চব্বিশ মাইলের খরস্রোতা প্রবাহিণী মাত্র আঠারো ঘণ্টায় সাঁতরে পার হন।

এবার নামের মোহে শ্রীমতী যেন উন্মাদ হয়ে ওঠেন। পরের বছর বস্ফোরাস প্রণালী দিয়ে সাঁতরে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় পার হয়ে আসেন। তাতেও তিনি তৃপ্ত হন না। আরও কম সময়ে বিপরীত দিক থেকে ঐ দীর্ঘ মারাত্মক প্রণালী সাঁতার কেটে আসেন।

এই মহিলার বিস্ময়কর কীর্তি তখনও শেষ হয়নি। ১৯৫৩ সনে বিভীষিকাময় জিব্রাল্টার-প্রণালীর বুক কেটে যেদিন তিনি উত্তর আফ্রিকা পৌঁছুলেন সেই দিন সারা বিশ্ব শ্রীমতী ফ্লোরেন্সকে দ্বিধাহীন চিত্তে সন্তরণ-সম্রাজ্ঞী হিসাবে বরণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কিছুদিন আইনবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপর একসময় কম্পটোমিটার অপারেটার বৃত্তি গ্রহণ করতে তিনি স্থির করেন।

সাঁতারের শিক্ষা গুরু হিসেবে শ্রীমতী তাঁর খুল্লতাতের নামই উল্লেখ করেন।

গেট্রু‌ড ইডার্লি

এই আমেরিকান মহিলা দূরপাল্লা-সাঁতারের জননী হিসাবে প্রখ্যাতা। ইনিই প্রথমে বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করেন, পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাও সাঁতারে কিছু কম দক্ষ নয়।

সকল কালের পূর্বসূরীদের সময়ের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে শ্রীমতী ইডার্লি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র চোদ্দ ঘণ্টা একত্রিশ মিনিট। সময়টা ছিল ১৯২৬ সন। তাঁর এই কৃতিত্বে বিশ্ববাসী সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। আর, ঐ বিস্ময়কর সাফল্যের পর শ্রীমতী ইডার্লি স্বদেশে ফিরবার পর যে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তা আমেরিকায় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

নিউ ইয়র্কের সাধারণ ঘরের এই মেয়েটি শৈশবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে কাটাতেন। নিজের খেয়াল খুশি মতোই দীর্ঘদিন জলে দাপাদাপি করতেন। কোন নিয়ম শৃঙ্খলা তাঁর জানা ছিল না, তা জানবার সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন।

ঘটনাচক্রে একসময় স্থানীয় মহিলাদের সাঁতার ক্লাবে শ্রীমতী অনুপ্রবেশ করেন। এবার শুরু হয় তাঁর অনুশীলন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।

তখন তাঁর বয়স চৌদ্দর বেশী নয়। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা-বাসিনীদের মধ্যে প্রচলিত আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় সেবার শ্রীমতী ইডার্লিও অংশ গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল উক্ত দু' দেশের শ্রেষ্ঠ অন্যূন পঞ্চাশজন সন্তরণ-পটীয়সী। তবুও তাঁদের সকলকে এই নাম-না-জানা তরুণীটির প্রতিভার কাছে হার মানতে হয়। বিজয়িনী শ্রীমতী স্বদেশ ও বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্রমে স্বল্প-পাল্লার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও শ্রীমতীর খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রি-স্টাইলে ১০০—৮০০ মিটার পর্যন্ত সকল বিভাগেই তিনি বিশ্ব-রেকর্ড করার গৌরব অর্জন করেন।

নিঃসন্দেহে চ্যানেল সাঁতার বা দূরপাল্লার প্রচেষ্টায় শ্রীমতী ইডার্লি বিশ্বের মহিলাদের পথিকৃৎ।

মুষ্টিযুদ্ধ

মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং পৃথিবীর এক অতি প্রাচীন ক্রীড়া। খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ১৭৬০ বছর পূর্বে মেসোপটেমিয়ায় এ খেলা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।

খৃষ্টজন্মের ন' শত বছর আগে গ্রীস দেশের রাজা এগাসের পুত্র থেসাস এক পাশবিক মুষ্টিযুদ্ধের প্রবর্তন করেন—

সে-খেলার রীতি অনুসারে দুই যোদ্ধা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসতো, খুব কাছাকাছি। নির্দেশ পেতেই একজন অপরজনকে ঘুসি মারতে শুরু করতো অত্যন্ত হিংস্রভাবে। এমনি ভাবে ঘুসি খেতে খেতে দু'জনের একজন একেবারে মরে না যাওয়া পর্যন্ত সেই নিষ্ঠুর খেলার অনুষ্ঠান শেষ হতো না।

রোমানরা গ্রীস দেশ জয় করতে রোমদেশে এ খেলাটি প্রচলিত হয়। সেই বীভৎস রূপে নয়, মার্জিত অবস্থায়—ঠিক খেলা হিসাবেই। তার বহু বছর পরে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে খেলা হিসাবে মুষ্টিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

খেলাটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯০৪ সনে।

ভারতবর্ষে এ খেলা শুরু হয়েছিল ইংরেজরা এ দেশে আসবার কিছুকালের মধ্যে এবং ভারতীয় দল অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করে স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরের বছর, ১৯৪৮ সনে, লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে।

যাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিক—

জ্যাক জনসন, ১৮৭৮—১৯৪৬

হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে নিগ্রো মুষ্টিকদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় একচেটিয়া। এ

কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। আর, সেই বীরদের মধ্যে বিশ্বজয়ীর গৌরব প্রথম অর্জন করেন জনসন, ১৯০৮ সনে। তাঁর অবিস্মরণীয় জয়যাত্রার কাহিনী উত্তরসূরীদের এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ দীর্ঘ সাত বছর ঐ শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান বজায় রাখতে কৃষ্ণাঙ্গ জনসনকে যে দারুণ লাঞ্ছনা জীবনে সইতে হয়েছে বা যেমন কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়েছে তা অন্য মুষ্টিকদের কল্পনাতীত, অবিস্মরণীয়।

মোট নব্বইটি লড়াইতে জনসন অংশগ্রহণ করে একত্রিশবার নক আউটে এবং পঁয়ত্রিশবার ডিসিসনে জয়ী হন; পাঁচটি ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত হয় না এবং চৌদ্দটির বেলায় কোন ফলাফল ঘোষিত হয় না। ১৮৯৯ সনে তিনি পেশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেন।

টনি বার্নস তখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিক। বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর। ১৯০৮ সনে সিডনীর কাছে এক প্রতিযোগিতায় জনসন এর মুখোমুখি দাঁড়ান। দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। চৌদ্দ রাউণ্ডের সময় জনসনের বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টির আঘাত খেয়ে বার্নস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আর উঠতে পারে না।

তাঁর এই সাফল্য শ্বেতাঙ্গের দল সহ্য করতে পারে না। ফলে, দেশে ফিরতে জনসনকে প্রকাশ্যে নানা বিদ্রূপ, উপহাস শুনতে হয়। তিনি নীরবে সহ্য করেন। কিন্তু আপন সংকল্পে অটল থাকেন। একে একে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ তিন জন মুষ্টিকের গর্ব খর্ব করেন জনসন।

এবার ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ মুষ্টিকগণ মিলিত ভাবে জনসনকে জব্দ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। কোন ফল হয় না। সেই সব শ্রেষ্ঠ মুষ্টিকগণকে জনসনের হাতে একে একে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হতে হয়।

তাঁর এই বিস্ময়কর সাফল্যে সারা বিশ্ব যখন মুখর হয়ে ওঠে, সে সময় জনসনের স্বদেশে টেঁকা দায় হয়। নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। রাস্তায় স্বচ্ছন্দে চলাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত রাজরোষ এড়াবার জন্য ১৯১৩ সনে তাঁকে ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে হয়। স্বদেশ ছেড়ে গিয়েও তিনি মনে শান্তি পান না; দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে।

অবশেষে অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে জনসন দীর্ঘ সাত বছরের বহু কষ্টে অর্জিত সেই বিশ্বজয়ের খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হন। ১৯১৫ সনে তিনি স্বেচ্ছায় সেই তুর্লভ খেতাব ত্যাগ করেন, তাঁর কাছ থেকে তা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

তবুও তিনি মুক্তি পান না। রাষ্ট্রের কূট চক্রান্তে পুরো এক বছরের কারাবাসের গ্লানিকর জীবনও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।

টেক্সাসের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। অত্যন্ত তুঃস্থ অবস্থার মধ্যে ছেলেবেলা কাটলেও বালক জনসনের স্বাস্থ্য এবং দেহের শক্তি ছিল লোকের ঈর্ষার বস্তু। শৈশব থেকে মুষ্টিযুদ্ধের ওপর তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। কি করে তিনি কলা-কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন বলা শক্ত। তবে তাঁর ষোল বছরের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখে সকলেই চমৎকৃত হয়।

মদ এবং সিগারেট তিনি পছন্দ করতেন না। রোজ অন্যূন দশ মাইল তিনি হাঁটতেন। সপ্তাহে তু' তিনদিনের বেশী তিনি অনুশীলন করতেন না। যেমনি তু'হাতে উপার্জন করেছেন জনসন খরচও করেছেন তেমনি মুক্তহস্তে। শুধু নিজের প্রয়োজনে নয়, আত্মীয় অনাত্মীয়দের জন্যও। এক মোটর তুর্ঘটনায় মর্মান্তিক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

জ্যাক ডেম্পসী, ১৮৯৫—

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিকগণের মধ্যে যিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হৃদয় জয় করেছেন তিনি জ্যাক ডেম্পসী। ১৯১৯ থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত হেভিওয়েটে বিশ্বজয়ী মুষ্টিক ইনি।

সে সময়কার বিশ্বজয়ী মুষ্টিক জেস উইলার্ডের উচ্চতা ছিল

ডিম্পাসের থেকে ছ' ইঞ্চি বেশী, তাঁর ওজনও ছিল সত্তর পাউণ্ড বেশী। তবুও মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে ডিম্পসে এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরের মুখোমুখি দাঁড়াতে দ্বিধা করেন না। উইলার্ড ডিম্পসের বজ্রমুষ্টির আঘাত বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেন না, রক্তাক্ত চোখে-মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ডিম্পসে বিশ্ববিজয়ীর মুকুটটি প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন।

সেই থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর ঐ শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবকে অম্লান রাখতে ডিম্পসেকে ছ'বার ছ'জন বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এ সময়ের মধ্যে ১৯২৩ সনে ডিম্পসেকে দু'বার অর্থাৎ টমি গিবন এবং ফিরপো-র বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই করতে হয়।

এক সময় নানা প্রতিকূল অবস্থার আবর্তে পড়ে প্রায় তিন বছর ডিম্পেস কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি, অনুশীলনও না। ফলে, জিন টানের-এর কাছে তাঁর বিশ্ববিজয়ের সম্মান হারাতে হয়। অবশ্য, পরের বছর তিনি আবার এই টানেরকে সপ্তম রাউণ্ডেই ধরাশায়ী করে হৃতগৌরব উদ্ধার করেন।

ডিম্পসে পেশাদারী প্রতিযোগিতায় মোট ৬৯ বার অংশ গ্রহণ করে ৪৭টি নক আউট, ৭টি ডিসিশন এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বার অন্যায় আক্রমণের জন্য বিজয়ী হন ; চারটি ক্ষেত্রে কোন মীমাংসা হয়নি, আর পাঁচবার রেফারী কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেননি।

পেশাদারী জীবনে ডিম্পসে অন্যূন পাঁচ লক্ষ ডলারেরও বেশী উপার্জন করেন। কিন্তু বেহিসাবী স্বভাবের দরুণ প্রায় কিছুই সঞ্চিত থাকে না।

সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করে ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনে তিনি রেফারীর বৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু অর্থের প্রয়োজনে আবার তাঁকে পেশাদারী প্রদর্শনীতে নামতে হয়। সাঁইত্রিশ বছরে তিনি উপলব্ধি করেন, এবার তাঁকে মোহমুক্ত হতে হবে। তিনি পুরোপুরি অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর আসল নাম উইলিয়াম হ্যারিসন ডিম্পসে। কলোরাডোর অন্তর্গত মোনাসাতে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। অনাহারে অর্ধাহারে তাঁর শৈশব যা-হোক করে কাটে। তারপর বালক বয়সেই জীবিকার জন্য তাঁকে নানা জায়গায় হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়।

এমনি ভাবে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এক সময় এক জুয়োর আড্ডায় এসে বালক ডিম্পসে হাজির হন। দু'বেলা নিশ্চিত আহারের লোভে এ জায়গাটিতে তিনি থাকতে স্থির করেন।

একদিন সেখানে ছ' জন মিলিত ভাবে ডিম্পসেকে কটূক্তি করে। ডিম্পসে সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিক্রমে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অল্প সময়ের মধ্যে তারা সকলে নেতিয়ে পড়ে। এদের মধ্যে জ্যাক কার্নস নামে লোকটিও ডিম্পসের প্রচণ্ড ঘুঁষিতে ঘায়েল হলেও— ডিম্পসের শক্তি এবং মুষ্টিযুদ্ধের কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়।

ক্রমে ডিম্পসের কাছে থেকে সে জানতে পারে জীবনে তিনি মুষ্টিযুদ্ধের কোন অনুশীলন করেননি। তাঁর ঐ জন্মগত প্রতিভায় কার্নস স্তম্ভিত হয়। এরই চেষ্টায় ডিম্পসে মুষ্টিযুদ্ধে উপযুক্ত শিক্ষা পান। সেই সঙ্গে ডিম্পসের কঠিন অনুশীলন এবং অক্লান্ত সাধনার ফল হিসেবে তিনি উত্তরকালে হন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিক। আর, কার্নস ডিম্পসের ম্যানেজার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে।

হেনরী আর্মস্ট্রং, ১৯১২—

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে হেনরী আর্মস্ট্রং এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা যিনি ফেদার ওয়েট, ওয়েল্টার ওয়েট এবং লাইট ওয়েট, তিনটি বিভাগেই বিশ্বজয়ীর গৌরব লাভ করেছিলেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে এই ত্রি-সম্মান অর্জন করে বিশ্ববাসীকে তিনি স্তম্ভিত করেছিলেন। এ সম্মানে আজও তিনি অদ্বিতীয়।

কুড়ি বছর বয়সে তিনি প্রথমে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে চোদ্দটি প্রতিযোগিতার মধ্যে এগারটিতে হেনরীকে বিজয়ী হিসাবে দেখা যায়।

তারপর একে একে ছাব্বিশটি প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে ১৯৩৭ সনের ২৯শে অক্টোবর, ফেদার ওয়েট বিভাগে বিশ্বজয়ীর গৌরব অর্জনের আশায় হেনরী দুর্ধর্ষ পিটার স্যারন-এর মুখোমুখি দাঁড়ান। ছ' রাউণ্ডের বেশী স্যারন দাঁড়াতে পারেনি, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হেনরী ফেদার ওয়েটে বিশ্ববিজয়ী হন।

সাত মাস বাদে ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাধ্যমে সেক্ষেত্রেও তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। ১৯৩৮ সনের ৩১শে মে বার্নিরস-কে পরাজিত করে হেনরী বিশ্ববিজয়ীর জয়মালা গলায় পরেন।

তারপর মাত্র আড়াই মাস বাদে লাইট ওয়েট বিভাগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বীরের আসনটিও অধিকার করেন। এই দুর্লভ ত্রিমুকুট লাভ করবার পর সারা বিশ্ব হেনরীর অসাধারণ প্রতিভার সুখ্যাতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

আমেরিকার সেন্ট লুই শহরের এক কুলী পরিবেশে তাঁর জন্ম। নিতান্ত দরিদ্র নিগ্রো পরিবারের এই ত্রয়োদশ সন্তানটির অনাহারে অর্ধাহারেই শৈশব কাটে। তারপর তের বছরের বালক হেনরীকে একদিন জীবিকার সন্ধানে ঘর ছাড়তে হয়।

দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য তাঁকে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। কখনও বা তাঁর জীবন বিপন্ন হয়। তবুও নিগ্রো ছেলেটির দেহে এক সময় যৌবনের জোয়ার আসে, কোথা থেকে সেই দেহে আসে অসাধারণ শক্তি।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় হেনরী এসে হাজির হয় লস এঞ্জলসে। শ্রান্ত হেনরী এখানেই থাকতে স্থির করেন। যা-হোক করে সেখানে তাঁর দিন কাটে।

একদিন চলার পথে এক জায়গায় লোকের খুব হৈ-চৈ শুনে থমকে দাঁড়ান। ভীড় ঠেলে প্রত্যক্ষ করেন মুষ্টিযুদ্ধের অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠান দেখে তাঁর মনে শিহরণ জাগে। তিনি অনুপ্রাণিত হন। সেই সঙ্গে তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন, তাঁকেও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে। শুরু হয় তাঁর অক্লান্ত সাধনা, ক্রমে জীবনে আসে সিদ্ধি।

অর্থ, সম্মান তিনি অযাচিতভাবে পেয়েছেন, পেয়েছেন বিপুল পরিমাণে। তাঁর খুশি হবার কথা। কিন্তু এমনিভাবে যখন তাঁর জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে হঠাৎ হেনরীর মনে এক আধ্যাত্মিক ভাবের ছোঁয়া লাগে। পার্থিব সবকিছু তাঁর মিথ্যা বলে মনে হয়। নাম যশ অর্থ সবকিছু জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন—সেবার ভেতর হেনরী শান্তির স্বাদ পান।

জো লুই, ১৯১৪—

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুষ্টিক। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৯ সনের পয়লা মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিজয়ী ছিলেন। এই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে জো লুইকে অন্যূন পঁচিশটি কঠিন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর রেকর্ড আজও অম্লান হয়ে আছে।

১৯৩৪ সনে তিনি পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘ ছ' বছরের অপ্রতিহত চল্লিশটি বিজয় অভিযান বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি এনে দেয়।

১৯৩৭ সনের জুন মাস। তখন লুই'র বয়স তেইশ বছর মাত্র। সে সময় হেভিওয়েট বিভাগে ব্রাডকক বিশ্ববিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত। চারিদিকে ব্রাডককের বিপুল খ্যাতি।

একদিন এই নিগ্রো বীর এসে ব্রাডককের মুখোমুখি দাঁড়ান। দু' জনেই অমিতবিক্রমে লড়তে থাকেন। ক্রমে ব্রাডকক দিশেহারা হয়ে ওঠে। ওদিকে লুইর আক্রমণ মারাত্মক রূপ নেয়—ডান এবং

বাঁ হাতে সমান ভাবে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। অষ্টম রাউণ্ডে ব্রাডকক আর টাল সামলাতে পারে না, লুটিয়ে পড়ে। বয়সে সর্বকনিষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বিশ্ববিজয়ীর গৌরব লাভ করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

উনিশ বছর বয়সে লুই প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম বারের পরাজয়ের গ্লানি কিন্তু তাঁকে নিরাশ করে না, দ্বিগুণ উৎসাহে কঠিন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তৈরী করতে থাকেন। এবং পরের বছর তাঁর সুনাম ক্রমে ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এক অশিক্ষিত দরিদ্র চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই তাঁর দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। এবং ঐ বয়সেই বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে জীবনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য লুই দৃঢ় সংকল্প করেন। শুধু সংকল্পই নয়, সেই উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কঠিন অনুশীলন করেন।

একদিকে যেমন লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও তিনি অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী, অন্যদিকে ঐ অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও তাঁর হৃদয়টি ছিল দয়ালু।

লুইর চেয়ে বেশী অন্য কোন মুষ্টিক জীবনে উপার্জন করেন নি। পেশাদার বৃত্তিতে তিনি প্রায় ৪৪,৯৫,০০০ ডলার উপার্জন করেছেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক জীবনেও প্রদর্শনীতে অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে কম করে তিনি ৬৪, ৯৮, ০০০ ডলার সংগ্রহ করে সৈনিকদের সাহায্য তহবিলে দিয়েছেন।

জীবনে যে বিপুল অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন তা বেহিসাবী ভাবে খরচ করেছেন অকাতরে; ব্যবসাতেও নষ্ট করেছেন প্রচুর।

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে জো লুইর অবিস্মরণীয় কীর্তি আজও সগৌরবে মাথা উঁচু করে তাঁর জয়গান করছে। নিঃসন্দেহে তিনি নিগ্রো জাতির গৌরব।

মল্লযুদ্ধ

কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো খেলা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ খেলা চেলে আসছে।

অতি প্রাচীন কালে হিংস্র বন্য পশুদের কবল থেকে বাঁচবার তাগিদে বা চলার পথে সেই সব হিংস্র জন্তু জানোয়ারের মুখোমুখি পড়লে তাকে বজ্রমুঠিতে ধরবার কৌশল আয়ত্ত করবার প্রয়াসে মানুষ প্রথমে কুস্তির অনুশীলন শুরু করে।

ভারতবর্ষে-ই প্রথম মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি শুরু হয়েছিল। আমাদের রামায়ণ এবং মহাভারতেও মল্লযুদ্ধের কথার উল্লেখ আছে। মল্লবীর ভীম, ঘটোৎকচ, জরাসন্ধ বা শ্রীকৃষ্ণের নাম আমরা সকলেই জানি।

অন্যদিকে, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে গ্রীস দেশেও মল্লযুদ্ধ প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। ক্রমে গ্রীস থেকে রোমে এ খেলাটি বিস্তার লাভ করে।

অলিম্পিকে প্রথম কুস্তি প্রতিযোগিতা হয় ১৯০৪ সনে। আর, ভারতীয় দল সে প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করে ১৯২০ সনে।

মল্লযুদ্ধে বিশ্বে যাঁরা শ্রেষ্ঠ—

গোলাম পালোয়ান

শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্লবীর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইনিই সর্বপ্রথমে বিশ্বের মল্লযুদ্ধের দরবারে ভারতের গৌরবময় আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গোলাম পালোয়ানের জন্ম হয়েছিল অমৃতসরে। তাঁর পিতা আলিয়া পালোয়ানের নাম ছিল সারা ভারত-জোড়া।

তাঁর শৈশবেই পিতার মৃত্যু হতে গোলাম পিতার উন্নত কলা-কৌশলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। তা হলেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের সন্তান। তাঁর মাতুলরাও ছিলেন শ্রেষ্ঠ মল্লবীর। তাই

শৈশবেই গোলামের মধ্যে মল্লবীর হবার নেশা জাগবে—তা আর বিচিত্র কি ?

মাতুলের উন্নত শিক্ষা আর নিজের একনিষ্ঠ অনুশীলনে অল্পদিনের মধ্যেই গোলাম কুস্তিতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অসাধারণ শক্তি ও ক্রীড়া-কৌশলের কাছে একে একে ভারতের সব শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। কোন লড়াইতে তিনি মাথা নীচু করেন নি।

১৮৯৯ সন। প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক বিচিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। বহু দেশ তাতে অংশ গ্রহণ করে, ভারতবর্ষও।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে সংগীত, শিল্প, এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মল্ল যোদ্ধা হিসাবে গোলামও এঁদের সঙ্গী হন।

সে সময় তুরস্কের বীর ম্যাডরালী ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মল্লবীরদের পরাজিত করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মল্লবীর হিসেবে স্বীকৃত। তিনিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। স্থির হয়, ম্যাডরালী এবং গোলামের মধ্যে লড়াই হবে, যিনি বিজয়ী হবেন—তিনিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বীরের গৌরব অর্জন করবেন।

তিন ঘণ্টা ধরে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। কোন মীমাংসা হয় না। কেউ কারুর কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী নন। একটু বিরতির পর আবার পনেরো মিনিটের খেলার ব্যবস্থা হয়। এবার কিন্তু চার মিনিটের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে গোলামের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। অভিনন্দনে গোলাম দিশেহারা হয়ে ওঠেন।

তাঁর অনুশীলন স্বরু হতো রাত তিনটা থেকে। অন্যূন দু' থেকে তিন হাজার বৈঠক করতেন। আবার বিকেল তিনটা থেকে অনুরূপ অনুশীলন চলতো।

ব্যক্তিগত জীবনে গোলাম ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল, ব্যবহারে মধুর। গৃহী হয়েও তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী।

প্যারিস থেকে বিশ্বজয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে ১৯২০ সনে গোলাম

এই কলকাতায় আসেন। কিন্তু ক'দিন পরে হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হ'তে ভারতের এই বীর সন্তানের জীবন-দীপটি নিভে যায়।

মানিকতলার কবর খানায় গোলামের কবর স্থানটি আজও সকল শ্রেণীর মল্লবীরদের তীর্থস্থান।

বড় গামা পালোয়ান

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্লবীর। ইনিই আধুনিক মল্লযুদ্ধের দরবারে ভারতের গৌরবময় আসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অসাধারণ শক্তি ও কলাকৌশলের গুণে শুধু তিনি নিজে শ্রেষ্ঠত্বের কৃতিত্ব অর্জন করেননি, স্বদেশের উত্তরসূরীদেরও বিশ্বজয়ে উদ্বুদ্ধ করার মূলেও তাঁর অবদান কম নয়।

অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই আখড়ার মাটিই ছিল তাঁর সুখ-আনন্দের উৎস। মল্লযোদ্ধা হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। এ জন্য বালক বয়স থেকেই একনিষ্ঠ সাধনায় তাঁর ত্রুটি ছিল না।

উপযুক্ত গুরুর নির্দেশে অনুশীলন করবার সময়ই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। ক্রমে ঐ শিক্ষানবীশ থাকাকালীনই বিভিন্ন লড়াইয়ে বড় গামা অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। ঐ সময় পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর গোলামউদ্দিনকে পরাজিত করবার পরই বড় গামার নাম ছড়াতে থাকে। ক্রমে ক্রমে অন্য শ্রেষ্ঠ পালোয়ানগণও তাঁর কাছে মাথা নোয়ায়।

১৯১০ সন। এক বিদেশী সার্কাস দলের সৌজন্যে এবার বড় গামা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মল্লবীরদের মুখোমুখি হবার জন্য ইউরোপে পাড়ি দেন।

কিন্তু অবজ্ঞা করে এই কালো আদমীর সঙ্গে লড়বার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। দিন গড়িয়ে যায়। রাগে অপমানে বড় গামার রক্তে আগুন জ্বলে।

একদিন সে-সময়কার আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মল্লবীর ডাঃ বি এফ রোলঁা গামার মুখোমুখি হয়। কিন্তু সকলকে স্তম্ভিত করে মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত প্যাঁচে গামা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাটিতে শুইয়ে দেন। ক্রুদ্ধ রোলঁা গামার সঙ্গে আর একবার লড়তে ইচ্ছুক হতে ব্যবস্থা হতে দেরী হয় না। কিন্তু এবারও অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধত শ্বেতাঙ্গকে কালো আদমীর কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়।

তবুও বিদেশীরা গামাকে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। তারা চক্রান্ত করে দাবী করে, পোল্যাণ্ডের বীর জিবিস্কোকে যদি গামা পরাজিত করতে সক্ষম হয় তবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া হবে। গামা রাজী হন।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে দু'ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে লড়াই চলে, কোন মীমাংসা হয় না। দ্বিতীয় দিনে জিবিস্কো গামার সামনে এসে দাঁড়াতে আর সাহসী হয় না। অগত্যা বড় গামাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর হিসাবে স্বীকার করে তাঁর কোমরে দুর্লভ 'জন বুল' ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ বেল্টটি পরিয়ে দেওয়া হয়।

দেশে ফিরে এবার তাঁর স্বদেশের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রহিম পালোয়ানকে লড়াইয়ে আহ্বান করেন। ১৯১১ সনে এলাহাবাদে এঁদের দু'জনের লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে অমিতবিক্রমে দুই শ্রেষ্ঠ বীরের মধ্যে যুদ্ধ চলে। হঠাৎ রহিম পাঁজরায় আঘাত পেতে আর লড়তে রাজী হন না। ফলে, ভারতীয় কুস্তিগীরের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গুরুজ'টি বড় গামা লাভ করেন। 'রুস্তম-ই-হিন্দ' উপাধির গৌরবও তিনি অর্জন করেন।

শক্তিমান জিবিস্কো সেই পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারছিলেন না। প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ৯২৮ সনে তিনি ভারতবর্ষে ছুটে আসেন। কিন্তু গামার শক্তি এবং বিস্ময়কর কৌশলের কাছে এবারও তাঁকে মাথা নোয়াতে হয়।

স্বভাবে গামা ছিলেন বিনয়ী এবং চরিত্রবান। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মল্লবীরের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

গোবর পালোয়ান, ১৮৯২—

ইনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি মল্লযুদ্ধে বিশ্বজয় করে সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের গৌরব বাড়ান। বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ মল্লবীরের আসল নাম শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ হলেও দেশ বিদেশে 'গোবর পালোয়ান' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

১৯১০ সনে যেবার বড় গামা এবং অন্যান্য পালোয়ানগণ ইউরোপে পাড়ি দেন, গোবর বাবুর বয়স তখন মাত্র সতেরো। ঐ বয়সেই উত্তর-কালে একজন শ্রেষ্ঠ মল্লবীর হবার তাঁরও দুর্বার আশা মনে জাগে। ইনিও চুপি চুপি ওঁদের সঙ্গ নেন। হয়তো ঐ দলের কর্ণধার তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্রেরও উৎসাহ ছিল গোবর বাবুর এ-যাত্রায়।

বড় গামা বিশ্বজয় করে দেশে বিদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এবার গোবর বাবুর মাথায়ও খুন চেপে যায়। দৃঢ় সংকল্প করেন, তিনিও বিশ্বজয়ী হবেন। শুরু হয় তাঁর কঠিন অনুশীলন। অক্লান্ত সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তৈরী করতে থাকেন।

দু' বছর বাদে তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হতে বৃটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ান-শিপ এবং ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য একদিন গোবরবাবু ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

২৭শে আগস্ট, ১৯১৩ সন। স্কটল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বীর জিমি ক্যাম্বেলের মুখোমুখি গোবরবাবু দাঁড়ান। তারপর বাংলার বাঘ রণহুঙ্কারে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পঁচাত্তর মিনিট কঠিন সংগ্রামের পর জিমি তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। গোবর বাবু 'স্কটিশ চাম্পিয়ান' খেলে স্বীকৃত হন।

সাতদিন বাদে এবার তাঁকে ব্রিটিশ এম্পায়ারের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে প্রখ্যাত জিমি এসবের সঙ্গে লড়তে হয়। এডিনবরায় এই অনুষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নীচে ফেলতে গোবরবাবুর পঁয়ত্রিশ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

বৃটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে গোবব বাবু প্যারিসে পাড়ি দেন। এখানকার এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে একে একে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মল্লবীরদের পরাজিত করে তিনি এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

ইউরোপ-বিজয়ীর মুকুট মাথায় পেয়েও গোবর বাবুর তুষ্টি হয় না। বিশ্ব বিজয়ের নেশায় তখন তিনি বিভোর। তাই এগিয়ে যান আমেরিকার পথে। অগাস্ট, ১৯২১ সন। সানফ্রান্সিসকো-তে বিশ্বের লাইট হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান এ্যাড-স্যান্টেলের মুখোমুখি দাঁড়ান বাংলার বীর। সত্তর মিনিট প্রচণ্ড লড়াই চলে দু'জনের মধ্যে। অবশেষে গোবর বাবুর স্বপ্ন সার্থক হয়—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর বলে তাঁর নাম ঘোষিত হয়।

গোবর বাবু প্রখ্যাত পালোয়ান বংশের সন্তান। তাঁর পিতামহ অম্বিকাচরণ গুহ ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান। তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন অম্বিকা বাবুর যোগ্য সন্তান। আর, চৌদ্দ বছর বয়সে ঐ জ্যেষ্ঠতাতের কাছেই হয়েছিল গোবর বাবুর কুস্তির হাতে-খড়ি। তারপর পিতার চেষ্টা এবং উৎসাহে লেখাপড়ার সঙ্গে গোবরবাবু সে-সময়কার শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরদের নির্দেশে অনুশীলন করবার সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন।

এ্যাথলেটিকস

জিম থর্প, ১৮৮৮-১৯৫২

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট। অলিম্পিকের ইতিহাসে জিম থর্পই একমাত্র বীর যিনি একাধারে 'ডেকাথলন' এবং 'পেণ্টাথলন' নামক দু'টি কঠিনতম প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন।

ডেকাথলন : ১০০, ৪০০ এবং ৩৫০০ মিঃ দৌড়, ১১০ মিঃ হার্ডলস, হাইজাম্প, সটপাট, বর্শা ছোঁড়া, পোলভল্ট, ব্রডজাম্প এবং ডিসকাস ছোড়া' ইত্যাদি প্রতিযোগিতার সমষ্টি।

পেন্টাথলন ঃ ব্রডজাম্প, বর্শা ছোঁড়া, ডিসকাস ছোড়া, ২০০ এবং ১৫০০ মিঃ দৌড়-এর প্রতিযোগিতা।

১৯১২ সনে স্টকহলমে পঞ্চম অলিম্পিকের প্রান্তরে জিম থর্প উক্ত দু'টি প্রতিযোগিতায় তাঁর অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে যে-অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করেন তা আজও অন্য কোন ক্রীড়াবিদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু কিছুলোক তাঁর এই দুর্লভ সম্মান সহ্য করতে পারে না। তারা ষড়যন্ত্র করে থর্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে ঃ ঐ অলিম্পিকের প্রতিযোগিতায় যোগদানের পূর্বে পেশাদারী বেস্বল খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন বলে। ফলে, বিজয়ীর স্বর্ণপদকটি থর্পের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। বিজয়ীর তালিকা থেকে তাঁর নামটি মুছে দিতেও কর্তৃপক্ষ দ্বিধা করেন না।

তবুও সোনা সোনাই থাকে। সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায় থর্পের শ্রেষ্ঠত্ব কিছুমাত্র ম্লান হয় না। বিশ্বের ক্রীড়ারসিকদের মনেও নয়।

এই অপ্রীতিকর ঘটনার পর থর্প বেসবল খেলায় পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সন পর্যন্ত থর্প এ খেলা থেকে অজস্র অর্থ উপার্জন করেন।

এ খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করে থর্প রাগবী খেলার সংগঠনে উৎসাহী হন। ঐ খেলার সভাপতির আসনটিই তিনি শুধু অলংকৃত করেন না, ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত আমেরিকার রাগবী খেলোয়াড়-গণের মধ্যমণি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। এ ক্ষেত্রেও তিনি কম উপার্জন করেননি। রাগবী খেলা থেকে থর্প ১৯২৯ সনে অবসর নেন।

ওকলাহামায় তাঁর জন্ম। ডানপিটে শিশু থর্প তিন বছর বয়সেই ঘোড়ার পিঠে বসতো, সাঁতারের প্রতি অনুরাগ প্রায় ঐ বয়সে কম ছিল না। আর, মাত্র দশ বছর বয়সেই একটি দুরন্ত হরিণ শিকার করে থর্প।

একুশ বছর বয়সে তাঁকে পেশাদারী বেসবল দল সাদরে গ্রহণ করে।

দু'বছর বাদে তিনিই আবার রাগবী খেলায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের গৌরব লাভ করেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা উক্ত খেলা দু'টির মধ্যেই সীমিত ছিল না, বন্দুক ছোঁড়া, স্কেটিং, টেনিস, হকি, সাঁতার ইত্যাদি খেলাতেও আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসাবে থর্পের খ্যাতি ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার স্থল ও নৌবাহিনীর মাধ্যমে থর্প স্বদেশের সেবা করেন।

থর্প জীবনে অজস্র অর্থ উপার্জন করেন। তবুও অভাবের তাড়নায় শেষ জীবনে দারুণ কষ্টে তাঁর দিন কাটে।

পাভো নুরমী,

বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে ইনি এক বিস্ময়কর প্রতিভা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট। ১৯২০ সন থেকে পর পর তিনটি অলিম্পিকে দূরপাল্লার দৌড়ের ছ'টি বিভাগে প্রথম স্থান এবং তিনটি বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নুরমী এক অভূতপূর্ব কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আজও অনন্য।

১৯২৪ সনে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দেড় হাজার মিটার দৌড় ৩ মিনিট ৫৩$\frac{৮}{১০}$ সেকেণ্ডে এবং ৫,০০০ মিটার দৌড় ১৪ মিনিট ৩১$\frac{২}{১০}$ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নুরমী একদিকে যেমন উভয় প্রতিযোগিতায় এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন, অন্যদিকে এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ দুই দূরত্বের দৌড়ে বিজয়ী হিসাবে তাঁর নাম অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথমে চিহ্নিত হয়।

পরের বছর তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। ষোলটি বিশ্ব-রেকর্ড এবং আটত্রিশটি বিভিন্ন ট্রাক রেকর্ড সৃষ্টি করতে পৃথিবীর দূর-পাল্লার অদ্বিতীয় বীর হিসাবে নুরমী স্বীকৃত হন।

তিন বছর বাদে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকের সময় দৌড়ের বয়সের

প্রায় শেষ সীমায় তিনি পৌঁছেছেন। তবুও নুরমী ১০,০০০ মিঃ দৌড় মাত্র ৩০ মিনিট ১৮$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ডে শেষ করে আবার এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন, অগণিত দর্শকের আন্তরিক অভিনন্দন কুড়ান।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কি অঞ্চলে তাঁর জন্ম। ন' বছর বয়সেই নুরমীর দৌড়ের প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। অকালে পিতৃবিয়োগ হ'তে সংসারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে আসে। জীবিকার জন্য সারাদিন নুরমীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতো। তখন রাতের অন্ধকারে জনহীন প্রান্তরে দৌড়ের অনুশীলন করতেন। এমনি ছিল তাঁর দৌড়ের দুর্বার নেশা।

১৯১৯ সনে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সেনাবিভাগে নুরমী যোগ দেন। সেখানেও তিনি নিয়মিত ভাবে দৌড়ের অনুশীলন চালিয়ে যান। ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দূরত্বের দৌড়ের প্রতি যেন তাঁর অনুরাগটা বেশী ছিল।

বালক বয়স থেকেই দৌড়ের মান উন্নত করার জন্য নুরমীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। সেই বয়সেই বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টাবিদ্রূপ উপেক্ষা করে নুরমী অনুশীলনের সময় 'স্টপওয়াচ' ব্যবহার করতেন।

আর একটা অদ্ভুত খেয়াল ছিল তাঁর। প্রত্যেক দৌড়ের সময় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের দৌড়ে নুরমী ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের জুতো ব্যবহার করতেন।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের জাতীয় বীর হিসাবে পাভো নুরমী স্বদেশে শ্রদ্ধেয়। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেনি—'অর্ডার অব্ হোয়াইট রোজ' পদবী এবং 'গোল্ড মেডেল অব মেরিট' পদকের গৌরব তিনি অর্জন করেছেন।

জেসি ওয়েন্স, ১৯১৩—

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট। ১৯৩৬ সনে বার্লিন-এ অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে জেসি ওয়েন্স ১০০ মিটার দৌড় ১০·২ সেকেণ্ডে, ২০০

মিঃ দৌড় ২০·১ সেকেণ্ডে, লংজাম্পে ২৬ ফুট ৫$\frac{৫}{১৬}$ ইঞ্চি অতিক্রম করে এবং ৪×১০০ মিটার রিলেতে আমেরিকা-দলকে জয়লাভে সাহায্য করে তিনি চারটি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

সেদিনের জেসির বিশ্বরেকর্ড আজও সগৌরবে মাথা উঁচু করে আছে, কেউ তা ম্লান করতে পারেনি। জেসির দৌড় এবং লংজাম্পের কৃতিত্ব সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড।

দাম্ভিক হিটলার কিন্তু এই নিগ্রো যুবকটির সেদিনের এই সাফল্য সহ্য করতে পারেননি। অন্যান্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে হিটলার করমর্দন করলেও বিজয়ী জেসিকে সামান্য অভিনন্দন জানাতেও তিনি কুণ্ঠিত হন। জেসির সাফল্যে তাঁর গাত্রদাহ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় হিটলার অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন থেকে প্রস্থান করেন।

স্বদেশে ফিরে বিজয়ী জেসী আমেরিকার জনসাধারণ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং সম্বর্ধনা পেলেও দুঃখের বিষয় তিনি কোন রাষ্ট্রীয় সম্মান পান না। তাই মনের দু:খে জেসি পেশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেন।

এক নিতান্ত দরিদ্র চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম। বালক বয়স থেকেই ভাগ্যবিড়ম্বিত জেসিকে জীবিকার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়।

তবুও তিনি এক সময় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। এবং খেলোয়াড় জেসি স্কুলের ট্রাক কোচের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ শিক্ষকের উৎসাহ এবং আগ্রহে জেসি, বিভিন্ন দৌড়ের অনুশীলন করেন।

স্কুল থেকে পাশ করবার আগেই ক্রীড়াজগতে জেসির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, পাশ করবার পর অন্যূন ২৮টি কলেজ থেকে তাঁর কাছে সাদর আহ্বান আসে সে কলেজে ভর্তি হবার জন্য। কোন কোন কলেজ জেসিকে বৃত্তিরও প্রতিশ্রুতি দেয়।

কিন্তু জেসি শেষ পর্যন্ত নিজের দেশে ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৯৩৫ সনের ২৫শে মে দিনটি জেসির জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দিন তিনি নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত পশ্চিম

আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ২২০ গজ দৌড়, ২২০ গজ নীচু হার্ডলস এবং ব্রড জাম্পে নতুন বিশ্বরেকর্ডের কৃতিত্ব দেখান।

১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসে পনেরো দিনের এক শুভেচ্ছা সফরে এসে জেসি ওয়েন্স ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে এ্যাথলেটিকসের উন্নত কলাকৌশল আয়ত্ত করার সম্বন্ধে উপদেশ নির্দেশ দিয়ে যান।

এমিল জ্যাটোপেক, ১৯২২—

তখন পর্যন্ত নাম-না-জানা জ্যাটোপেক ১৯৪৮ সনে অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গনে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে বিজয়ী হয়ে বিশ্বের ক্রীড়ারসিকদের স্তম্ভিত করেন। চার বছর পরে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যথাক্রমে ৫,০০০ এবং ১০.০০০ মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে তিনি আবার বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে সারা বিশ্বে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এবার সময়ের দিক দিয়ে তিনি এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

এই আশাতীত সাফল্য জ্যাটোপেককে দেয় দ্বিগুণ উৎসাহ, প্রেরণা। দু' বছরের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তিনি আটটি বিশ্বরেকর্ডের দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

তাঁর এই অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের জন্য সম্মানও যথেষ্ট পেয়েছেন। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেস তাঁকে 'অর্ডার অব রিপাবলিক' উপাধি দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। পরের বছর স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান—'অনার্ড মাস্টার অব স্পোর্টস' উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। তাঁর চেয়ে বড় কথা, স্বদেশের সকল শ্রেণীর লোকের থেকে তিনি তাদের উপাস্য দেবতার মতো শ্রদ্ধা আর ভালবাসা অর্জন করেন। তিনি হয়ে ওঠেন তাদের সব কিছু কাজের প্রেরণার উৎস।

বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরের জন্ম হয় চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়ার এক সাধারণ চাষী পরিবারে।

স্কুলে পাঠ্যসূচীর মধ্যে বিজ্ঞানের ওপরই যেন বালক জ্যাটোপেকের ঝোঁকটা বেশী ছিল। তা থেকে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার জন্য তাঁর মনে গভীর আগ্রহ জন্মে। অনেকটা তারই ফল হিসাবে দৌড়ের প্রতি তাঁর মনে প্রবণতা দেখা দেয়। শুরু হয় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন। কোন শিক্ষকের নির্দেশ নয়। নিজের আগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত ভাবে তিনি দৌড়ের অনুশীলন করতেন। এজন্য অবশ্য উত্তর কালে তাঁকে বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

তবে দূরপাল্লার দৌড়ের প্রতিই যেন তাঁর আকর্ষণটা বেশী ছিল। ক্রমে তিনি উপলব্ধি করেন, প্রচলিত নিয়মে অনুশীলন করলে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করা মুস্কিল। তাই তিনি নিজের উদ্ভাবিত পথেই এগিয়ে চলেন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে। তিনি আশাহত হন না। বরং তাতে উৎসাহী হন।

১৯৪১ সনে জ্যাটোপেক প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন—১,৫০০ মিটার দৌড়ে এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তারপর চব্বিশ বছর বয়সে প্রাগে অনুষ্ঠিত জাতীয় এ্যাথলেটিকসে ৫,০০০ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতায় জ্যাটোপেক বিজয়ী হন। এরপর থেকে তিনি তাঁর বিজয় নিশান নিয়ে এগিয়ে যান একটির পর একটি কঠিন প্রতিযোগিতা অতিক্রম করে।

খেলাধুলার পূজারী বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট ১৯৫৬ সনের জানুয়ারী মাসে সস্ত্রীক এক শুভেচ্ছা সফরে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনী দৌড় এবং বর্শা ছোঁড়ার খেলা তিনি আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন।

গ্যালিনা জিবিনা, ১৯৩২—

এই রুশ নারী এ্যাথলেটিকস জগতে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ১৯৫২ সনে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক

প্রাঙ্গণে পঞ্চাশ ফুটেরও বেশী দূরে লৌহগোলক ছুঁড়ে বিশ্বরেকর্ডের কৃতিত্ব অর্জন করেন। স্বদেশের খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অনার্ড মাস্টার অব স্পোর্টস' দুর্লভ উপাধির গৌরবও শ্রীমতী জিবিনা লাভ করেন।

বাল্যজীবনে জিমিনা রুগ্না ছিলেন। কিন্তু সেজন্য খেলাধুলার প্রতি তাঁর কম অনুরাগ ছিল না। শারীরিক দুর্বলতা তুচ্ছ করে ঐ বয়সেই তিনি বিভিন্ন খেলার অনুশীলনে মেতে ওঠেন। এ জন্য তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ কম সইতে হয়নি।

সুযোগ পেলেই এ্যাথেলেটদের প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য কিশোরী জিবিনা ছুটতেন। তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করতেন খেলোয়াড়দের কলাকৌশল। সেইসঙ্গে নিজেকে তাদের মতো গড়ে তুলবার সংকল্প করতেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে 'লেনিনগ্রাদ জুভেনাইল স্পোর্টস স্কুল'-এ ভর্তি হতে জিবিনা উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পান। ছাত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠায় গুরু মুগ্ধ হন। শুরু হয় কঠিন অনুশীলন গুরুর নির্দেশে।

বর্শা ছোঁড়াই জিবিনার বেশী প্রিয় ছিল। দু'বছরের মধ্যে সেক্ষেত্রে একজন কুশলী হয়ে ওঠেন। তারপর নতুন স্কুলরেকর্ড করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গুরুর নির্দেশে অনুশীলন শুরু করার তৃতীয় বছর জিবিনা স্বদেশে মহিলা বিভাগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আটটি রেকর্ড সৃষ্টি করে স্বদেশবাসীকে চমৎকৃত করেন। এরপর ক্রমে ক্রমে তাঁর খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫০ সনে জিবিনা প্রথম আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ব্রুসেলসের এই অনুষ্ঠানে আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও জিবিনা হতোদ্যম হন না।

কিছুদিন পর বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-যুব উৎসবে বর্শা ছোঁড়ায় জিবিনা বিজয়ী হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫২ সনে হেলসিঙ্কি

অলিম্পিকেও জিবিনা বর্শা ছোঁড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিজয়ী হতে পারেননি, চতুর্থ স্থান লাভ করেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই এ্যাথলেটিকসের ওপর গভীর অনুরাগ থাকলেও লেখাপড়ার প্রতিও জিবিনার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষাও তিনি সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করেছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুঃসাহসিক অভিযান

মার্কো পোলো (Marco Polo), ১২৫৪-১৩২৪

মধ্যযুগে মঙ্গোলিয়ান সম্রাটের প্রতিপত্তি ও তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের খ্যাতি তখন জগৎজোড়া। তাঁর রাজধানী ছিল চীন দেশের পিকিং শহরে।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কোন ব্যক্তি সে দেশে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করার কথা কল্পনাও করতে পারত না। তাদের কাছে সে দেশটি ছিল এক স্বপ্নের রাজ্য।

কিন্তু দুঃসাহসিক পিতার দামাল পুত্র মার্কো পোলো'র বালক মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ঐ বয়সেই অ-জানা দেশে পাড়ি দিতে তার মনে অদম্য আগ্রহ জাগে।

তারপর সতেরো বছর বয়সে একদিন পিতা এবং খুল্লতাতের সঙ্গে মার্কো পোলো ভেনিস শহর থেকে চীন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

গোড়াতে সমুদ্র পথে সেখানে যাবার ইচ্ছা ছিল তাঁদের। কিন্তু পারস্য উপসাগরে পৌঁছুতে এঁদের মতের পরিবর্তন হয়। এখান থেকে অভিযাত্রীর ছোট্ট দলটি স্থলপথে এগিয়ে চলেন।

পারস্যের মধ্য দিয়ে পামীর উপত্যকা অতিক্রম করে, দুর্লঙ্ঘ্য গোবি মরুভূমি পেরিয়ে—সমস্ত বাধা বিপদ তুচ্ছ করে নির্ভীক যাত্রীদল দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান।

এমনি ভাবে দীর্ঘ চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অবশেষে তাঁরা পিকিং শহরে সম্রাট কুবলাই খাঁ'র রাজদরবারে একদিন হাজির হন, ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

অল্প ক'দিনের মধ্যেই মার্কো পোলো সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। এবং তাঁর অনুগ্রহে মার্কো পোলো রাজদরবারের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হন।

মার্কো পোলোর যোগ্যতা সম্বন্ধে সম্রাটের অনুমান মিথ্যা হয়নি। অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ত করে মার্কো পোলো সম্রাটকে চমৎকৃত করেন।

সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে মার্কো পোলোকে বিভিন্ন সময়ে তিব্বত, উত্তর ব্রহ্মদেশ, কোচিন-চীনদেশ, উত্তর ভারত প্রভৃতি নানা দেশে কূটনৈতিক সফরে যেতে হয়েছিল। একজন বিদেশী নবীন যুবকের পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়!

তিন বছরের জন্য অ্যাঙ্গচো অঞ্চলের তিনি রাজ্যপাল ছিলেন। অনুরূপ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে মার্কো পোলো শুধু অসামান্য নাম যশ-ই লাভ করেন না, বিপুল ঐশ্বর্যও।

তবুও মার্কো পোলো স্বদেশে ফিরবার জন্য এক সময় ব্যাকুল হয়ে উঠেন। কিন্তু সম্রাট তাঁকে ছাড়তে নারাজ।

অবশেষে ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটনাচক্রে মার্কো পোলো সগৌরবে ভেনিস শহরে ফিরে আসবার সুযোগ পান। পিতা এবং খুল্লতাতও তাঁর সঙ্গে ফেরেন। গোড়াতে তাঁর সব উক্তি মিথ্যা বলে মনে করলেও ক্রমে মার্কো পোলো-র বিপুল ঐশ্বর্য দেখে এবং নানা বিচিত্র কাহিনী শুনে সব কিছু মেনে নিতে স্বদেশবাসীর মনে আর দ্বিধা থাকে না।

মার্কো পোলোর এই দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্যের পরবর্তী পাঁচ শত বছরের মধ্যেও আর কোন দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ সেদিকে যেতে সাহসী হননি।

কিছুদিন ভেনিসে কাটাবার পর ১২৯৮ খ্রীঃ জেনোয়ার বিরুদ্ধে মার্কো পোলোকে নৌ-যুদ্ধের অধিনায়কত্ব করতে হয়। কিন্তু এ যুদ্ধে পরাজিত হতে মার্কো পোলো শত্রুদের হাতে বন্দী হন। এই বন্দী থাকাকালীন তিনি এক বন্দী-লেখকের সান্নিধ্যে আসেন। গল্পচ্ছলে তাঁকে মার্কো পোলো চীনদেশের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেন। The Book of Marco Polo তারই ফলশ্রুতি।

এক সময় মার্কোপোলো মুক্তি পেয়ে আবার নিজের দেশ ভেনিস

শহরেই ফিরে আসেন। এবার গৃহসুখের সন্ধানে তিনি বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর বাকী জীবনের ঘটনা অস্পষ্ট।

কলম্বাস (Columbus), ১৪৫১-১৫০৬

অল্পবয়সেই পৈতৃক বৃত্তিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়। হবেই বা না কেন? তাঁতির ছেলের তাঁতি হওয়াই তো স্বাভাবিক রীতি। তখন কে জানত, এই দুঃসাহসিক ছেলেটি একদিন পৃথিবীর অজ্ঞাত অর্ধেক অংশ আবিষ্কার করে বর্তমান সভ্যতার প্রসারে সহায়তা করে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করবে।

ইতালির প্রখ্যাত জেনোয়া শহরে এক তাঁতি পরিবারে তাঁর জন্ম। ক্রিষ্টফার কলম্বাস নামে তিনি প্রসিদ্ধ হলেও, তাঁর আসল নামটি ছিল ক্রিস্টফোরো কলম্বো। আবার, স্পেন দেশে তিনি 'ক্রিস্টবল কোলন' নামে পরিচিত ছিলেন।

পিতার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে বালক কলম্বাসের দৃষ্টি গিয়ে পড়তো জেনোয়া বন্দরের ঘাটে—নোঙর ফেলা জাহাজগুলোর ওপর। কখনও বা তাঁর অজান্তে তাঁত ফেলে পায়ে পায়ে চলে যেতেন সেই ঘাটে জাহাজীদের থেকে দেশবিদেশের বিচিত্র গল্প শুনতে।

এমনিভাবে জেনোয়া বন্দরে জাহাজগুলোর আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে কৌতূহলী কলম্বাসের মনে দুরন্ত বাসনা জাগে,—তিনিও নাবিক হবেন, অজানা সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবেন।

ঐ বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেন, ভাল নাবিক হতে হলে, ভূগোল জানা চাই, চাই জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানও। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ঐ বিদ্যা দু'টি তিনি আয়ত্ত করেন। এর আগে বিদ্যালয়ে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এবং লাতিন ভাষায় কিছুটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ক্রমে এ সত্যটাও তিনি বুঝতে পারেন, শুধু বই পড়েই দক্ষ নাবিক হওয়া যায় না, জলে ভাসা দরকার। সুতরাং ছাত্র-জীবনে সুযোগ

পেলেই কলম্বাস নৌকায় চড়ে পাড়ি দিতেন—উপকূল ধরে দূরদূরান্তে।

আরও কিছুদিন যেতে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে,—পৃথিবী যদি গোল হয় —তাহলে মহাসাগরের ওপারে নিশ্চয়ই আর একটি অংশ থাকবে—আটলান্টিক মহাসাগর ধরে পশ্চিমমুখো গেলে নিশ্চয়ই মাটি পাওয়া যাবে—এশিয়া—সোনার ভারতের মাটি!

কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর মহাসাগর পাড়ি দেবার কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না। সে কথা ভাবতে গেলেও যে-কোন সাহসী বীরের মনেও শিহরণ জাগত। কলম্বাসের মনেও দ্বিধা জাগে। কিন্তু সমুদ্র তাঁকে হাতছানি দেয়। জাহাজগুলো তাঁর কানে কানে অভয় বাণী শোনায়। কলম্বাস স্থির করেন,—তিনি যাবেন সেই দুঃসাহসিক অভিযানে।

সে সময় ইউরোপে পোর্তুগীজরা দুঃসাহসী নাবিকের জাত হিসাবে প্রখ্যাত ছিল। ১৪৭৮ সনে কলম্বাস তাঁর কল্পিত অভিযানে সাহায্য লাভের আশায় তাই প্রথমে গিয়ে হাজির হন পোর্তুগালে।

পোর্তুগাল অধিপতির কাছে প্রবঞ্চিত হয়ে কলম্বাস এবার যান স্পেন দেশে। তাঁর পরিকল্পনায় সেখানকার রাজা ও রাণী দু'জনই মুগ্ধ হয়ে কলম্বাসকে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

কিন্তু দিন গড়িয়ে যায়। কোন ফল হয় না। কলম্বাস অধৈর্য হয়ে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের কাছে কাতর ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

আশ্চর্য, এবার কি ভেবে স্পেনের রাজা এবং রাণী কলম্বাসকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতির ফল হিসাবে কলম্বাস স্পেনের রাজার কাছ থেকে তিনটি ছোট জাহাজ এবং ৮৮ জন নাবিকের নামে ৮৮ জন কয়েদী লাভ করেন।

১৪৯২ সনের ৩রা আগস্ট প্যালোস বন্দর থেকে জাহাজ ক'টি নোঙর তুলে অজানা দুরন্ত সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলে। পাঁচ সপ্তাহ গড়িয়ে যায় কিন্তু চারিদিকের কোথাও কোন কূলের নিশানা কারুর নজরে

পড়ে না, এমন কি কোন পাখিও নয় জলে ভেসে আসা কোন খড়-কুটো বা গাছের ডালও নয়।

ক্রমে নাবিকরা চঞ্চল হয়। তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। তারা মিলিত ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আর কি। কলম্বাস তবুও তাঁর বিশ্বাসে স্থির অবিচলিত থাকেন—নাবিকদের অভয়, আশ্বাস দেন।

অবশেষে অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কলম্বাস শেষ পর্যন্ত মাটির স্পর্শ পান, ১৪৯২ সনের ১২ই অক্টোবর। কলম্বাস দ্বীপটির নামকরণ করেন—সান সালভেডর। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের এশিয়ার ভারতবর্ষ নয় —আমেরিকা।

ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক (Capt. James Cook), ১৭২৮-৭৯

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে নাবিক কুক একদিন পাড়ি দিলেন অজানা প্রশান্ত মহাসাগরের বুক চিরে, দক্ষিণ দিকে। তিনি আবিষ্কার করলেন, প্রথমে নিউজিল্যাণ্ড এবং পরে অস্ট্রেলিয়া। ভৌগোলিক দূরত্ব সংকুচিত হল। ঐ বিরাট উপনিবেশ দু'টি যুক্ত হতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন বেড়ে গেল অভাবিত ভাবে।

ওর্কোসায়ার অঞ্চলে কুক-এর জন্ম। বারো বছর বয়সে একটি মনো-হারী দোকানে শিক্ষানবীশ হিসাবে তাঁকে যোগ দিতে হয়। কিন্তু এই প্রাণবন্ত বুদ্ধিমান বালকটির দোকানদারীতে মন বসে না। দোকানের আরশুলা তাড়াতে আর ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে দু'দিনেই ক্লান্ত হয়ে ওঠেন। সুযোগ পেলেই অদূরে ছোট্ট বন্দরটির দিকে ছুটে যান আর জাহাজীদের কাছ থেকে দেশবিদেশের বিচিত্র গল্প শুনে আত্মহারা হন।

তিনি স্থির করেন, নাবিক হবেন। সঙ্গে সঙ্গে টুকিটাকি জিনিষপত্র বেঁধে নিয়ে গিয়ে হাজির হন এক জাহাজের মালিকের কাছে, হুইটবি শহরে। বালক কুক জাহাজে শিক্ষানবীশি করার জন্য মালিকের কাছে

আবেদন করে। কুক আশাহত হন না। এখানে তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর জাহাজে কাজ করে নরওয়ে এবং বালটিক উপসাগরের নানা বন্দরে ঘুরবার সুযোগ পান।

সাতাশ বছর বয়সে তিনি প্রধান খালাসির পদে উন্নীত হন। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ১৭৫৫ সনে রয়াল নেভি-তে যোগদান করেন। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলের জরিপ করবার কাজে তিনি যাত্রা করেন ১৭৬৩ সনে। তাঁর এই সাফল্যে নাবিক কুক কিছু খ্যাতিও অর্জন করেন।

১৭৬৮ সনে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুক চিরে নাবিক কুক এগিয়ে যান। সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের সন্ধান উদ্ধার করে নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন। শুধু আবিষ্কার নয়, সে-অঞ্চলের উপত্যকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠু ভাবে জারিপও তিনি নিজ হতে করেন।

এখানে তিনি একটি প্রণালীও আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এটি কুক-প্রণালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখান থেকে পশ্চিম দিকে আরও এগিয়ে গিয়ে কুক্ অস্ট্রেলিয়ার সন্ধান পেয়েছিলেন।

এই বিজয়-অভিযানের পর ১৭৭০ সনের জুন মাসে কুক স্বদেশে ফিরে এলে নৌ-বিভাগে সর্বাধিনায়ক পদে উন্নতি লাভ করেন।

১৩ই জুলাই, ১৭৭২ সন। ক্যাপ্টেন কুক এবার দু'টি জাহাজ নিয়ে আবার অজানা পথে পাড়ি দেন—দক্ষিণ মেরু অভিমুখে। দুর্লঙ্ঘ্য পথ। তবুও তিনি অদম্য উৎসাহে নির্ভীক ভাবে এগিয়ে যান গন্তব্যস্থলের দিকে।

হঠাৎ প্রবল বিক্রমে ঝড় ওঠে। জাহাজ দু'টি পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবুও অবিচলিত কুক অমিত শক্তিতে এগিয়ে চলেন—

অবশেষে কুক দ্বীপের সন্ধান পান। একে একে তিনি আবিষ্কার করেন—মারকুইস্, ফ্রেণ্ডলি দ্বীপপুঞ্জ— নিউ হিব্রিডেস, নিউ কেলিডোনিয়া, নর্ফোক দ্বীপমালা।

তারপর সাউথ জরজিয়া আবিষ্কার করে দক্ষিণ আত্‌লান্তিক অতিক্রম করে আফ্রিকার উপকূল দিয়ে কুক প্লাইমাউথ বন্দরে ফিরে আসেন, ১৭৭৫ সনের ২৫শে জুলাই।

এই তিন বছরে কুক নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জাহাজে অন্যূন ষাট হাজার মাইল পথ পরিক্রম করেন। সঙ্গীদের মধ্যে মাত্র একজন পথে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, বাকী সকলে সুস্থ শরীরে ফিরে আসে। নাবিক কুকের পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

তিন বছর বাদে কুক আবার এক নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। এবার বেরিং প্রণালীর ভেতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান। ক্রমে তিনি স্যানডুইচ এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছন।—এও তাঁর এক নতুন আবিষ্কার।

ক্রমে ক্রমে কুক আমেরিকা এবং এশিয়ার একেবারে পশ্চিম উপকূল গিয়ে হাজির হন। এখানের আবিষ্কৃত জায়গাটি বন্ধুর নামে নামকরণ করে কুক হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ফিরে আসেন।

এ বিজয় অভিযানের পর স্বদেশে ফিরবার মুখে ঐ উপসাগরের তীরে এক আকস্মিক অপ্রীতিকর ঘটনাচক্রের আবর্তে পড়ে স্থানীয় উপজাতিদের হাতে ক্যাপ্তেন কুক নির্মম ভাবে প্রাণ হারান।

ডেভিড লিভিংস্টোন (David Livingstone), ১৮১৩-৭৩

একদা যে বিরাট আফ্রিকা মহাদেশ ঘন অন্ধকার-রহস্যের আবরণে আবৃত ছিল—তার সেই অবগুণ্ঠন প্রথম উন্মোচন করতে যে সাহসী বীর সকল বিপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি-ই লিভিংস্টোন।

আজ যে-আফ্রিকা সেই অসভ্য-বর্বর-অধ্যুষিত দেশ—এই কুখ্যাতি থেকে মুক্ত হয়ে নবজাগরণের প্রদীপ্ত ঘোষণা প্রচার করে বিশ্ববাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, নিঃসন্দেহে লিভিংস্টোনের ঐ দুঃসাহসিক

অভিযান সবার অলক্ষিতে এই চেতনার বীজ আফ্রিকাবাসীদের ভেতর উপ্ত হতে সহায়তা করেছিল।

গ্লাসগো শহরের উপকণ্ঠে তাঁর জন্ম। দশ বছর বয়সে পিতার নির্দেশে বালক লিভিংস্টোনকে তূলোর কারখানায় যোগ দিতে হয়। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অদম্য। অসাধারণ চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফলে অবকাশ সময়ে তিনি নানা বিষয়ে পড়াশুনা করতেন, লাতিন কাব্যও বাদ যেতো না।

সামান্য উপার্জনের মধ্য থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে তেইশ বছর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য লিভিংস্টোন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

আসলে ঐ বয়সেই তিনি আর্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে স্থির করেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

ডাক্তারীতে স্নাতক হন ১৮৪০ খ্রীঃ। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দু'বছর আগেই লিভিংস্টোন 'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি'র সভ্য-তালিকায় নিজের নাম লিখে আসেন।

১৮৪০ সনের বিশে নভেম্বর লিভিংস্টোন যাত্রা করেন। সাতমাস বাদে তিনি বেচুয়ান্যাণ্ডে পৌঁছান। এখানেই তিনি আস্তানা নেন। শুধু ধর্ম প্রচার নয় গভীর মমতার সঙ্গে তিনি তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের বাঁচবার পথ সহজ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ক্রমে লিভিংস্টোন তথাকথিত অসভ্য বর্বরদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। এখানে দেখতে দেখতে তাঁর ন'বছর কেটে যায়।

এই সময় এক ফাঁকে তিনি বিয়ে করেন। শ্রীমতী ম্যারী ছিলেন তাঁর আদর্শ স্ত্রী।

আফ্রিকার 'লেক নাগামি'-র অবস্থিতি জানবার জন্য লিভিংস্টোন হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জুন দু'জন সঙ্গী নিয়ে সেই অ-জানার উদ্দেশ্যে একদিন পাড়ি দিলেন। বিশাল 'কালাহারী'

মরুভূমি অতিক্রম করে দু' মাস বাদে তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হন। এমনি ভাবে তিনিই প্রথমে 'নাগামি' আবিষ্কার করেন।

অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের আবিষ্কারও লিভিংস্টোনের কীর্তি।

১৮৫৬ সনে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে এলে বিপুল অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করেন; জাতীয় বীর হিসাবে স্বীকৃত হন। কিন্তু গৃহসুখ, স্বদেশের খ্যাতি নাম যশ অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই লিভিংস্টোনকে বেঁধে রাখতে পারে না। তাঁর প্রিয় আফ্রিকার টানে দু'বছর বাদে তিনি আবার ঘরছাড়া হন!

এবার তিনি লেক নায়সা আবিষ্কার করেন। ক্রীতদাস প্রথা দূর করার জন্য সংগ্রাম করেন। পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার দিকে দিকে সভ্যতার জ্বলন্ত মশাল নিয়ে লিভিংস্টোন ছুটে বেড়ান।

আফ্রিকাকে তিনি প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন। সেখানকার মূঢ় অধিবাসীদের সেবায় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ঐ আফ্রিকার মাটিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাত্র ক'জন স্থানীয় অনুচর নিয়ে দীর্ঘ ৩০,০০০ মাইল ঘুরেছেন।

রবার্ট ফ্যালকন স্কট (Robert Falcon Scott)

যুগে যুগে বহু ইংরেজ সন্তান নানা ভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব বাড়িয়েছেন। সে ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী-দের অবদানও বড় কম নয়।

অসামান্য সাহসী রবার্ট স্কট সেই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ; জাতীয় বীর হিসাবে তিনি আজও স্মরণীয়। ইনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বীরগণের প্রেরণার উৎস।

আগস্ট, ১৯০১ সন। জাতীয় দক্ষিণ মেরু অভিযানের অধিনায়ক হিসাবে স্কট যাত্রা করেন। বিশেষ ধরনের তৈরী 'ডিস্‌কভারী' জাহাজটি

লণ্ডন-বন্দর থেকে নোঙর তুলে নিউজিল্যাণ্ডের দিকে তরতর করে এগিয়ে যায়। ক্রমে রস সাগর অতিক্রম করে জাহাজটি এক অজানা দেশে এসে পৌঁছয়। দলপতি স্কট সেখানের নাম-না-জানা দ্বীপ দু'টির নামকরণ করেন—'রস দ্বীপ' এবং ইংলণ্ডের রাজার নামানুসারে—'সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড'।

আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে তাঁরা এসে পৌঁছন তুহিনের দেশে। যতদূর নজর যায়—চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ, সীমাহীন বরফের বিস্তৃত প্রান্তর।

জাহাজটিকে অগত্যা নোঙর ফেলতে হয়। মাত্র দু'জন সঙ্গী নিয়ে স্কট দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন সেই অনন্ত বরফ পথে, দক্ষিণ দিকে।

বীর সৈনিকের মতো সব বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে তাঁরা এক সময় ৮২° অক্ষরেখার সীমান্তে এসে হাজির হন, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০২ সনে। অদূরে স্কটের নজরে ভেসে ওঠে এক বিরাট বরফ-চূড়া। তিনি সন্ধান পান সেই বিশ্ববিশ্রুত 'দক্ষিণ মেরু'র।

এবার তাঁদের পেছনে ফিরবার পালা। জাহাজে ফিরে স্কট এক অভাবিত সমস্যার মুখোমুখি হন: ততদিন তাঁদের জাহাজটিকে বরফে প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে, দীর্ঘ দু'বছর তাঁদের এমনি অসহায় ভাবে ঐ জাহাজটির মধ্যে কাটাতে হয়।

তারপর একসময় একটু সুযোগ পেতে কঠিন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জীবন পণ করে দক্ষিণ ভিক্টোরিয়া প্রান্তর ঘুরে জাহাজটি এক সময় ইংলণ্ডে ফিরে আসে।

এ পথে ফিরবার ফলে, স্কট শুধু অ-জানা ভিক্টোরিয়া অঞ্চলের হদিস পান না, দক্ষিণ মেরুর সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করেন।

তিন বছর তিন মাস বাদে বিজয়ী স্কট স্বদেশে ফিরে এলে অজস্র সম্মান লাভ করেন। তাঁর এই বীরত্বের কাহিনী দেশ-বিদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে।

তাঁর এই অভিযানের অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে—'The

Voyage of the Discovery' ১৯০৫ সনে প্রকাশিত হতে, গ্রন্থটিও যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

স্কট এবার বিয়ে করেন। কিন্তু কঠিনতর অভিযান স্কটকে হাতছানি দিকে ডাকে। গৃহসুখ বা জীবনসঙ্গিনীর মিষ্টি মুখও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। সে-অভিযানের আকর্ষণ দুর্বার।

স্কট দক্ষিণ মেরুতে যাবার কথা ঘোষণা করেন। যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়। খবরটা দেশ-বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

২৮শে নভেম্বর, ১৯১০ সন। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে স্কট সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করেন—

দলপতি স্কটের নির্দেশে ছোট একটি দল এগিয়ে যায়। তারপর শেষ ঘাঁটিতে সকলে এক সময় মিলিত হন। এখান থেকে সেই মরণ-যাত্রা শুরু হয়—৩রা জানুয়ারী, ১৯১২।

জীবন মৃত্যু পণ করে তিনজন সঙ্গী নিয়ে স্কট পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। পথের যেন আর শেষ নেই। প্রাণপণ সংগ্রাম করে চৌদ্দ দিন পরে অবশেষে তাঁরা এসে হাজির হন আকাঙ্ক্ষিত স্থানে —দক্ষিণ মেরুর পাদদেশে।

কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সেখানে একটি পতাকা তাঁদের নজরে পড়তে অভিযাত্রীর দল হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। নরওয়ের জাতীয় পতাকা। ক্রমে তাঁরা জানতে পারেন তাঁদের পৌঁছুবার এক মাস আগে Roald Amundsen সেই বিজয় নিশানটি রেখে গেছেন।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর স্কট সদলে ফিরবার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁরা পা বাড়াতেই হঠাৎ বিক্ষুব্ধ তুষার ঝঞ্ঝা ওঠে। এই উন্মত্ত ঝড়ের সঙ্গে ক্লান্ত অভিযাত্রীদের লড়বার সাধ্য কোথায়? একে একে অসহায় অভিযাত্রীরা সেই তুহিন প্রান্তরের কোলে আশ্রয় নিয়ে জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায়।

তেনজিং নোরগে (Tenzing Norgay), ১৯১৪—

মানুষের অভিযানের শেষ নেই। অজানাকে জানবার আর অচেনাকে চিনবার আগ্রহ চিরন্তন। সেই অদম্য আগ্রহে—বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার পর অবশেষে ১৮৫২ সনে এক বঙ্গসন্তান পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ—এভারেস্ট (২৯,০০২ ফুট), আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০)। কিন্তু এই আবিষ্কারে তার মন ভরে না। ১৯০৭ সন। মানুষ এবার ঐ উত্তুঙ্গ শিখরে ওঠবার দুঃস্বপ্ন দেখে। ক্রমে তাঁর মনে দুর্জয় বাসনা জাগে,—যেমন করে হোক সেই গিরিশৃঙ্গের মাথায় উঠতে হবে। দেশ বিদেশ থেকে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর দল ছুটে আসে হিমালয়ের পাদদেশে।

বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। অভিযাত্রীদের দল একে একে পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। তাদের ভেতর অনেকে ফিরতেও পারেনা, হিমালয়ের কোলে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়। অপরাজিত এভারেস্ট সগর্বে মাথা উঁচু করেই থাকে।

তবুও কিন্তু মানুষের অভিযান শেষ হয় না। এমনি ভাবে একদিন আসে সেই স্মরণীয় দিন। ঐতিহাসিক ২৯শে মে, ১৯৫৩ সন। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে শোনে, মানুষ এভারেস্টের গর্ব খর্ব করে তার চূড়ায় উঠেছে—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসিক বীর তেনজিং নোরগে এবং তাঁর সঙ্গী ইতালির অধিবাসী এডমণ্ড হিলারী।

এক শতাব্দী আগে বাঙ্গলার এক সন্তান পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গটি আবিষ্কার করেছিলেন। আর, ঠিক এক শতাব্দী পরে সেই শৃঙ্গে প্রথম পদক্ষেপ করেন বাংলা মায়ের আর এক রত্ন—তেনজিং।

ন' বছর বয়সে ভাগ্যের সন্ধানে তাঁর জন্মস্থান আর স্বজাতি শেরপাদের তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চলে ফেলে তেনজিং এসে হাজির হন তাঁর স্বপ্নের দেশ দার্জিলিং শহরে। তিনি এখানে স্থায়ী ভাবে ঘর বাঁধেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শেরপা তেনজিং-এর মন হতাশায় ভরে

ওঠে। যা-হোক করে দার্জিলিং-এর নোংরা বস্তীতে তাঁর দিন কাটে। এমনিভাবে দশ বছর গড়িয়ে যায়।

এমন সময় খবর আসে একদল অভিযাত্রী যাবে হিমালয় পর্বতে। তাদের মাল বয়ে নিয়ে আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন হয় ক'জন শেরপার। তেনজিং নিজের নাম লেখায় সেই কুলির দলে।

এই অভিযাত্রী দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তরুণ তেনজিং-এর উদ্দেশ্য কিন্তু [illegible] হয় না, পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

এমনিভাবে নানা অভিযাত্রীদের সঙ্গে তেনজিংকে কুলি হিসাবেই যেতে হয়। ১৯৩৫ সনে এরিক শিপটনের সঙ্গেও অভিজ্ঞ তেনজিংকে ঐ কুলি হিসাবেই যোগ দিতে হয়েছিল।

১৯৩৮ সনে ভাগ্যদেবী তেনজিং-এর প্রতি কিছুটা প্রসন্ন হন। এবারের অভিযাত্রী দলের নেতা টিনম্যান প্রথম তেনজিংকে একজন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেন। আর, সেবার তেনজিং ২৬,০০০ ফুট উঠে সকলকে স্তম্ভিত করেন।

১৯৫২ সন। রেমণ্ড ল্যাম্বেয়ার-এর নেতৃত্বে আসে সুইজারল্যাণ্ড থেকে একদল। ২৪শে মে তেনজিং এবং ল্যাম্বেয়ার ২৮,২১০ ফুট পর্যন্ত উঠে যান। ল্যাম্বেয়ার ধুঁকছেন! তেনজিং-এর কিন্তু তখনও অদম্য উৎসাহ, উপরে উঠে যেতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হয়তো সেদিনই তেনজিং ভারতের জাতীয় পতাকা এভারেস্টের চূড়ায় উড়িয়ে এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারতেন। হয়তো সেকথা উপলব্ধি করেই চতুর ল্যাম্বেয়ার তেনজিংকে এগিয়ে যেতে বাধা দেন। অভিযাত্রী দল ফিরে আসে। ওদের সঙ্গে তেনজিংকেও ক্ষুব্ধ মনে ফিরে আসতে হয়।

এমনিভাবে বিজয় গৌরবের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল বলে গভীর মনস্তাপে তেনজিং-এর দিন কাটছিল।

প্রায় বছর গড়িয়ে যেতে আবার একদল অভিযাত্রীর দল এসে হাজির হয় তেনজিং-এর কাছে। দলপতি কর্ণেল হাণ্ট তেনজিংয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

গত বছরের গ্লানি তখনও তেনজিংকে পীড়া দিচ্ছিল। তাই তিনি রাজী হন দুটি সর্তে: 'যদি আমি সুস্থ থাকি তবে ঐ চূড়ায় উঠতে প্রথমে আমাকে সুযোগ দিতে হবে; আর, সেখানে উঠতে পারলে ঐ শীর্ষচূড়ে আমাকে আমার তিনরঙা জাতীয় পতাকা ওড়াতে দিতে হবে'।

দলপতি হাণ্ট বিলক্ষণ জানিতেন, এই শার্দূলকে বাদ দিয়ে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা অসম্ভব। তাই তিনি তেনজিংয়ের সর্ত মেনে নেন।

১০ই মার্চ, ১৯৫৩ সন। অভিযান শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে নানা মরণ-বাধা অতিক্রম করে অষ্টম তাঁবুটি পড়ে ২৮,০০০ ফুট উচ্চ শৃঙ্গে।

২৯শে মে, ভোর ৬'৩০ মিঃ। তেনজিং এবং সঙ্গী হিলারী আবার যাত্রা শুরু করেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তবুও তাঁরা এগিয়ে যেতে প্রাণপণ সংগ্রাম করেন। হঠাৎ পা ফসকে হিলারী মৃত্যু গহ্বরে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তেনজিং নিজের জীবন তুচ্ছ করে ক্ষিপ্র গতিতে তাঁর মাথায় হিলারীর কোমরের দড়িটি জড়িয়ে সঙ্গীর প্রাণ বাঁচান।

ক্রমে অক্সিজেন ফুরিয়ে আসে। শ্রান্ত বীর দু'জন প্রাণপণে তিল তিল করে উপরে ওঠেন।

অবশেষে তেনজিং একসময় এভারেস্টের গর্ব খর্ব করেন, হিলারীও যা-হোক করে শীর্ষে ওঠেন। কিন্তু তিনি দাঁড়াবার শক্তি পান না।

তেনজিং প্রাণভরে একবার চারদিক চেয়ে দেখে পকেটের কেক বিস্কুটের টুকরো ছড়িয়ে দেন। তারপর পরমানন্দে ওড়ান ভারতের তিনরঙা জাতীয় পতাকা। ক্রমে ওড়ে—রাষ্ট্রসঙ্ঘের পতাকা, ব্রিটিশ পতাকা আর নেপালের জাতীয় পতাকা। হিলারী এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে জড়িয়ে ধরেন তেনজিংকে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হয়, নিবিড় আলিঙ্গনে।

তেনজিং বর্তমানে দার্জিলিংয়ে-'হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইন্সটিটিউটে' প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেশ-নায়ক ও সমাজ-সংস্কারক

গৌতম বুদ্ধ (Gautam Buddha), ৫৬০-৪৮০ খৃঃ পূঃ

দেশ তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার-বিচারের কঠিন অনুশাসনে জর্জরিত। যজ্ঞের নামে পশু-হিংসার অবাধ বিলাসে ব্রাহ্মণরা উন্মত্ত। ঠিক এমনি সময় আবির্ভূত হলেন তথাগত ভগবান বুদ্ধ।

শুধু কাশ্মীর হ'তে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের অধিবাসীকেই নয়, সমগ্র মানব জাতিকে বুদ্ধদেব শোনালেন অমৃতের বাণী, দেখালেন জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার পথ—নির্বাণের সন্ধান।

বুদ্ধদেব বললেন,—মানুষ আসক্তি বা কামনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বার বার জন্মগ্রহণ করে। আর, জন্মগ্রহণ করলেই মানুষকে ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, আত্মীয়বিয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভের দরুণ দুঃখ ভোগ করতে হবে।

তিনি আরও বললেন,—অবিদ্যা বা অজ্ঞতাই সকল দুঃখের কারণ; অবিদ্যাকে বিনাশ করতে হবে সংস্কার ক্ষয় করে। এই দুঃখভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় জন্মগ্রহণের দায় হতে মুক্তিলাভ বা 'নির্বাণ' প্রাপ্তি।

তাঁর মতে—সম্যক্ দৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি এই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা পথ অনুসরণ করলে মানুষ সকল প্রকার ক্লেশ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

এ ছাড়া, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি এবং অকারণ পরনিন্দা হ'তে বিরত থাকার উপদেশও তিনি দিয়েছিলেন।

ভারতের এই বিশাল সীমা অতিক্রম করে প্রায় সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের প্লাবন বিস্তৃত হয়েছিল সেদিন।

কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী বনে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্যবংশীয় রাষ্ট্রনায়ক। জন্মের অল্পকাল পরেই মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হলে তিনি বিমাতা ও মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর দ্বারা পালিত হন।

আবাল্য ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হলেও ক্রমে ক্রমে পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর মনে অনীহা জাগে। তারপর একসময় একজন জরাগ্রস্ত, একজন ব্যাধিগ্রস্ত এবং একটি শবদেহ দেখে—মনুষ্য জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা উপলব্ধি করে তিনি চমকে ওঠেন।

আরও কিছুদিন পরের কথা। এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপের পর সিদ্ধার্থ সংসারের মায়া ত্যাগ করতে স্থির করেন।

ঊনত্রিশ বছর বয়সে পুত্র রাহুলের জন্ম হলে তিনি আর সংসারে সময় নষ্ট করেন না। একদিন রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করেন। মহাভিনিষ্ক্রমণ।

তারপর দীর্ঘ ছ' বছর কঠিন তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মহাজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যে অশ্বত্থদ্রুমের নীচে বসে তিনি সা: নায় মগ্ন ছিলেন উত্তরকালে সেটি বোধিদ্রুম নামে খ্যাত; আর, সেই উরুবিল্ব বন মহাতীর্থ বুদ্ধগয়া নামে পূজিত হয়।

সিদ্ধিলাভের পর বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথক্ষেত্রে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল ধর্মপ্রচার-দ্বারা ভারতবর্ষে বৌদ্ধমত সুপ্রতিষ্ঠিত করে আশী বৎসর বয়সে সমাধিযোগে ভগবান বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধ মতে,—যিনি ধ্যানে জগতের কারণকে অবিদ্যা জেনে সকল দুঃখ হ'তে মুক্ত হয়ে সিদ্ধার্থ হয়েছেন এবং বিমল জ্ঞান লাভ করে যিনি নির্বাণ লাভের পূর্বে নির্বাণের পথ নির্দেশ করেছেন তিনিই বুদ্ধ।

কনফ্যুসিআস (Confucius/K'ung Fu-tzu), ৫৫০-৪৭৯ খৃঃ পূঃ

তাঁকে প্রাচীন চীনের সংস্কৃতির উৎস বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'তোমার নিজের প্রতি যে আচরণ অবাঞ্ছিত বলে মনে কর, সেই আচরণ অপরের প্রতি কখনও ক'রো না'।—এই ছিল মহাত্মা কনফ্যুসিআস-এর মূল নীতি।

ঐ নীতির আদর্শ অনুসরণ করবার জন্য মানুষের মধ্যে যে-সব সদ্‌বৃত্তি আছে, যেমন—আনুগত্য, সংবেদনশীলতা, কর্তব্যে আনুগত্য, সৌজন্য, সংযম এবং হিংসার প্রতি ঘৃণা, সেগুলোকে মানবমনে উন্মেষের জন্য তিনি সারাজীবন অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

তাঁর এই নীতির প্রভাব শুধু চীন মহাদেশে নয়, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বহু দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাঁর আসল নাম ছিল কুঙ্গ ফুটস্যু। অগণিত শিষ্য এবং ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি 'কুঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেশ-বিদেশে অবশ্য কনফ্যুসিআস্ নামে খ্যাত হন।

সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। অতি অল্প বয়সেই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগটা যেন বেশী ছিল।

উনিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। অল্প কিছুদিন পরে রাজদরবারে চাকুরি পান। কাজে তিনি সুনামও অর্জন করেন।

কিন্তু ঐ বয়সেই সমাজের নানা কু-সংস্কার ও অশোভনতার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি সেগুলি দূর করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এমন সময় নিজের কর্মদক্ষতার গুণে তাঁর পদোন্নতি হয়। নিঃসন্দেহে আরও হতো। ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে সব ভেস্তে যায়।

তখন তিনি সব কিছু ছেড়ে সমাজকে সুস্থ ভাবে গড়ে তুলবার জন্য সন্ন্যাসীর মতো এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে দূর দূরান্তে ঘুরে বেড়িয়ে তাঁর নীতির আদর্শে স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

ক্রমে তাঁর অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চলে। এমনি ভাবে দীর্ঘ কাল নানা দেশে তাঁর মতবাদ প্রচার করে তেতাল্লিশ বছর বয়সে কন্‌ফ্যুসিআস নিজের দেশে ফিরে আসেন।

ততদিনে রাজ্যের রাজনীতিতে স্থিতি এসেছে। কন্‌ফ্যুসিআসকে মন্ত্রীপদে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। পঞ্চাশ বছর বয়সে এই মনীষী প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। এবার তাঁর মহান আদর্শ সারা দেশব্যাপী আরও ব্যাপক ভাবে প্রচার করার সুযোগ তিনি পান।

ফলে, দেশে কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, এমন কি সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও চীন দেশ উন্নতি লাভ করে। মহাদেশটি অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলে। সেই সঙ্গে লাঞ্ছিত, অবহেলিতের দল তাদের বিড়ম্বিত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণ ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

তিনি ছিলেন লু রাজ্যের সর্বজনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি কন্‌ফ্যুসিআসের এই জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারে না। মিলিত ভাবে সেসব রাষ্ট্রের প্রধানগণ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, লু অধিপতিকে প্ররোচনা করতেও তারা দ্বিধা করে না। এই হীন চক্রান্তের আবর্তে পড়ে কন্‌ফ্যুসিআস্ দেশত্যাগী হন। দীর্ঘ তেরো বছর তিনি ভবঘুরের মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। কোথাও এতটুকু সহানুভূতি পান না। কোন রাষ্ট্রই এই মহাপুরুষকে বরণ করতে এগিয়ে আসে না।

তবুও তাঁকে আটষট্টি বছর বয়সে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। এবার আর তিনি রাজকার্যে ফিরে যান না। বাকী জীবন এক নির্জন প্রান্তরে ভক্তদের উপদেশ দিয়ে আর সাহিত্য সেবা করে কাটিয়ে দেন। তিনি পাঁচটি পবিত্র গ্রন্থ লিখে গেছেন যেগুলি শুধু চীন জাতির কাছে নয়, বিশ্ববাসীর কাছে অমূল্য রত্ন। তাঁর সমাধিটি একটি তীর্থস্থান বলে চিহ্নিত।

অ্যারিস্টট্‌ল (Aristotle), ৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ

বিশ্বরহস্যের বিপুল জ্ঞান নিয়ে গ্রীস দেশে একদিন যে মহান দার্শনিক জন্মেছিলেন তিনি-ই অ্যারিস্টট্‌ল।

উত্তরকালে এই অনন্যসাধারণ মনীষীর জ্ঞানের জ্যোতি সমগ্র মানবজাতির চিন্তাধারাকে স্পর্শ করেছিল। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ অ্যারিস্টট্‌লকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। নিঃসন্দেহে আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন দার্শনিক পৃথিবীতে এত গভীর এবং ব্যাপক ভাবে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে অ্যারিস্টট্‌লের মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

তিনি সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। বিশেষ করে জীববিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যায় তাঁর অবদান অমূল্য। সামুদ্রিক ও স্থলদেশ সম্পর্কিত জীবনধারণের বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

অ্যারিস্টট্‌ল কিন্তু পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মৌলিক উপাদানে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে,—বস্তুর ধর্ম চার প্রকার: উষ্ণ, শীতল, আর্দ্র এবং শুষ্ক। মাটি, জল, বায়ু ও আগুন বস্তুর চার অবস্থা। বস্তুর প্রকৃতি চোখ দিয়ে দেখা যায় আবার হাত দিয়েও স্পর্শ করা সম্ভব।

তিনি মনে করতেন, পতনশীল বস্তুর গতিবেগ তার ওজনের সমানুপাতিক। অবশ্য গ্যালিলিও-র পতনশীল বস্তু সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত বিশ্ববাসী এঁর এই মতকেই মেনে নিয়েছিল।

তবুও একথা স্বীকার করতে হবে, অ্যারিস্টট্‌ল ছিলেন পরবর্তী কালের জগৎচিন্তার আদি রূপকার। তাঁর সেই ধ্যান-ধারণাই অন্যূন দু'হাজার বছর পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।

মেসিডোনিয়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন রাজপরিবারের চিকিৎসক। বালক অ্যারিস্টট্‌ল পিতার অধীনে চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা

লাভ করে সতেরো বছর বয়সে প্লেটোর বিদ্যালয়ে যোগ দিতে এথেন্স নগরে চলে যান।

প্লেটোর মৃত্যু পর্যন্ত অ্যারিস্টট্‌ল দীর্ঘ বিশ বছর এথেন্স নগরে বাস করেন। তাঁর আশা ছিল, গুরুর মৃত্যুর পর শিক্ষায়তনের অধিকর্তার পদে তিনি মনোনীত হবেন। কিন্তু তিনি আশাহত হন।

এবার তিনি শহরের কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে অধ্যয়নে মন দেন। নানা বিষয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। কিন্তু বেশীদিন নয়। যুবরাজ আলেকজাণ্ডারের শিক্ষার দায়িত্ব নেবার জন্যে অ্যারিস্টট্‌লের ডাক পড়ে।

আলেকজাণ্ডার গুরু অ্যারিস্টট্‌লের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গুরুর শিক্ষার প্রসাদে শিষ্য নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু মহাকবি হোমর যেন তাঁর ওপর একটু বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

শিক্ষা শেষে সম্রাট হবার পরও গুরুর প্রতি আলেকজাণ্ডারের শ্রদ্ধা-প্রীতি এতটুকু কমেনি। একসময় গুরু কোন একটি গবেষণামূলক কাজে ব্রতী হলে, তাঁর সাহায্যের জন্য আলেকজাণ্ডার সহস্র কর্মী গুরুর হাতে তুলে দেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় দুর্লভ পুস্তক-পুস্তিকাও অ্যারিস্টট্‌লের হাতের কাছে এগিয়ে দেন।

আলেকজাণ্ডার এশিয়ার দিকে যাত্রা করলে অ্যারিস্টট্‌ল এথেন্স শহরে দীর্ঘ দিন পরে আবা ফিরে আসেন। এই সময় এথেন্স নগরটি ছিল সারা বিশ্বের সংস্কৃতির পীঠস্থান, পঞ্চাশ বছর বয়সে অ্যারিস্টট্‌ল এখানে একটি বিদ্যালয় খোলেন। তাঁর নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বিদ্যার্থীরা এসে জড়ো হয়।

এমন সময় ব্যাবিলনে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আকস্মিক মৃত্যুতে সারা গ্রীস, বিশেষ করে এথেন্স নগর, চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে তাঁর এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অ্যারিস্টট্‌লের বিরুদ্ধে এক হীন চক্রান্ত শুরু হয়। জীবনহানির আশঙ্কায় অ্যারিস্টট্‌ল পালিয়ে ইরুবোয়িয়া দ্বীপে আশ্রয় নেন। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মার্টিন লুথার (Martin Luther), ১৪৮৩-১৫৪৬

মধ্যযুগে এক সময় ধর্মের গোঁড়ামির ফলে সারা ইউরোপে সাধারণ লোকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ধর্মগুরু পোপ থেকে শুরু করে পল্লীঅঞ্চলের গির্জার পাত্রী পর্যন্ত বিলাস এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন; ব্যভিচার এবং ভোগলালসা হয় তাঁদের স্বাভাবিক আচরণ।

ধর্মের নামে ধর্মগুরুরা লোকের ধন-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে অবাধে আত্মসাৎ করতে থাকেন। ক্রমে এটা হ'য়ে ওঠে যেন তাঁদের সাধারণ দাবী।

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মগুরুগণ মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে পাপমুক্ত হওয়ার এক অভিনব পদ্ধতির প্রচলন করেন। এই পদ্ধতির নাম ইনডালজেনস্।

শুধু কি তাই? কোন চিন্তাশীল লোক নতুন কোন কথা বলতে গেলে তাঁর রেহাই ছিল না। কখনও বা এই জ্ঞানীগুণীদের বিধর্মী বলে ঘোষণা করে তাঁরা জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারতেন।

গোড়াতে যে ক্যাথলিক ধর্মের মহান আদর্শ ছিল—সদাচার ও ত্যাগের, সেই ধর্মগুরুগণ ব্যভিচার এবং ভোগলালসার জন্য হন কুখ্যাত।

কিন্তু তখন এঁদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ: বিত্তে এবং প্রতিপত্তিতে স্বয়ং পোপ ছিলেন রোম-সম্রাটের সমতুল্য। আর, আর্চ-বিশপ, বিশপ প্রভৃতি ছিলেন এক একজন মস্ত জমিদারের মতো। তাই এই প্রভুদের অত্যাচার অসহ্য হলেও তাঁদের সেই জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধে কেউ মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানাতে সাহসী হত না। অসহায় জনসাধারণ নীরবে মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করতো।

ইতালিতে রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে ইউরোপের মানুষ তখন সংস্কারমুক্ত; তারা ঐ গোড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজছিল।

এমন সময় এক নির্ভীক জার্মান দার্শনিক সকলকে স্তম্ভিত করে

এগিয়ে আসেন—নাম তাঁর মার্টিন লুথার। জার্মানীর উইতেনবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক ক্যাথলিক ধর্মের প্রচলিত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

১৫১৭ সনের সেই স্মরণীয় দিনে লুথার 'ইনডালজেনস্' বা দক্ষিণার বিনিময়ে পাপমুক্ত হওয়ার তথাকথিত রীতির বিরুদ্ধে ৯৫টি বাণী সম্বলিত একটি কাগজ গির্জার সদর দরজার ওপর ভাল করে টাঙ্গিয়ে দেন।

ফলে, সারা ইউরোপে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। জার্মান রাজাদের মধ্যে যাঁরা পোপ দশম লিও'র ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাঁরাও প্রকাশ্যে লুথারকে সমর্থন করেন। এমনি ভাবে ক্যাথলিক জগৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়। লুথারকে সমর্থন করে যাঁরা সেদিন পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—তাঁরা প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যাণ্ট নামে পরিচিত হন।

লুথার কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের মৌলিক সত্যকে খর্ব করেননি। তাঁর মতে,—ঈশ্বরের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসের পথেই মানবের মুক্তিলাভ সম্ভব। সেজন্য বিশেষ কোন আচার-নিয়ম পালন করার প্রয়োজন হয় না; দক্ষিণার দ্বারা পাপমুক্তির সনদ ক্রয় করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এছাড়া, জার্মান ভাষায় বাইবেল লিখেও লুথার ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের একচেটিয়া প্রভুত্ব নষ্ট করেন। আসলে লুথারের মতবাদ ক্যাথলিক ধর্মের কঠিন অনুশাসনের বিরুদ্ধে এক সরব প্রতিবাদ।

ক্রুদ্ধ পোপ মার্টিন লুথারকে নিজের কৃতকর্মের জন্য নতি স্বীকার করতে আদেশ করেন। দৃঢ়চেতা লুথার এবার পোপের অনুজ্ঞাকে প্রকাশ্যে অগ্নিদগ্ধ করে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

মার্টিন লুথারের এই নির্ভীক প্রতিবাদ শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ইউরোপের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও এক নবজাগরণের সৃষ্টি করে।

শ্রীচৈতন্য (Sri Chaitanya), ১৪৮৫-১৫৩৩

তখন তন্ত্রের নামে বাংলা দেশে একদিকে যেমন ব্যভিচারের স্রোত বইছিল অন্যদিকে রাজশক্তির প্ররোচনায় মনুষ্যত্বের অধিকারের আশায় হিন্দু সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল।

এমন সময় প্রেম-ধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। তিনি মুক্তকণ্ঠে শোনালেন—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
হরিভক্তি-বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

—হরিভক্তি থাকলে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে পূজিত হয়, আর হরিভক্তি-শূন্য হলে দ্বিজও চণ্ডালাধম বলে নিঃসন্দেহে নিন্দিত। হরিভক্তিই মানুষের মনুষ্যত্বের মান নির্ণয় করে থাকে।

চৈতন্যদেব সমাজের সেই অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বাহুবলে নয়, জাতিধর্মনির্বিশেষে ঐ লাঞ্ছিত অবহেলিত সম্প্রদায়কে প্রেমভরে কোলে তুলে নেন।

তিনি এদের তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করে সংযম ও সদাচারের মধ্যে ফিরিয়ে আনেন। ক্রমে বাংলার তথাকথিত নীচুতলার বিপুল সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে পরিপুষ্ট করে।

ধর্মের এই মহান আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, গণ-উপাসনা এবং মহোৎসব-রূপ সমবেত পানভোজনের রীতি পরস্পরের মধ্যে ধর্ম ও সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ় করে। এমনি ভাবে চৈতন্যদেবের প্রভাবে সেদিনের সেই কুশ্রী হাওয়া স্তব্ধ হয়—উন্মেষ হয় সমাজের জ্ঞান-চক্ষুর, সৃষ্টি হয় মানবিক চেতনার। গড়ে ওঠে—এক বলিষ্ঠ সমাজ।

বাংলা দেশের বাইরেও চৈতন্যদেবের ধর্মের প্রভাব গভীর ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপধামে বাংলার এই বরেণ্য পুরুষের জন্ম। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন একজন সুপণ্ডিত এবং মাতা শচীদেবী ছিলেন স্নেহময়ী জননী। শ্রীচৈতন্যের বাল্য নাম ছিল নিমাই।

বাইশ বছর বয়সে গয়াধামে স্বর্গত পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করে নিমাই ঈশ্বর-প্রেমে গভীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হন। তারপর পরম ভাগবত ঈশ্বরপুরীর নিকট হতে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করে গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে পাগল হয়ে ওঠেন।

একে একে অনেক ভক্ত এসে তাঁর পাশে হাজির হলেন। নগর-কীর্তনে নদীয়া টলমল করে ওঠে। সে প্রেমের বন্যা ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গৌরাঙ্গ তখনও সংসারী। তাই তিনি পণ্ডিতগণের সমালোচনার বস্তু হয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করেন, সর্বস্বত্যাগীর সঙ্গেই হৃদয়ের পুরোপুরি যোগ হতে পারে।

বিশ্ববাসী যাতে অকাতরে তাঁর হরিনাম-সুধা পান করতে পারে, সেজন্য গৌরাঙ্গদেব একদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করেন। পেছনে পড়ে থাকেন—বৃদ্ধা জননী আর তরুণী স্ত্রী।

এ যেন ভারতের দ্বিতীয় বুদ্ধদেব। কিন্তু বুদ্ধের সন্ন্যাস ছিল তত্ত্বান্বেষণের জন্যে, আর এঁর সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল—তত্ত্ব প্রচার করা। প্রেম তত্ত্ব।

তখন গৌরাঙ্গের বয়স চব্বিশ। ভাগীরথী পার হয়ে তিনি কেশব ভারতীর নিকট হতে শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবার থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পরিচিত হলেন; 'নিমাই' নাম লুপ্ত হল।

চৈতন্যদেবের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল—বিনয়ের সঙ্গে কঠোরতার এবং প্রেমের সঙ্গে বৈরাগ্যের অপূর্ব মিশ্রণ।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থ-রত্নটি বৈষ্ণবদের বেদ বা বাইবেল স্বরূপ।

রাজা রামমোহন রায় (Raja Rammohan Roy),

১৭৭৪—১৮৩৩

ভারতের নবজাগরণের উদ্‌গাতা। এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে রামমোহন ভারতীয় জন-জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তন করেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অবদান নানা ভাবে স্বদেশ, সমাজ এবং স্বজাতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

ধর্মক্ষেত্রে—ধর্মের নামে হিন্দুরা যে অপধর্মের প্রতি প্রবণতা দেখাতেন তার বিরুদ্ধে রামমোহন সংগ্রাম করে তাদের সেই গোঁড়ামি ভেঙ্গে দেন। তারপর তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শুভ দিক গ্রহণ করে সেইসঙ্গে বেদান্তের সারমর্মের সংমিশ্রণে এক নব সমাজ—'ব্রাহ্মসমাজ' সৃষ্টি করেন। রামমোহনের প্রবর্তিত এই নতুন ধর্মের বলে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রবাহ স্তব্ধ হয়।

সমাজক্ষেত্রে—তখনকার বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায় তিনি প্রচলিত নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথা রদ করেন। এ ছাড়া, বহুবিবাহ-প্রথা ও জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছেদ এবং হিন্দুনারীর দায়বিধি সংস্কারের জন্যও রামমোহন কম সংগ্রাম করেননি। রাজনীতিক্ষেত্রে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নানা জরুরী আন্দোলনেও রামমোহন ছিলেন পথিকৃৎ।

শিক্ষার জগতে—ইংরেজী শিক্ষা বিশেষ করে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে বিস্তার করে রামমোহন স্বদেশবাসীকে সুসংস্কৃত এবং আধুনিক যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়া, সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর রয়েছে। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নানা ভাবে পুষ্ট করার গৌরবও রামমোহনের।

প্রসঙ্গত, ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই প্রথমে বিলাত যান; শোনা যায়, স্বদেশে ফিরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করবার সংকল্পও তাঁর ছিল।

কিন্তু মহাকাল রামমোহনের সে-ইচ্ছা পূর্ণ করবার সুযোগ দেয়নি। ব্রিস্টলের মাটিতে ভারতের নবজাগরণের এই মহান দীক্ষাগুরু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের আসল উপাধি ছিল—'বন্দ্যোপাধ্যায়'।

দ্বিতীয় আকবর শাহের বৃত্তি হ্রাস হওয়ায় তা পুনরায় বাড়াবার চেষ্টায় 'বোর্ড অব কণ্ট্রোলে' প্রার্থনা জানাবার জন্য তিনি এঁকে ১৮৩০ সনের ১৫ই নভেম্বর বিলাত পাঠান; সেখানে যাবার আগে দিল্লীর সম্রাট রামমোহনকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

পল্লীর পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়ন করে রামমোহন আরবী এবং পারসিক ভাষা শেখবার জন্য পাটনা যান। তারপর সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করতে তিনি কাশী জান। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি উক্ত তিনটি ভাষাতেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উত্তরকালে রামমোহন উর্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক এবং লাতিন ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষাতে তাঁর পারদর্শিতার কথা তো আমরা সকলেই জানি।

১৮০৩ সনে পিতা স্বর্গত হতে রামমোহন সংসারী হন। কিন্তু বিষয়ের আয় থেকে আশানুরূপ উপার্জন না হতে তিনি রংপুরে কালেকটরি অফিসে চাকুরী নেন। অল্পদিনের মধ্যে সেরেস্তাদারের পদে তিনি উন্নীত হন। এই সময় তিনি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হতে, রংপুরের রাজকাজে ইস্তফা দিয়ে রামমোহন কলকাতায় এসে ধর্ম, সমাজ এবং দেশসেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর বিরুদ্ধে অহিন্দুত্বের অভিযোগ সত্যি নয়, 'প্রতিমা সত্য নয়, ঈশ্বর সত্য—সেই ঈশ্বরের শুদ্ধ জ্ঞান উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যে পাওয়া যায়', এই ছিল রামমোহনের ধর্মীয় বক্তব্য।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—নিঃসন্দেহে রামমোহন ছিলেন বর্তমান ভারতের অবিসম্বাদিত স্রষ্টা, হৃদয়ের সার্বভৌম-বৃত্তিতে বিশ্বের মহানাগরিক।

অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln), ১৮০৯-৬৫

আমেরিকার গণতান্ত্রিক-দর্শনের আত্মিক উৎস, স্বাধীনতার প্রতীক। নিঃসন্দেহে লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

উড্রো উইলসনের ভাষায়,—এঁর মধ্যে প্রগতির আদর্শ রূপটি পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রকৃতি তাঁকে এমন একজন আমেরিকান সৃষ্টি করেছেন, যাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে আমেরিকানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা।

জন্মসূত্রে তিনি কিছু পাননি, পেয়েছিলেন শুধু মা'র কাছ থেকে বড় হবার প্রেরণা; সব গুণ তাঁর নিজের চেষ্টায় অর্জিত—

কেন্টাকি সীমান্তের জঙ্গলে এক দরিদ্র অশিক্ষিত কাঠুরিয়া পরিবারে তাঁর জন্ম। সে-অঞ্চলে কোন শিক্ষা বা সংস্কৃতির বালাই ছিল না। সেখানে ছিল শুধু রূঢ় বাস্তব আর কঠিন জীবন-সংগ্রামের তাণ্ডব নৃত্য।

কিন্তু শহরের মতো সেখানে কোন জাতিভেদ ছিল না, মানুষের মর্যাদা ছিল পুরোপুরি। আর, সেখানের আবহাওয়ায় ছিল স্বাধীনতার মেজাজ, সহজাত গণতান্ত্রিক অনুভূতি এবং সর্বপ্রকার ভণ্ডামি-বিরোধী সাম্যবাদ।

এই পরিবেশেই লিঙ্কনের শৈশব এবং প্রথম যৌবন কাটে। এবং এই পরিবেশেই তাঁর অসাধারণ চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

বালক বয়সেই পৈতৃক বৃত্তিতে তাঁর হাতে খড়ি হয়। অবসর সময়ে বালকটি তার মার কাছে নানা গল্প শোনে—দেশের এবং জাতির জনক জর্জ ওয়াশিংটনের। ওয়াশিংটনের জীবনচরিত তন্ময় হয়ে শুনতে

শুনতে বালকটি মাকে হঠাৎ প্রশ্ন করে,—আচ্ছা, ওয়াশিংটন কি হওয়া যায় না ?

—কেন নয়, চেষ্টা করো।

—কি করে ?

—অনেক অনেক পড়তে হবে, প্রচুর জানতে হবে ; নিজেকে তেমনি ভাবে গড়ে তুলতে হবে—তবেই তো সম্ভব !

বালক সেদিন-ই মনে মনে কি এক দৃঢ় সংকল্প করে ।

কিছুদিন পর ওয়াশিংটনের একটি জীবনী পড়বার পর তাঁর উক্তি এবং আদর্শ লিঙ্কনের মনে গভীর রেখাপাত করে।

প্রকৃতপক্ষে লিঙ্কন কোন বিদ্যায়তনের শিক্ষা পাননি। নিজের অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমের বলে তিনি নিজেকে সুশিক্ষিত করেন—

বাইশ বছর বয়সে তিনি ব্যাকরণ শিখতে শুরু করেছিলেন। এবং সাতাশ বছর বয়সে শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়াই লিঙ্কন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি চমকপ্রদ : কারও কাছে পড়া হল কি হল না, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি কারও কাছে পড়িনি। পড়ার বইগুলো সংগ্রহ করো, তারপর বইগুলোকে খুব ভাল করে পড়ো—যে পর্যন্ত না তাতে আলোচিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বুঝতে পারো।

সারা দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের নির্মম অত্যাচার লিঙ্কনের মনে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি এর প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন।

তাই আইন-সভায় নির্বাচিত হবার পর প্রথমেই লিঙ্কন ক্রীতদাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেন।

উত্তর আমেরিকা তাঁকে সমর্থন করে। কিন্তু গোল বাধে দক্ষিণ আমেরিকাকে নিয়ে।

এই দলাদলির মধ্যে সৃষ্টি হয়—ডেমোক্রাট এবং রিপাবলিক্যান দল। এমন সময় আসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-পর্ব

রিপাবলিক্যান দলের সমর্থনে লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

এবার দক্ষিণ আমেরিকার ক'টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার হুমকি দেয়। দেখতে দেখতে গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিপন্ন হয়।

স্বদেশ ও স্বজাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে লিঙ্কন সাময়িক ভাবে দাসত্ব প্রথার কথা ভুলে গিয়ে কঠোর হস্তে সে গৃহযুদ্ধ স্তব্ধ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা তিনি প্রাণপণে বজায় রাখেন।

দক্ষিণ আমেরিকাও এবার লিঙ্কনকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে মেনে নেয়।

লিঙ্কন কিন্তু নিজের সংকল্পের কথা ভোলেন না। তাই রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ করেই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন,—সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ-ই আমেরিকান গণতন্ত্রের ভিত্তি; সেই নীতি কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ সকলের ওপর-ই সমান ভাবে প্রযোজ্য।

এরপর আইনতঃ ক্রীতদাস প্রথার অবসান হতে দেরী হয় না; ১লা জানুয়ারী, ১৮৬৩ সন—সেই স্মরণীয় দিন।

স্বদেশবাসীকে লিঙ্কন একথাও মুক্তকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না,—আমেরিকাকে যে-সংগ্রাম বিদীর্ণ করেছে, তা সামাজিক সাম্যের জন্য নয়, গণতান্ত্রিক সাম্যের উদ্দেশ্যে।

সেই মারাত্মক সংকটকাল উত্তীর্ণ। সবে তিনি কঠিন সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস তখনও নেন নি। হঠাৎ এক আততায়ীর নিষ্ঠুর গুলিতে লিঙ্কন মর্মান্তিক ভাবে প্রাণ হারান। বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মহান শহীদের জীবন অবসান হয়।

সর্বজনীন আদর্শের জন্য এমনি ভাবে প্রাণ দিয়ে লিঙ্কন প্রমাণ করলেন—'জনগণের জন্যে জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন' পৃথিবী থেকে কখনও লুপ্ত হয় না।

কার্ল মার্কস (Karl Marx), ১৮১৮—'৮৩

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্‌গাতা—সাম্যবাদ বা কম্যুনিজমের জনক।

এঁর মতে মানব সমাজের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ—খাদ্য ও পণ্যের উৎপাদন এবং সমস্ত বিনিময়ের রীতিনীতি কেন্দ্র করেই মানবজাতির সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি। শুধু তাই নয়, একমাত্র অর্থনৈতিক প্রেরণাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানব-সমাজের সূক্ষ্ম স্থূল সমস্ত কর্ম ও বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর, বিত্তবানের সঙ্গে বিত্তহীনের সঙ্ঘর্ষের ফলেই ইতিহাসের সৃষ্টি।

মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,—বর্তমান যুগে ধনী ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম-ই পৃথিবীর সর্বশেষ শ্রেণী-সংগ্রাম ; আর, সে সংগ্রামে শ্রমিকদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

তাঁর মতবাদ বিশ্বের শোষিত শ্রেণীর মধ্যে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে। এই মার্ক্সীয় তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই রুশ দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল—বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ক্রমে সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকরণে যুগোশ্লাভিয়া, চীন, প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও সাম্যবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চালু হয়।

আজ বিশ্বের প্রজা-কল্যাণকামী প্রায় সব দেশই কমবেশী মার্কসবাদে বিশ্বাসী।

কার্ল মার্কস ছিলেন জার্মানীর এক সাধারণ ইহুদী পরিবারের সন্তান। বন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস এবং দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি দার্শনিক হেগেলের আদর্শ ও মতবাদে গভীর ভাবে প্রভাবিত হন।

অল্প বয়সেই বিপ্লবী কার্যকলাপ এবং সরব চিন্তাধারার জন্য মার্কসকে এক সময় জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নিতে হয়। এখানেই

বিপ্লবী চিন্তাবিদ্ ফ্রেডারিক এঞ্জেলস্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই পরিচয় থেকে অল্পদিনের মধ্যে দু'জনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দু'বন্ধু 'অবাঞ্ছিত' হিসাবে সে দেশ থেকে আবার বিতাড়িত হন।

মার্কস বন্ধুর সঙ্গে ব্রুসেলস্-এ গিয়ে আশ্রয় নেন। বন্ধুর সহযোগিতায় মার্কস বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি বিস্তৃত কর্মসূচী তৈরী করেন। কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো।

এ ম্যানিফেস্টোতে মার্কস সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। এবং ধনীশ্রেণীর অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে আহ্বান করেন।

তাঁর বিপ্লবী মতবাদের জন্য য়ুরোপের নানা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে মার্কস অবশেষে লণ্ডনে এসে আস্তানা নেন। বাকী জীবন তিনি এখানেই কাটান; বলতে গেলে ব্রিটিশ মিউজিয়মে—লাইব্রেরীতে।

এই লাইব্রেরীতে বসেই মার্কস তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থমালা রচনা করেন। তাঁর জীবিত কালে প্রথম পর্বটি প্রকাশিত হয়। বাকী পর্ব দুটি স্রষ্টা গ্রন্থাকারে দেখে যেতে পারেননি।

মূলতঃ অর্থনৈতিক গ্রন্থ হলেও এই ক্যাপিটাল-এ মার্কসের আদর্শ এবং মতবাদ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে—সাম্যবাদের কাছে এ গ্রন্থ বাইবেল-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (Iswar Ch Vidyasagar), ১৮২০-'৯১

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক। এঁরই অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়; ১৮৫৬ সনের ২৬শে জুলাই এ সম্পর্কে আইনটি পাশ হয়। নিজের পুত্রের বিবাহ বিধবার সঙ্গে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারের কৃতিত্বও তাঁর।

আধুনিক বাংলা-গদ্যের জনকও বিদ্যাসাগর। বাংলাদেশে এমন কোন শিক্ষিত লোক নেই যিনি বিদ্যাসাগরের রচনার সঙ্গে পরিচিত নন।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এঁর অবদান বড় কম নয়। কলকাতার প্রখ্যাত বিদ্যাসাগর কলেজ তিনিই একদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য সে-সময় এর নাম ছিল মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি অন্যূন কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, মেয়েদের জন্য আরও অন্তত পয়ত্রিশটি।

তিনি শুধু বিদ্যার সাগর ছিলেন না, দয়ার সাগরও। তাঁর উদারতা এবং দয়ার তুলনা কোথায়? চেনা অ-চেনা, ছোট বড়ো কেউ কখনও তাঁর কাছে হাত পেতে নিরাশ হয়নি। এদের প্রয়োজন মেটাতে বহু সময় বিদ্যাসাগরকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঋণও করতে হয়েছে। কখনও বা তাঁকে এ জন্য কম বিড়ম্বিত বা লাঞ্ছিত হতে হয় নি।

একজন মানুষের চরিত্রে অতো গুণের সমাবেশ দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এই সিংহ-পুরুষের জন্ম। তাঁর পিতার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা—ভগবতী দেবী।

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

সাতাশ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন এবং স্মৃতি বিভাগের পাঠ শেষ করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।

তারপর তিনি হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার প্রশংসা-পত্রেই তাঁর নামের সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়।

কর্মজীবনে বিদ্যাসাগর প্রথমে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট

উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগ দেন; ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৪১ সন।

পাঁচ বছর বাদে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সচিব পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় পরের বছর ঐ পদে তিনি ইস্তফা দেন।

১৮৫০ সনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। পরের বছর প্রথম অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৫ সালে সরকারের ইচ্ছায় তিনি সেইসঙ্গে বিশেষ-বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পদও গ্রহণ করেন।

১৮৫৮ সনের ৩রা নভেম্বর আত্মসম্মানের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর ঐ দু'টি সরকারী পদেই একসঙ্গে ইস্তফা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

এবার তিনি স্বাধীন ভাবে নানা রকম কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আর্তের সেবায় একদিন এই সাধের প্রেসও বিদ্যাসাগরকে বিক্রী করতে হয়েছিল।

নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর এক অনন্যসাধারণ কালজয়ী পুরুষ। অন্ততঃ বাংলার ছেলেমেয়েরা তাঁকে কোনদিন ভুলতে পারবে না। কেন না, তাঁর অমর সৃষ্টি—হাতেখড়ির প্রথম পাঠ—'জল পড়ে, পাতা নড়ে' ছন্দটি বালক রবীন্দ্রনাথের মতো আজো প্রত্যেকের মনেই দোলা দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ (Swami Vivekananda), ১৮৬২—১৯০২

শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক। শুধু, জাতীয়তার উদ্‌গাতাই নন, ভারতের প্রথম সচেতন 'সোস্যালিস্ট'ও—মার্কসীয় অর্থে নয়, মানব মুক্তির আদর্শে। প্রগতিশীল ঐতিহ্যের স্রষ্টার গৌরবও তাঁর।

মুক্তি-সন্ধানী ভারতের প্রকাশ যখন নিতান্ত অস্ফুট, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সহসা আবির্ভূত হয়ে তাঁর প্রদীপ্ত বাণী ও রচনার মাধ্যমে

স্বদেশবাসীকে জাগরণের চেতনায় প্রবুদ্ধ করেন। সুপ্ত ভারতবাসী তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উপনিষদের অমোঘ বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' শুনে চকিত হয়।

বিমূঢ় দেশবাসিগণ রুদ্র সন্ন্যাসীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে শুনতে পায়,—'পরমজননী মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্যা—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত, অন্যান্য দেবতাগণ অকেজো, ঘুমন্ত'।

দেশমাতার একনিষ্ঠ পূজারী এই কর্মবীর জাতীয়তার ও স্বদেশপ্রেমের যে অঙ্কুর রোপণ করেন, সেই অঙ্কুর থেকেই উত্তরকালে অগ্নিযুগের মুক্তি-সাধনার বিশাল মহীরুহ উদ্‌গত হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, পরবর্তী কালে দেশনেতারা যে সমাজতন্ত্রকে রূপায়িত করতে ব্রতী হন, বিবেকানন্দ সেই আদর্শেরও প্রবক্তা।

এই অনন্যসাধারণ পুরুষের সক্রিয় কর্মকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর, ১৮৯৭—১৯০২ সন। এই স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যেই বিবেকানন্দ সমকালীন ভারতবর্ষের দিশারী হয়ে ওঠেন—দেশবাসীকে জীবন-বোধের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

প্রেম ও পৌরুষ ছিল বিবেকানন্দের সাধন-মন্ত্র, চরিত্রের মূলতত্ত্বও; জ্ঞান ও প্রেমের পৌরুষ—দু'টি বিরুদ্ধ বস্তুর অপূর্ব সমন্বয়। আর, তাঁর সাধনক্ষেত্র ছিল স্বদেশ ও সমাজ।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ছিল তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম। দেশকে এমন গভীর ভাবে আগে আর কেউ ভালবাসেনি।

'স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করে এই স্বদেশবাসিগণের পূজা করতে হবে, সেবা নয়'।

—এ তাঁর শুধু মুখের কথা নয়, অন্তরের উপলব্ধি—তাইতো দেশবাসীর কাছে তা এতো মর্মস্পর্শী।

স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভারত—জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রেমে শৌর্যে মহীয়ান্ ভারত—জনগণের ভারত, দারিদ্র্যমুক্ত মালিন্যমুক্ত এক নতুন ভারত—এই ছিল মুক্তপুরুষ বিবেকানন্দের একমাত্র বিলাস।

তিনি চেয়েছিলেন,—শোষিত, দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর মুক্তি।

তাই তাঁর আকুল কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'হে ভারত, ভুলিও না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ তোমার রক্ত, তোমার ভাই। সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই'।

তাঁর এই সাম্যবাদের, স্বদেশ-প্রীতির তুলনা কোথায়?

অতি সাধারণ মানুষের প্রতিও বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা ছিল অসীম, অবিশ্বাস্য। এ দেশে দীন-দরিদ্রকে নারায়ণরূপে পূজা করার কল্পনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। সেই 'মহামানব'-বাদ মানুষের চিন্তার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ এবং মৌলিক অবদান।

মানুষকে মানব-জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে বৈরাগ্য-ব্যাধিকে মানবমনের কোণ থেকে দূর করে এই পার্থিব জগৎকেই মহাতীর্থভূমিতে পরিণত করার যে প্রয়াস আমরা ইতস্ততঃ দেখতে পাই, মানুষের শুধু দুঃখ-মোচন নয়, এই জীবনেই তাকে স্বমর্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার যে আকুল কামনা জাগিয়েছে—মনে হয় এই বিবেকানন্দ তারও প্রবক্তা।

'মানুষ পাপী নয়'—তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বীরেশ্বর বিবেকানন্দই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট পরিত্রাণ-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন। এক অভিনব শক্তি-মন্ত্রঃ মানুষকেই আত্মার অনন্ত শক্তির আধার বলে বিশ্বাস করার মন্ত্র।—মানুষকে এমন উদার দৃষ্টিতে এঁর আগে আর কেউ বোধ হয় দেখেনি।

তবে মানুষের ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলিত জীবনকে বিবেকানন্দ অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন—সে কথা আমরা সকলেই জানি।

আবার, 'চরিত্র'-কেই মানব-ধর্ম-সাধনায় বিবেকানন্দ সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। 'মানুষ-গড়া'-ই ছিল তাঁর একান্ত অভিলাষ। এই মানুষের সবচেয়ে বড় লক্ষণ পৌরুষ।

অসীম আত্ম-প্রত্যয়, অদম্য কর্মশক্তি এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ বা পরার্থে আত্মাহুতি—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের 'ধর্ম-দর্শন'।

মহাত্মা গান্ধী (M. K. Gandhi), ১৮৬৯-১৯৪৮

তাঁর আসল নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হলেও—মহাত্মা গান্ধী বা শুধু 'গান্ধীজী' নামেই তিনি বিশ্বখ্যাত। আইনস্টাইনের ভাষায়—'এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ'।

প্রসঙ্গত, 'মহাত্মা' এই উপাধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রথমে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—মহাত্মা তিনিই—সকলের সুখ-দুঃখ যিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলিয়া জানেন। কেননা সকলের হৃদয়ে তাঁহার স্থান, তাঁহার হৃদয়ে সকলের স্থান।

গান্ধীজী সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি এতটুকুও মিথ্যা নয়। তাইতো তিনি উত্তরকালে জাতির জনক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর জীবনচরিতও সে-উক্তির সমর্থন করবে।

জন্মসূত্রে গান্ধীজী ছিলেন একজন বৈষ্ণব—বৈষ্ণবচূড়ামণি বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর, ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী।

তবে প্রথম জীবনে তাঁর চরিত্রে সাধারণ মানুষের দুর্বলতা কিছু কম ছিল না—স্বভাবে অত্যন্ত লাজুক, প্রকৃতিতে ভীরু। ছাত্র হিসাবেও তাঁর বিশেষ মেধার পরিচয় ছিল না।

গান্ধীজী ছিলেন সত্য এবং অহিংসার একনিষ্ঠ পূজারী। তাঁর অহিংসা মানে 'সর্বজীবে প্রেম'।

দরিদ্র নিপীড়িতদের প্রতি সমস্ত অন্তরের দরদ বা প্রেমই অহিংসার আসল স্বরূপ—যা মূর্ত হয়ে উঠেছিল গান্ধীজীর জীবন ও কর্মে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় তথা এশিয়াবাসীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় অত্যাচার বিকশিত করেছিল তাঁর হৃদয়ের প্রেম-পদ্ম।

সেই প্রেমই দরিদ্র চাষী ভাইদের জন্য চম্পারন ও খেড়ায় সত্যাগ্রহের পথে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রেমের জন্যই শোষিত শ্রমিকদের

স্বার্থে আমেদাবাদে তাঁর উপবাস। ঐ একই কারণে হরিজনদের কল্যাণের জন্য পদব্রজে অর্থসংগ্রহের তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও সামরিক শাসনের অত্যাচারের পর সেই প্রেমই তাঁকে পাঞ্জাব তদন্ত কমিটির মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করায়। হিন্দু-মুসলমানের প্রতি প্রেম বশতঃই বৃদ্ধ বয়সে অপটু শরীরে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে নোয়াখালী এবং বিহারের সেই ভয়াবহ অঞ্চলে শান্তির দূত হিসাবে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। সবশেষে, তাঁর স্বাধীনতার সংগ্রামও ছিল ঐ প্রেমের পথে—অহিংসার মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে ধর্মক্ষেত্রে অহিংসার প্রবর্তন করেন মহাবীর ও বুদ্ধ। রাজনীতিতে তার পথিকৃৎ মহাত্মাজী।

দেশকে অস্পৃশ্যতা নামক দুষ্ট ব্যাধি হতে মুক্ত করার জন্যও তিনি কম সংগ্রাম করেননি। তেমনি নারীদের পুরুষদের মতো সবকিছুর সুযোগ বা অধিকারের জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

তাঁর সমস্ত আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য গান্ধীজী উদ্ভাবন করেন বুনিয়াদি শিক্ষা—তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা। জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার স্বনির্ভরতার শিক্ষা। ছ' থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলে মেয়ের জন্য এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক হোক—এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। এই শিক্ষার মাধ্যমে একটি শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে তুলবার তাঁর স্বপ্ন ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পেছনে এর অবদান অবিসম্বাদিত, সে কথা আমরা সকলেই জানি। ১৯৩০ সনে তাঁর নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ করার আন্দোলনের কথা—বা ১৯৪২ সনের 'ভারত ছাড়'-র গর্জনের কাহিনীও আমাদের অজানা নেই। ১৯৩৭ সনে প্রধানতঃ গান্ধীজীর প্রচেষ্টায়ই বৃটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের মধ্যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ছ'টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দল সেই সব অঞ্চলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী আমাদের জাতীয়-জীবনে একটি কলঙ্কিত দিন। কলঙ্কিত এই কারণে সেদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসের গুলিতে জাতির জনক গান্ধীজীর জীবনদীপটি চিরতরে নিভে যায়।

লেনিন (V. I. Lenin), ১৮৭০-১৯২৪

সাম্যবাদের একনিষ্ঠ পূজারী। বলশেভিক বিপ্লবের নেতা এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের জনক। মার্কস-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব জগতে তিনিই প্রথম 'সোস্যালিজম' প্রবর্তন করেন। তাঁর আসল নাম ছিল ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ। তখনও তাঁর শিক্ষা-জীবন শেষ হয়নি, কাজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিক্ষুব্ধ ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার অপরাধে তিনি সে-অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হন।

সামারা শহরে এসে লেনিন আশ্রয় নেন। মার্কস এবং এঙ্গেলের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এখানে গোপনে একটি ছোট্ট বিপ্লবদল গড়ে তোলেন। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পড়াশুনাও চালিয়ে যান। দু'বছর বাদে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে সেণ্ট পীতর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন।

ছাত্র জীবনে দেশের দুর্গতি লেনিনের মনকে গভীর ভাবে পীড়া দিচ্ছিল। ক্রমে তিনি উপলব্ধি করেন, মার্কসের প্রবর্তিত সাম্যবাদী বিপ্লব ছাড়া জার সরকারের কবল থেকে রাশিয়ার মুক্তি সম্ভব নয়, জনগণের লাঞ্ছনার অবসান অসম্ভব।

লেনিন রাজধানী পীতর্সবুর্গে গিয়ে সমস্ত শোষিত শ্রমিকগণকে মার্কসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সংগ্রামের জন্য তাদের আহ্বান করেন।

নবজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত শ্রমিকগণ লেনিনের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। মার্কসের অনুগামী শ্রমিকদের নিয়ে সৃষ্টি হয় বিপ্লবী শ্রমিক সঙ্ঘ—'মুক্তিকামী সংগ্রামী দল।

কথাটা বেশীদিন চাপা থাকে না। এই ষড়যন্ত্রের অপরাধে লেনিন এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। চোদ্দ মাস বন্দী থেকে লেনিন দক্ষিণ সিবিরিয়াতে নির্বাসিত হন।

দীর্ঘ তিন বছর বাদে লেনিন মুক্তি পান। এবার স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করতে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু জারের রাজত্বে কাজটা সহজ নয়, তায় তিনি ছিলেন রাজদ্রোহী বলে চিহ্নিত।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লেনিনকে দেশ ছাড়তে হয়। য়ুরোপের নানা দেশ ঘুরে তিনি জার্মানীর ম্যুনিক শহরে আস্তানা নেন। এখান থেকেই তিনি মার্কসবাদী পত্রিকা (Iskra) প্রকাশে ব্রতী হন। 'লেনিন' ছদ্মনামে তিনি লিখতে শুরু করেন তীব্র ভাষায়। ক্রমে এই ছদ্মনামের অবগুণ্ঠনে তাঁর আসল নামটি লুপ্ত হয়।

১৯০৫ সনে দেশে বিপ্লবের মেঘ ঘনীভূত হতে লেনিন বিদেশ থেকে ছুটে এসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এ সংগ্রাম ব্যর্থ হতে স্বদেশ ও স্বজাতির বৃহত্তর স্বার্থে লেনিনকে আবার দেশ ছাড়তে হয়। দূর থেকে তিনি উপদেশ নির্দেশ দিয়ে চলেন। বিপ্লবীরা আরও কঠিন সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে থাকে।

১৯১৭ সন। জারের পদচ্যুতির পর নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী বা মেনশেভিকদল রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করেন। লেনিন তখন স্বদেশের বাইরে।

মেনশেভিকদল কিন্তু চেষ্টা করেও দেশের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে না। বিক্ষুব্ধ শ্রমিক-চাষীরাও শান্ত হয় না। এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে লেনিন দেশে ছুটে আসেন। তখন অক্টোবর মাস। তাঁর দুই যোগ্য সহকর্মী—স্টালিন এবং ট্রটস্কির সহায়তায় লেনিন বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাশিয়ার সর্বময় কর্তা হন। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি সভ্যদেশের কর্তৃত্ব মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিদের হস্তগত হয়। এবার

দলের কর্ণধার লেনিন মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করে সমগ্র রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রবর্তনের জন্য তৎপর হন—

দেশের সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে জমির স্বত্ব যৌথভাবে দুঃস্থ চাষীদের হাতে তুলে দেন ; শ্রমিকদের স্বার্থে কলকারখানাও রাষ্ট্রীয় হতে দেরী হয় না।

রাশিয়ার সমগ্র কৃষক-শ্রমিক এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ আনুগত্যের ফলে বলশেভিক সরকার ক্রমে বৈদেশিক আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। গড়ে ওঠে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন বলিষ্ঠ জাতি। এমনি ভাবে লেনিনের দক্ষ নেতৃত্বে সৃষ্টি হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ—শক্তিশালী সোভিয়েত রাষ্ট্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাশূন্যে অভিযান

অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশেষজ্ঞদের বহু বিনিদ্র রজনী কেটেছে মহাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। তাঁরা বার বার বিফল হয়েছেন কিন্তু আশাহত হননি—তাঁদের চেষ্টা বা উৎসাহেও ছেদ পড়েনি।

ক্রমে দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হল। এল টেলিস্কোপ, স্পেকট্রস্‌কোপ। ফলে, সেই মহারহস্যের কিছু আভাস জানা গেল। কিন্তু রহস্যের উদ্‌ঘাটন হল না। সেটুকু জ্ঞানে লোকের কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না। অজ্ঞাত-লোকের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করতে তারা আরও আগ্রহী হয়। এবার তারা দ্বিগুণ উৎসাহ ও প্রেরণায় সেই রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

কথাসরিৎসাগর ধর্মগ্রন্থটিতে দু'জন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী সূত্রধরের কথা উল্লেখ আছে—প্রাণধর এবং রাজ্যধর। এই সূত্রধর ভ্রাতৃদ্বয় কাঞ্চিনগরের রাজা বাহুবলের রাজ্যে বাস করতো।

দু' ভাই-ই এমন রথ তৈরী করতে পারতো যাতে চেপে চক্ষের নিমেষে আকাশ পথে দূর দূরান্তে চলে যাওয়া যেতো। অগ্রজ প্রাণধরের দক্ষতায় আরও চমৎকৃত হতে হয়—

এক সময় এই সূত্রধর পরিবারটি নিতান্ত দুরবস্থায় পড়ে। ক্রমে অভাবের তাড়নায় প্রাণধর দিশেহারা হয়ে ওঠে। ভাগ্য পরিবর্তনের কোন পথ আর সে খুঁজে পায় না। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়। বহু পরিশ্রম করে প্রাণধর একদিন দু'টি আশ্চর্য কলের হাঁস তৈরী করে।

পরের দিন রাত্রে প্রাণধর হাঁস দু'টির কল টিপে বাইরে ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁস দু'টি উড়ে গিয়ে রাজভাণ্ডারের জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে মূল্যবান মণিমুক্তা পুরে সেই পথেই প্রাণধরের বাড়িতে ফিরে আসে।

হাঁস দু'টি অমনি ভাবে ফিরে আসতে প্রাণধরের প্রাণে আনন্দের সীমা থাকে না। প্রাণধরের প্রলোভন বেড়ে যায়। বিপদের আশংকা তার মনে ঠাঁই পায় না। ফলে, তেমনি ভাবে প্রতিরাত্রে তার ইঙ্গিতে যন্ত্রের হাঁস দু'টি প্রহরীদের সতর্ক নজর এড়িয়ে রাজকোষ থেকে মণিমুক্তা চুরি করে এনে প্রাণধরকে উপহার দিতে থাকে। প্রাণধরের ভাগ্য পরিবর্তন হতে দেরী হয় না। অপহৃত রাজধনের দৌলতে পরিবারটির দিন পরম সুখে কাটতে থাকে।

রাজার ঐ ঐশ্বর্য প্রাণধরের বরাতে কিন্তু বেশী দিন সইল না। একদিন মণিমুক্তা সহ রাজভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে আসবার পথে হঠাৎ কল বিগড়ে যেতে হাঁস দু'টি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। রাজপ্রহরীদের হাতে হাঁস দু'টি ধরা পড়ে। হাঁস দু'টির বিস্ফারিত ঠোঁটের দিকে নজর পড়তে প্রহরীরা স্তম্ভিত হয়।

এবার প্রাণের ভয়ে প্রাণধর স্ত্রী পুত্র সহ তার নিজের তৈরী রথে চেপে মুহূর্তের মধ্যে আকাশ পথে মিলিয়ে যায়। ভীত অনুজ রাজ্যধরও অনুরূপ একটি রথে চড়ে এক অজানা দেশে পালিয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

এর আগেই অবশ্য মানুষের আকাশে উড়বার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। আমরা আমাদের রামায়ণ মহাভারতেও বিমান বা পুষ্পক-রথের কথা সকলেই পড়েছি।

গ্রীক পুরাণেও বিমানের কথা উল্লেখ আছে। আজ উড়োজাহাজ বা অ্যারোপ্লেনে দূরদূরান্তে যাওয়া আসা একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। তা নিয়ে কেউ এতটুকুও আর মাথা ঘামায় না, একটি বালকও না।

কিন্তু মহাকাশ অভিযান ক্ষেত্রে আধুনিক কালের আধুনিকতম বিমানও উপযুক্ত নয়। তার গতিবেগ ও পথ সীমিত। পৃথিবীর মহাকর্ষণ শক্তি এড়ান তার পক্ষে সম্ভব নয়—সেটাই বড় অন্তরায়।

মহাকাশ বা গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছুতে হলে এমন যন্ত্র বা যানবাহনের প্রয়োজন যা সহজে সেই মহাকর্ষণের শক্তিকে অবলীলাক্রমে পেরিয়ে

যেতে সক্ষম, তবেই মানুষের পক্ষে সেই ঈপ্সিত মহাকর্ষে পৌঁছান সম্ভব।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মাত্র ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল। সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতিতে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় মাত্র ১.২৮ সেকেণ্ড। আর, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, তার আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড।

চাঁদ-ই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এই চাঁদে মানুষকে পৌঁছুতে হবে—এই হল বর্তমান বিজ্ঞানীদের দৃঢ় সংকল্প। ১৯২৮ সনের মধ্যে কোন একদিন মানুষ সেই চাঁদমামার দেশে পাড়ি দেবে বলে বিজ্ঞানীরা প্রদীপ্ত ঘোষণা করেছেন।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন,—পৃথিবী থেকে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে যদি কিছুতে যাত্রা করা যায় তবেই সেই মহাকর্ষণ নামক অন্তরায় কাটানো সম্ভব। উক্ত বেগে যাত্রা করলে আমাদের সকলের ছেলেবেলার কল্পিত চাঁদমামার দেশে পৌঁছুতে সময় লাগবে সাড়ে ন'ঘণ্টা, শুক্রে চুয়াল্লিশ দিন আর মঙ্গল গ্রহে পঁচাত্তর দিন।

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে অবশেষে এক প্রচণ্ড গতিশীল যন্ত্র বা যানবাহন সৃষ্টি করেছেন। রকেট। আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট গভার্ড ১৯১৯ সনে এ রকম একটি তিন-পর্যায়ী রকেট আবিষ্কার করে এ পথের প্রথম সন্ধানীর গৌরব অর্জন করেন।

রকেটের প্রসঙ্গে এর ইতিহাসের পেছন দিকের পাতা একটু ওল্টানোর হয়তো প্রয়োজন আছে—

মহাকাশ অভিযান ক্ষেত্রে এ রকেটের গুরুত্ব অসীম সন্দেহ নেই। কিন্তু রকেটের এ-আবিষ্কার নতুন নয়ঃ কার্যক্ষেত্রে রকেটের ব্যবহার চীনদেশেই প্রথম উদ্ভব হয়; ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোলিয়ানরা চীনদেশ আক্রমণ করলে চীনারা শত্রুদের ওপর এমন রকেট ছোঁড়ে যে সে-যাত্রায়

শত্রুরা পালিয়ে বাঁচে। তারপর বোলানের যুদ্ধে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইংরাজরাও নাকি রকেট ব্যবহার করেছিল। আঠারো শতাব্দীতে আমাদের দেশেও পাঞ্জাবের কোন এক যুদ্ধে ইংরাজদের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রের ব্যবহার শোনা যায়। ক্ষেপণাস্ত্রের মূলেও তো রকেটের কৌশল অস্বীকার করা যায় না।

তবুও আগেই বলেছি, বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানী গভার্ডের অবদানের মূল্যও কম নয়। যদিও পরবর্তী কালে তাঁর আবিষ্কৃত রকেটের অনেক উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে—এখনও বিজ্ঞানীদের সেই সাধনার শেষ হয়নি। কিন্তু তাই বলে বহু প্রতীক্ষিত অভিযান শুরু হতে দেরী হয় না—

১৯৫৭ সনের ৪ঠা অক্টোবর মানুষের তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন, গৌরবময়ও বটে।

ঐ দিনটিতে সেই তিন-পর্যায়ী রকেটের অনুকরণে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ১নং স্পুৎনিক মহাকাশে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরিয়ে সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে রাশিয়ার এ প্রচেষ্টা প্রথম পদক্ষেপ।

'স্পুৎনিক' অর্থ আমরা বাংলায় যাকে 'উপগ্রহ' বলি। এই স্পুৎনিকটির ওজন ছিল ১৮৪ পাউণ্ড আর তার গতিবেগ ছিল সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল। প্রতি পঁচানব্বই মিনিটে পৃথিবীর চারদিকে একবার করে সেটি ঘুরে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করেছিল। প্রায় ১,৪০০ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঠিক তিন মাস বাদে বায়ুর ঘন স্তরে নেমে এসে সেটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সেটি পুড়লে কি হবে? ঠিক একমাস বাদে রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুৎনিকটি আকাশে উড়ে যায়। এবার সে একা নয়, সঙ্গে যায় একটি যাত্রী। প্রথম মহাকাশযাত্রী—কুকুর লাইকা। প্রতি ১০৩ মিনিটে একবার হিসাবে ২,৩৭০ বার পৃথিবীকে উপগ্রহরূপে পরিক্রমণ

করে চার মাস পর ১৯৫৮ সনের ১৪-ই এপ্রিল সেটি ধ্বংস হয়। প্রথম মহাকাশযাত্রী লাইকা মরে গিয়েও আজ আমাদের মনে অমর হয়ে আছে, চিরদিন থাকবে।

১৯৫৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্সপ্লোরার-১ উৎক্ষেপ করে। এটির পরিক্রমণ কাল ছিল ১১৪.৮ মিনিট; আয়ুষ্কাল আনুমানিক তিন থেকে পাঁচ বছর।

এর একমাস সতেরো দিন পরে (১৭ই মার্চ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভ্যানগার্ড-১ আকাশপথে ছুটে যায়। সৌরশক্তি সঞ্চালিত বেতার-সংকেত এ থেকে অবিরত আসছে। আনুমানিক আয়ুষ্কাল দু'শত থেকে হাজার বছর।

সাতদিন বাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক্সপ্লোরার-৩ উৎক্ষেপিত হয়েছিল; পরিক্রমণ কাল ১১৫.৮৭ মিনিট। ঠিক তিন মাস বাদে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এবার আবার রাশিয়ার পালা। ১৫ই মে স্পুৎনিক-৩ মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। পৃথিবীকে ১০,০৩৭ বার প্রদক্ষিণ করে তেইশ মাস পর আগের দু'টির মতো পুড়ে ভস্ম হয়।

তারপর চাঁদের দিকে লক্ষ্য করে উৎক্ষেপিত হয় প্রথম লুনিক—২রা জানুয়ারী, ১৯৫৯ সন। এটি সূর্যকে কেন্দ্র করে একটি নতুন গ্রহের মতো ঘুরতে থাকে।

এ ঘটনার মাত্র আট মাস বাদে দ্বিতীয় লুনিক চাঁদের দেহকে স্পর্শ করে—১৪ই সেপ্টেম্বর, ভোর রাতে। এই লুনিকটি চাঁদের অ-দেখা অংশের ফটোটিও তুলে নিয়েছিল। এতদিনে আমাদের সে খবর আর অজানা নেই। আমরা অনেকেই কাগজে সে ফটোটিও দেখেছি।

১১ই মার্চ, ১৯৬০ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে 'পাইওনিয়র-৫' ছাড়ে সেটি পৃথিবী ও শুক্রের মাঝে কক্ষপথ করে নিয়ে সূর্যের উপগ্রহরূপে পরিক্রমণ করছে।

প্রায় দু'মাস বাদে (১০-ই আগষ্ট) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিস্কভারার

—১৩ উৎক্ষেপ করে। ওজন ৩০০ পাউণ্ড। উপগ্রহরূপে রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়টিকেও উৎক্ষেপ করা হয়—তখন মোট ওজন হয় ১৭০০ পাউণ্ড। ৩০০ পাউণ্ডের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ প্রকোষ্ঠটিকে খুব স্বাভাবিক ভাবে না হলেও আবার পৃথিবীতে সেটি ফিরিয়ে আনা হয়। এই প্রচেষ্টার সাফল্য থেকে আগেকার বিফলতার কারণ উদ্‌ঘাটিত হয়।

১৯শে আগস্ট, ১৯৬০ সন। রাশিয়া এবার বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করে। ১০,১২০ পাউণ্ড ওজনের 'স্পেসক্র্যাফ্‌ট—২'তে দু'টি কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীসহ ৪,৩৭,৫০০ মাইল পরিক্রমণের পর ঐসব প্রাণীসহ প্রকোষ্ঠটি পরের দিন পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে আসে। মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ার এ বড় কম কৃতিত্ব নয়।

ক্রমে আসে সেই ঐতিহাসিক **১২ই এপ্রিল**, খবর শুনে বিশ্ববাসী চমকে ওঠেঃ ভস্তোক—১-এ করে পৃথিবীর প্রথম নভশ্চর রাশিয়ার অনন্যসাধারণ বীর ইউরি গাগারিন এক ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট ধরে পৃথিবী পরিক্রমণ করে সুস্থ শরীরে তাঁর স্বদেশেই ফিরে আসেন।

কর্ণেল ইউরি গাগারিন, প্রথম মহাশূন্যচারী মানব, শুধু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বীর নয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠবীরও বটে—একমাত্র যিনি বলতে পারতেন, পৃথিবী যে গোল শুধু একমাত্র আমিই তা প্রত্যক্ষ করছি।

কিন্তু শুধু তাঁর স্বদেশের পক্ষে নয় সারা বিশ্ববাসীর পক্ষে গভীর দুঃখের বিষয়, ২৭শে মার্চ এক প্রশিক্ষণ-উড্ডয়ন কালে আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় কর্ণেল গাগারিনের জীবন-দীপটি নিভে যায়। যিনি অদূর ভবিষ্যতে চাঁদে উড়ে যাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন—মহাকাল তাঁর সে ইচ্ছা আর পূরণ করার সুযোগ দিল না।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বীর মেজর গেরমান টিটভ। এই সোভিয়েত

এদিকে আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও চুপচাপ বসে ছিলেন না। ১৯২৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকাবাসী কর্ণেল **জন গ্লেন** তিন বার মহাকাশ পরিক্রমা করে স্বদেশে ফিরে আসেন।

তাঁর ঐ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ২৪শে মে কমাণ্ডার **স্কট কার্পেণ্টার**ও তাঁর পূর্বসূরীর মতো তিন বার মহাকাশ পরিক্রমা করে ফিরে আসেন এক সময়।

তিন মাস গত হবার আগেই সোভিয়েত রাষ্ট্র আবার আসরে নামে ১১ই আগষ্ট মেজর **নিকোলায়েভ** চৌষট্টি বার এবং পরের দিন তাঁর স্বদেশবাসী কর্ণেল **পোপোভিচ** আটচল্লিশ বার সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ পরিক্রমা করে রাশিয়ায় ফিরে আসেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ঐ মহাকাশে ব'সেই পরস্পরে কথাবার্তা বলেছিলেন স্বচ্ছন্দে।

এরপর আমেরিকার মেজর **গর্ডন কুপার** আকাশপথে উড়ে যান। তিনি বাইশ বার পরিক্রমা করে ফিরে আসেন। দু' মাস বাদে (১৪ই জুলাই) সোভিয়েত কর্নেল **ভালেরী বিকোভস্কি** একাশি বার পরিক্রমা করেন।

দু' দিন বাদে সোভিয়েত রমণী **ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা** একটি পৃথক যানে আটচল্লিশবার সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ পরিক্রমা করে স্বদেশে ফিরে আসেন। শ্রীমতী ভ্যালেন্তিনা-ই পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ-চারিণী।

ঠিক এক বছর তিন মাস বাদে 'ভস্কোদ' বা সূর্যোদয় সোভিয়েত মহাকাশযানটি একজন দু'জন নয় তিনজন যাত্রী—পাইলট কর্নেল **ভ্লাডিমির কোমারভ**, বিজ্ঞানী **কনস্তান্তিন ফিয়োক্তিস্তভ** এবং ডাক্তার **বরিস ইগোরভ**কে নিয়ে মহাকাশ পরিক্রমা করে ফিরে আসে মর্তে। এ পরিক্রমার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য লক্ষণীয়ঃ প্রথমতঃ, পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একই যানে একাধিক মানুষ ঘুরে আসে; দ্বিতীয়তঃ, এতো উর্ধ্বে আর কোন যান তখনও পর্যন্ত উঠতে পারেনি।

পরের বছর রাশিয়ার 'ভস্কোদ-২' মহাকাশের দিকে ছুটে যায়। এবার শুধু পরিক্রমা নয়—মহাশূন্যে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ হয়। পদচারণা করেন রুশবাসী লেঃ **কর্নেল আলেক্সি লিওনভ**। এ যানটির পরিচালক ছিলেন **কর্নেল পাভেল বেলিয়াফেভ**। ভস্কোদ-টি মিনিটে একানব্বই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবার সময় লিওনভ মহাশূন্যে লাফিয়ে পড়ে দশ মিনিটকাল ভেসে থাকেন।

তিন মাস না পেরোতেই আবার মানুষের জয়গান ধ্বনিত হয় যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে। আমেরিকাবাসীদ্বয়—**জেমস এ ম্যাকডেভিট** এবং মেজর **এডওয়ার্ড আর হোয়াইট** জেমিনি-৪ চেপে ঘণ্টায় সাড়ে সতের হাজার মাইল বেগে পৃথিবীকে চক্কর দেন। তারপর উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয় চারদিন ভারশূন্য অবস্থায় থেকে অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য নিয়ে সুস্থ শরীরে আবার পৃথিবীর কোলে ফিরে আসেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমিনি-১২ দু'জন নভশ্চর—**জেমস লোভেল** এবং **এডুইন** এ্যালড্রিন-কে নিয়ে ৫৯ বার পৃথিবীকে উপগ্রহরূপে পরিক্রম করে মোট ৯৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট।

পরের দিন অর্থাৎ ১২ই নভেম্বর এ্যালড্রিন নভোযানের দরজা খুলে দু' ঘণ্টা ২৯ মিনিট বাইরে ভেসে থেকে অনেক ছবি তোলেন—সূর্যের পূর্ণগ্রাসের ছবিটি পর্যন্ত। মহাকাশ-স্টেশন স্থাপনের জন্য যেসব কারিগরীর প্রয়োজন হবে, সে ধরণের কর্মভার এঁদের ওপর ছিল। এঁরা তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে তিন দিন বাদে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন।

রুশ যান ভেনাস-৪ শুক্রগ্রহে অবতরণ করে; ভেনাস-৪টি পৃথিবী থেকে যাত্রা করেছিল ১২ই জুন,

সন্ধ্যাতারারূপে যে সূর্যকে দিনান্তে বিদায় দিচ্ছে, শুকতারারূপে সেই পৃথিবীর শিয়রে বসে সূর্যকে অভ্যর্থনা জানায়—পূবের আকাশে হাসির অভ্যর্থনা নিয়ে দিনের প্রতীক্ষায় স্থির। পৃথিবীর মানুষ আদিকাল

থেকে এই শুক্র গ্রহের সঙ্গে পরিচিত। ভারতীয় এবং গ্রীক পুরাণে তার বিপুল বন্দনার কথা আমরা জানি।

মানব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক অভিযানের সফল সমাপ্তি : পৃথিবীর তিনটি মানুষ চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে মর্তলোকে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করেন।

'অ্যাপোলো-৮'-এ করে তিন মার্কিন মহাকাশচারী—**ফ্রাংক বোরম্যান** (অধিনায়ক), **জেমস লোভেল** এবং **উইলিয়ম অ্যানডারস,** ১৪৭ ঘণ্টাব্যাপী মহাকাশ পরিক্রমায় ২০ ঘণ্টায় দশ বার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন। তারপর পৃথিবীর নির্দেশে তাঁরা রকেটের ইনজিনটি চালু করে চাঁদের অভিকর্ষবন্ধন ছিন্ন করে ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে (ভারতীয় সময়, রাত ৯'২১ মিঃ) এবং নির্ধারিত জায়গাটিতে—প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি, সমুদ্রের কোলে সুস্থ শরীরে ফিরে আসেন।

মহাকাশ থেকে ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটে এসে যখন নভশ্চররা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের মহাকাশযানটিকে মনে হচ্ছিল যেন একটি ভয়াবহ আগুনের গোলা। আর তা হবেই বা না কেন? তখন যানটির আবরণের তাপমাত্রা ছিল ছ' হাজার ডিগরি ফারেনহাইট।

অ্যাপোলো-৮ উক্ত তিন জন আরোহীকে নিয়ে ২১শে ডিসেম্বর, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬'২১ মিঃ-এ, কেপ কেনেডি অঞ্চল থেকে ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল বেগে চন্দ্রলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।

তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর, (ভারতীয় সময়) ৩'১৪ মিঃ-এ মহাকাশচারীরা চাঁদের অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট আকাশে গিয়ে পৌঁছন। অ্যাপোলো'র গতিবেগ তখন ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইলেরও বেশী। কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদের অভিকর্ষ শক্তি মহাকাশযানটিকে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলে। তারপর বেলা ৩'২৮ মিঃ নাগাত শুরু হয় চন্দ্র প্রদক্ষিণ।

এই নভশ্চর তিনজন চাঁদকে প্রত্যক্ষ করেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে.

এবং অতি নিকট থেকে—মাত্র ৬০·৫ মাইল দূরত্ব থেকে। পৃথিবীর মানুষ চাঁদকে প্রায় দু' লক্ষ ৪৮ হাজার মাইল দূর থেকে দেখে কত কাব্যই না সৃষ্টি করছে। কিন্তু অত কাছ থেকে দেখা রূপসী চাঁদের রূপটা এঁদের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে বিভিন্ন রূপে,—

চাঁদকে প্রথম দর্শনে লোভেল-এর মনে হয়,—'প্ল্যাসটার অব প্যারিস অথবা বেলাভূমির ধূসর বালুরাশির মত'। অধিনায়ক বোরম্যানের দৃষ্টিতে তা—'এক অতি বিস্তৃত ভয়াবহ শূন্যতার রাজ্য'। আর, অ্যানডারস-এর চোখে—'যুগযুগান্তর ধরে উল্কাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত, কুৎসিত এক বিস্তৃত প্রান্তর'।

২৫শে ডিসেম্বর চন্দ্রলোক প্রদক্ষিণ শেষ করে তিন মহাকাশচারী ভারতীয় সময় বেলা ১১·৪০ মিঃ-এ চাঁদের কক্ষপথ থেকে নিজেদের মুক্ত করে আবার অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেন, পৃথিবীর কোলে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে। ফেরবার আগে সেখান থেকে তাঁরা 'বড়দিন'-এর প্রার্থনা জানাতে ভুল করেন না।

ভবিষ্যতে চাঁদে নামার উপযুক্ত জায়গা হিসাবে এঁরা মোট পাঁচটি জায়গা নির্বাচন করেও এসছেন। এঁদের কেউ বা প্রিয়জনের নাম অনুসারে সেই নির্বাচিত জায়গায় নামকরণের লোভ সামলাতে পারেননি। যেমন, লোভেল একটি জায়গার নামকরণ করেছেন তাঁর স্ত্রীর নাম অনুসারে—মাউণ্ট 'মেরিলিন'।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এ সব নামকরণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। এই নামকরণের ক্ষমতা বা দায়িত্ব 'আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতি'র, অন্য কারুর নয়।

জুলে ভার্নে, এইচ জি ওয়েলস, ওবারথ এবং তিসিয়াগোসকি প্রভৃতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণের যা স্বপ্ন ছিল এবং গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটন প্রমুখ মহাবিজ্ঞানীদের সাধনায় যা পুষ্ট, তারই পরিণতির সূচনা হিসাবে এই চন্দ্র-প্রদক্ষিণের সমাপ্তি হল।

অবশ্য এই সফল চন্দ্র-প্রদক্ষিণের পরিপ্রেক্ষিতে ভুললে চলবে না,—

১) এর আগে কোন মানুষ এত বেগে মহাকাশে যায়নি।

২) " " " " পৃথিবী থেকে অত দূরেও যায়নি ; ২৫শে ডিসেম্বর উক্ত তিন মহাকাশচারী চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করার সময় পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মাইল দূরে ছিলেন।

৩) এঁরাই প্রথম পৃথিবীর অভিকর্ষের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে চন্দ্রের অভিকর্ষ এলাকায় প্রবেশ করেন।

৪) এই তিন জনই প্রথম যাঁরা চাঁদের অপর দিকটি প্রত্যক্ষ করলেন এবং সে-সময় পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের কোন যোগসূত্র-ই ছিল না।

* * * * *

অ্যাপোলো-৮--এর তিন অভিযাত্রী চন্দ্র-পরিক্রমা করে নিরাপদে ফিরে আসবার পর মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এ বছরের মাঝামাঝি অথবা তার কিছু পরে মানুষের চাঁদে পদার্পণের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের কার্যক্রম অনুসারে যথাক্রমে অ্যাপোলো-৯,-১০ এবং -১১কে মহাকাশে পাঠানোর কথা সরকারী ভাবে ঘোষণা করাও হয়েছে। আশা করা যায়, 'অ্যাপোলো-১১' চাঁদের বুকে মানুষ নামিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

চাঁদে যাবার মানুষের সেই বহু যুগযুগান্তরের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হলে আমরা আশ্চর্য হবো না। বরং সেই বহু ঈপ্সিত শুভ দিনটির প্রতীক্ষায় আমরা বসে থাকবো।

আর, কিশোর বন্ধুদের ভেতর কেউ কেউ এর-ই মধ্যে সেই চাঁদ মামার দেশে পাড়ি দেবার জন্য তোড়জোড় করলেও আমরা অবাক হবো না বা তাদের নিরুৎসাহও করবো না।

দিনটি শুধু ঐতিহাসিক-ই নয়, মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এ দিনটি চিরদিন ভাস্বর হয়ে

থাকবে। আমেরিকার চন্দ্র প্রদক্ষিণের দু' সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া সেই চমকপ্রদ ইতিহাস সৃষ্টির গৌরব অর্জন করে।

ঐ দিন ভারতীয় সময় বেলা ২টা ২০ মিনিটে সোভিয়েট মহাকাশ-যান সোয়ুজ-৪ সোয়ুজ-৫-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রথম মহাকাশ-স্টেশন স্থাপন করে। এই প্রথম মানব আরোহী সমেত দু'টি মহাকাশযান যুক্ত হল।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,— রাশিয়া দু' দু'বার মহাকাশযানের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছিল। তবে, সেবার আরোহীবিহীন মহাকাশযানের মধ্যে।

উক্ত মহাকাশযান দু'টি যুক্ত হ'তে মহাকাশচারী **খ্রুনভ** এবং **ইলিসিয়েভ** সোয়ুজ-৫-এর জানালা খুলে বেরিয়ে আসেন। তারপর দু'জনে এক ঘণ্টা ধরে মহাকাশে হেঁটে বেড়িয়ে সোয়ুজ-৪ মহাকাশ-যানটিতে প্রবেশ করেন। এমনি ভাবে এঁরা দু'জন এক মহাকাশযান থেকে অন্যটিতে প্রবেশ করে বিশ্ববাসীকে চমকিত করেন। বলা বাহুল্য, **মহাকাশে যান বদলের অঘটনও এই প্রথম ঘটলো।**

চার ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট যুক্ত অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে মহাকাশযান দু'টি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে চলতে শুরু করে।

সোয়ুজ-৪-এর অধিনায়ক মহাকাশচারী লেঃ কর্নেল **ভ্লাদিমির শাটালভ** তাঁর নতুন সঙ্গী দু'জন (**খ্রুনভ** এবং **ইলিসিয়েভ**)-কে নিয়ে স্বদেশের মাটিতে নিরাপদে ফিরে আসেন পরের দিন—১৭ই জানুয়ারী। তিনি মহাকাশ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন ১৪-ই জানুয়ারী, ভারতীয় সময় বেলা ১টা ৮ মিনিটে (মস্কোর সময়, সকাল ১০টা ৮ মিঃ)।

আর, সোয়ুজ-৫-এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল **বোরিস ভলিনভ** তাঁর নির্ধারিত পরিক্রমা শেষ করে নিজের যানটিতে চেপে ১৮ই জানুয়ারী পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে আসেন।

সোয়ুজ-৪ শাটালভকে নিয়ে মহাকাশের দিকে ছুটে যাবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সোয়ুজ-৫ তিনজন অভিযাত্রী নিয়ে যাত্রা করেছিলেন পরের দিন—১৫ই জানুয়ারী, মস্কোর সময়, সকাল ১০টা ১৪ মিঃ-য়ে।

মহাকাশযান দু'টি একত্রে ঘুরে বেড়িয়ে প্রমাণ করে,—মহাশূন্যে যন্ত্রঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব।

এই অভিযানের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিকগণও মনে করেন, এখন মহাকাশে মঞ্চ স্থাপন করে চন্দ্র এবং অন্য গ্রহগুলিতে যাওয়ার পর্ব সহজ হবে। তবে তার আগে সেখানে একটি গবেষণাগার স্থাপনে তাঁরা বেশী আগ্রহী।

উপসংহার

আমেরিকার সফল চন্দ্র-পরিক্রমা এবং রাশিয়ার মহাকাশে যান-বদলের ঘটনা বা মহাকাশ-স্টেশন স্থাপনের অসামান্য কীর্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করবো—অদূর ভবিষ্যতে মানুষ আরও দূরের গ্রহ-উপগ্রহে গিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসবে।

এ ক্ষেত্রে রুশ-আমেরিকান প্রতিযোগিতার প্রশ্ন অবান্তর। তাঁদের এ প্রচেষ্টাকে আমরা সমগ্র মানব-জাতির সমবেত প্রয়াস হিসাবেই গ্রহণ করবো।

নির্দেশিকা

সাহিত্য		পৃষ্ঠা

সাহিত্য **পৃষ্ঠা**

বিজ্ঞান

পৃষ্ঠা

ক্রীড়াঙ্গন **পৃষ্ঠা**

দুঃসাহসিক অভিযান

দেশনায়ক ও সমাজসংস্কারক

মহাশূন্যে অভিযান